

Registered No C 118,

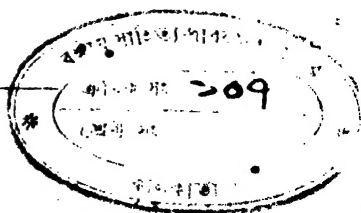
নবম বর্ষ ।]

বৈশাখ ১৩১২ ।

[প্রথম সংখ্যা ।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।



সম্পাদক

শ্রীযুক্ত জগদ্রাধ চট্টোপাধ্যায় ।

১৯৩৫

Printed by Jagendra Nath Chatterjee

At The "Harp-press" No 133 Masjid Bani Street

CALCUTTA

1905

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্মা কবিভূষণের

খাসারি ।

(হাঁপানি কাসির উচ্চি একমাত্র মহৌষধ)

বাস কাসাদিতে প্রসিদ্ধিত রোগীগণ ভবিষ্যৎ জীবন অসুকার ও যন্ত্রণাময় ভাবিয়া মনঃ অশান্তি ভোগ করিতে থাকেন। জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া, মৃত্যুর কালকালে পতিত হইবার বাসনা করেন। যাহারা হাঁপানি কাসি শিখের অসাধ্য ভোগ জানিয়া চিকিৎসা করিতে বিরত আছেন, অথবা নানাবিধ চিকিৎসা দ্বারা উপশম প্রাপ্ত না হইয়া, হৃৎপিণ্ড এবং চিকিৎসকের উপর বিশ্বাসলুপ্ত হইয়াছেন, আমরা ঐচ্ছানিকে সাধবে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আমাদের এই “খাসারি” একশিপি ব্যবহার করিয়া দেখুন, অবশ্যই উপকার পাইবেন। আমাদের এই “খাসারি” সেবনে নিরামিষিত উপসর্গসহ হাঁপানি কাসি সহর নিবারণ হইবে।

“খাসারি সেবনে প্রেমা তরল হইয়া বিনাকটে উঠিয়া যাইবে। বাসের সাঁ সাঁ লক্ষ্য হইবে, পলার ঘড়, ঘড়, লক্ষ থাকিবে না। কাসিতে কাসিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইবে না।

৪ দাগ “খাসারি সেবনে হাঁপানির টান এক চটবে, বুক পিঠ সাঁটিয়া দয়া বা বাখা, পেটকাঁপা বা মুচ্ছিতভাবে অপর্যন্ত হইবে।

শিশু ও বালক-বালিকাদিগের অণুকাসি, গুড়ী কাসি, হাতিতে সলা সাঁই সাঁই বা ঘড়, ঘড়, করা, বৃকে প্রেমা বলা প্রভৃতি রোগ হইলেন কমিবে।

বতাসনের হাঁপানি চটক না কেন, এই ঔষধ চট সপ্তাহ নিয়ম পূরক সেবন করিলে নিখোঁজোন্নিবৃত্ত পাচ লক্ষ্য বাস ; যথা—যক্ষ্মবাস, উচ্ছ্বাস, ছিন্নবাস, ভয়কবাস ও কহবাস প্রভৃতি সর্গবিধ বাস ও তত্ত্ববৈজ্ঞানিক ব্যবহার উপসর্গ অর্থাৎ কুম্ভকাসে বেদনা, শাখবেদে, উদরে, মেরুতে বেদনা প্রভৃতি উপশমিত হইয়া অরুণাল যথোক্ত রোগী সুখ ও সবল হইবে।

কাসরোগের পক্ষে ইহা অবিভীত ঔষধ। যে সকল রোগীর বাস কাস নিরন্তর বক্তমান আছে, বিশেষতঃ রাতিবে সেবে শীতল বৃদ্ধি, অবিরত কাসিতে হ্রা ও গয়ের উঠে। অপর হাঁপানির টান থাকে, তাহারো এই “খাসারি” সেবন করুন, সপ্তাহ মধ্যে স্তম্ভতা লাভ করিবেন। ১০ দাগ পূর্ণ এক শিপি “খাসারি”র মূল্য ১০ টাকা, ডাকঘাণ্ডল ১০ আট আনা, মোট ২১ টাকা পড়ে।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়।

৬ নং বাজা নবকুন্ডের দ্বিট, পোতাঝাড় ; কলিকাতা।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

নবম ভাগ—নবম বর্ষ।

১৩১২ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ভক্তিরত্ন)

কলিকাতা ;

১৩৩ নং মস্জিদবাড়ী ষ্টীট “হরি-যন্ত্রে”

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তি দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ১, এক টাকা।

ডাকমাওল ১০ চারি আনা।

সূচীপত্র ।

<p>১ অবদর্শ...ঐজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১</p> <p>২ বিলাসকরত ও চিন্দুসঙ্গ... ঐনন্দনাথ চক্রবর্তী বি. এ ২</p> <p>৩ শোকপীতি...ঐনন্দরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭</p> <p>৪ জীবনে মরণে...ঐব্রজসুন্দর সান্নাথ ৮</p> <p>৫ তপ্ত অকুপ্ত...ঐদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডিতা ঐ</p> <p>৬ দোণার পারিজাত...ঐসুরেন্দ্রমোহন তট্টাচার্য্য ৯, ৪৩, ৪২, ১০৩, ২০৫</p> <p>৭ সুখের সংসার...সম্পাদক ১৭</p> <p>৮ সম্পাদকের মন্তব্য...ঐ ২৫, ২৩৫</p> <p>৯ সমালোচনা...ঐ ২৫, ৭৪, ৯৬, ১১৩, ২০৯, ২৫৩</p> <p>১০ মাসিক সংবাদ... ১৬, ৪৮, ৯৮, ১০৮</p> <p>১১ ছায়াপথ...ঐনন্দরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫</p> <p>১২ মণিগলেম্বর...ঐব্রজসুন্দর ঐ</p> <p>১৩ সকলি ভোমার...ঐজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮</p> <p>১৪ করে চিত্র চায়...মহম্মদ মজামেল হক্‌২৯</p> <p>১৫ প্রার্থনা...ঐজটনবিহারী দাস ৩০</p> <p>১৬ জ্বলের কণা...ঐনন্দনাথ চক্রবর্তী ঐ</p> <p>১৭ একটা চিত্র সম্পাদক ৫৫</p> <p>১৮ তব্বী...ঐদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডিতা ৪৮</p> <p>১৯ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ...সম্পাদক ৪৯</p> <p>২০ চণ্ডীদাসের প্রেম...ঐব্রজসুন্দর ৫৬</p> <p>২১ অহলা উদ্ধার...ঐব্রজেশ্বর বন্দ্যো, ৫৭</p> <p>২২ গুণীর কণ্ঠ... সম্পাদক ৬৪</p> <p>২৩ অতীতের স্মৃতি...ঐসুরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৯, ১০৬, ২৬২</p> <p>২৪ সন্ধ্যা হমায়ন...ঐব্রজসুন্দর ৭৫, ১২৭</p> <p>২৫ আসিবে বলিয়া...ঐজিতেন্দ্র ৮১</p> <p>২৬ বর্ষার...ঐজটনবিহারী দাস ৮২</p> <p>২৭ জল ও শুকবাণী...ঐরমনারঞ্জন মিশ্র ৮৩</p> <p>২৮ অবদর্শ না পুণ্যসকর...ঐদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডিতা ৯১</p> <p>২৯ সুখ কিসে...ঐকুমুদসু তট্টাচার্য্য ৯৩</p> <p>৩০ নিবেদন...সম্পাদক ৯৯</p> <p>৩১ বিখ্যাত...ঐব্রজেশ্বর কবিরূপ ৯৯, ১৪৭, ১৬৫</p>	<p>৩২ প্রীতি আবাহন...ঐজটনবিহারী দাস ১০৮</p> <p>৩৩ কে তুমি ললনা...ঐকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় ১১১</p> <p>৩৪ শেখ...জিতেন্দ্র ১১২</p> <p>৩৫ আশ...ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১৫</p> <p>৩৬ শারদোচ্চাস...ঐজিতেন্দ্র ঐ</p> <p>৩৭ দেবী-পূজা...সম্পাদক ১১৬</p> <p>৩৮ উদ্ভাদিনী...ঐচন্দ্রমোহন দাস ১২২</p> <p>৩৯ বন্দে মাতরম...সম্পাদক ১৩০</p> <p>৪০ স্বদেশী আন্দোলন...ঐ ১৩৫</p> <p>৪১ বিজয়রত্নসব... ঐ ১৩৯</p> <p>৪২ স্বদেশী আন্দোলন...ঐব্রজনাথ চক্রবর্তী ১৪২, ১৭১</p> <p>৪৩ আমাদের কর্তব্য...সম্পাদক ১৫৫</p> <p>৪৪ গীত... ১৬০, ১৭৪</p> <p>৪৫ ভক্তিরজর...ঐব্রজপদচট্টো, ১৭৬, ১৮৭, ২৩৭</p> <p>৪৬ সুখ দুঃখ...ঐভেলানাথ চট্টো, ১৮০</p> <p>৪৭ আমাদের কথা...কার্য্যাধ্যক্ষ ১৮৫</p> <p>৪৮ যশ...ঐজটনবিহারী ১৮৬</p> <p>৪৯ কল্যাণ...সম্পাদক ১৯৬</p> <p>৫০ অমৃত্যু...ঐনন্দরচন্দ্র বন্দ্যো, ২১১</p> <p>৫১ আকবরের জন্ম...ঐব্রজসুন্দর ২২২</p> <p>৫২ টাণ্ডার একরাতি...ঐসুরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২২৮</p> <p>৫৩ শোকাশ্র...ঐকুমুদসু সেন ২৩১</p> <p>৫৪ বৃষ্টিচ্যুত কুম্ম...ঐহরিনারায়ণ মজুমদার ২৩২</p> <p>৫৫ জাপান মহিলার পাতিব্রত... সম্পাদক ২৪৪</p> <p>৫৬ সৌন্দর্য...ঐউপেন্দ্রনাথ মুখো, ২৪৯</p> <p>৫৭ প্রণয়... ঐ ২৫০</p> <p>৫৮ প্রেমের পুরস্কার...ঐনন্দরচন্দ্র বন্দ্যো, ২৫১</p> <p>৫৯ দেবী না মানবী তুমি... ঐজটনবিহারী দাস ২৫৭</p> <p>৬০ গদা জয়...ঐসুরেন্দ্রচন্দ্র চট্টো, ২৬০</p> <p>৬১ নীরবে...ঐসুরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ২৬৪</p>
---	---

• নবম বর্ষ { আনোচনা সন ১৩১২ সাল } প্রথম সংখ্যা ।



আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

“মস্তকের সাধন কিম্বা শরীর পতন।”

নবম বর্ষ।

}

বৈশাখ, সন ১৩১২।

}

প্রথম সংখ্যা।

নববর্ষ।

নববর্ষ এস এস, মানস মল্লিরে বস, যেন কোন নকলু, হেরিয়া প্রবাসী বঁধু,
এস, এস হে অতিথি নব আগন্তুক। সরমে মরিয়া যায়—লুকাইতে চায়।
এসেছ কা'দের সঙ্গে, ওরা কি রহিবে বন্ধে, তরল গা ফুলফল, ভূপর কানন জল,
ওরা যেন চে'ন চে'ন স্বথ আর ছুঃখ। মরি মরি কি সুখনা মাখিয়াছে আজ।
কি ভাবে দুমিবে ওরা, সমগ্র বিশাল ধরা, হোনারি পূজার তরে, মেজেছে পুণক ভরে,
কেমনে ভেটিবে ওহে বল উহাদের। খেচর ভূচর সবে তাজি নিজ কাজ।
বড় সাধ তোমা ধনে, সাজাটব সবতনে এস নববর্ষরাজ, পরি কমনীয় সাজ,
বসাইয়ে সিংহাসনে—জ্ঞান জুদয়ের। আশীষ করহ এসে ছুর্ভাগা মানবে।
দোলা'ব ফুলের মালা, গেঁথেছি যা ভরে ডালা, হিংসা ঘেব তাজি যেন, ধর্মপথে বিচরণ,
মাগতী মলিকা জাঁতি—প্রফুল কমল। করে হে সকলে নিলে, এ মরত ভবে।
যে তব সঙ্গের সাথী, তোমা সনে নিতিনিতি, হতভাগ্য বঙ্গবৃত্ত, মাগে ওহে গুণবৃত্ত,
আসিয়া একেলা ফোটে, আলো ক'রে জল। তোমারি আশীষকণা মস্তক পাতিয়ে।
নিদাঘে এনেছ সঙ্গ, চন্দন মাথায় রঙ্গ, তোমার কোলেতে শুয়ে, দিন যেন যায় ব'রে,
বাজন করিব তাই ধরি সমীরণ। কঠিন মরম আলা সংসারে ভূর্ণিয়ে।
কাটাতে না পেয়ে মায়া, দূরেতে বসন্ত চায়, জগদীশ পদে যেন, করি আত্ম সমর্পণ,
ফাঁক বুঝে উঁকি কুঁকি মায়ে অম্লকণ। সাধিবারে পারি এবে হিত সবাকার।
সোণুলির অবসরে, এসে সমীরণ ভরে, মনের বাসনা মত, কার্য্য করি অবিরত,
কুসুম অবাশ মাখি, ভরেতে পলায়। অবশেষে তব পদে করি মন নমস্কার।
জীজিতেঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিলাত ফেরৎ ও হিন্দু সমাজ ।

সম্প্রতি ময়মন সিংহের প্রখ্যাত যশা ব্রহ্মবংশ মহারাজ শ্রীশ্রীযুক্ত স্বর্গ্যকান্ত শর্মা আচার্য্য বাহাদুর স্বীয় কুমারের সচিব বিলাত প্রত্যাগত বারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের কন্ঠার শুভ পরিণয় সম্পন্ন করিয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে একটি নুতন আন্দোলনের স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়াছেন। অনেকে মহারাজ বাহাদুরের এই কার্য্যের ত্বরসী প্রশংসা করিতেছেন। অপর পক্ষে অনেকে এই কার্য্যের উপর দোষারোপও করিতেছেন। প্রশংসাকারীগণ মহারাজের এই কার্য্যে অভিনব সমাজ সংস্কারের একটি পথ উন্মুক্ত হইল বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতিবাদকারীগণ এতদ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের পতন আশঙ্কা করিয়া স্ত্রিম্বাণ হইয়াছেন। এই উপলক্ষ করিয়া দুই চারিটি কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে বিবেচনার তদ্বিষয়ে উৎসুক হওয়া বাইতেছে।

মহারাজ স্বর্গ্যকান্ত স্বীয় অশেষ সদ্ব্যবসায়ি দ্বারা জনসাধারণের একান্তই প্রজ্ঞাভাজন। বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য তাঁহার উৎসাহে পরিভূট, দরিদ্র সাহিত্যসেবী অশেষ প্রকারে তাঁহার দ্বারা উপকৃত। তদীয় প্রজ্ঞা সাধারণ তাঁহার সদয়-শাসনে পরিভূট। রাজ-

দ্বারের সম্মান অপেক্ষা তিনি প্রকৃতি পুঞ্জের প্রজ্ঞাকেই অধিক বরণীয় বলিয়া মনে করেন এবং স্বীয় কার্য্যকলাপেও তাহাই প্রকটিত করিয়া আসিতেছেন।

এই পুত্র পরিণয় ব্যাপারের পূর্বে পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তিকে তাঁহাকে অহিন্দু বলিয়া মনেও করিতে পারেন নাই। তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে স্বীয় কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং সেব দ্বিজে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। মহারাজ বীরেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুক্তাগাছার আচার্য্য চৌধুরী বংশ বীরেন্দ্র কুলজগণের সুপরিচিত। এই কারণেই এই বিবাহ ব্যাপারে হিন্দু সমাজের অনেকে অর্থাৎ বিপক্ষবাদীগণ মহারাজ হিন্দু সমাজ হইতে চ্যুত হইলেন বলিয়াই আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন। নতুবা অন্ত কোন বিপক্ষগামী রাজা বা জমিদারের বিষয়ে এইরূপ ঘটনা হইলে তাঁহাদের সে আক্ষেপ থাকিত না। মহারাজের দ্বার সহায় হারা-ইয়া সমাজের বলহানি হইল, এই তাঁহাদের দ্বন্দ্ব। তাঁহাকে হিন্দুগণ স্বীয় সমাজের গৌরব বলিয়া মনে করিতেন, আজ তাঁহাকে সমাজ হইতে বিচ্যুত করিতে হইতেছে বলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র।

এক্ষণে আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে বিপক্ষবাদীগণের এই আপত্তি

কতদূর সজত। শ্রীযুক্ত বোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ও বায়েজ শ্রেনীর ব্রাহ্মণ সন্তান এবং নিজেও উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বিলাত যাত্রা করিয়া তথায় কতিপয় বৎসর অতি-বাহিত করিয়া আসিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও স্বদেশে আসিয়া তিনি যথা সম্ভব স্বধর্ম পালনে তৎপর আছেন বলিয়া আমরা জানি। মহারাজ বাহাদুরও তদীয় বক্তৃতায় একস্থানে তাহা বলিয়াছেন। এক্ষণে কেন্দ্রে বোমকেশ বাবু বিলাত গমন করিয়া-ছিলেন এই আপত্তি ব্যতীত এই বিবাহে অন্য আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না।

অতএব ইহা প্রণিধান করা কর্তব্য যে এই আপত্তিটি রক্ষণীয় অথবা বর্জনীয়।

সমাজ পরিবর্তনশীল। সংস্কার চেষ্টা করিলেও তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ স্থিতিশীল জড় ভাবাপন্ন করিয়া রাখা বোধ হয় অসম্ভব। উন্নতি অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা প্রকার পরিবর্তন ও অবশ্যজ্ঞাবী।

আমাদের এই সনাতন হিন্দু সমাজেরও যদি আভ্যন্তরিক অবস্থা পূর্বাঙ্গের নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ইহারও যুগে যুগে নানা প্রকারের পরিবর্তন ঘটয়াছে।

সমাজ শাসনের প্রধান অবলম্বন সংহিতা সমূহের স্থজাবলী পাঠ এবং তুলনা করিলেও বোধ হয় অনায়াসেই এই সত্য পরিষ্কৃত হইয়া

উঠিবে। 'এক যুগে যে সব আচার-ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে, যুগান্তরে সেগুলির পরি-বর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন হইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাহ্য্য বোধে তৎসময় প্রদর্শিত হইল না, যদি কাহারও ইহাতে সন্দেহ থাকে, তবে তাল জানিতে পারিলে আমরা প্রবন্ধান্তর উপলক্ষে তাহা উত্থাপিত করিব।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্য, পুরাণাদিও বোধ হয় এ বিস্ময় সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। তবে একথা স্বীকার্য যে হিন্দু সমাজ দ্রুত পরিবর্তনশীল নহেন, যতদিন পূর্ব আচার ব্যবহারাদি স্বামী রাখিতে পারা যায় ততদিন হিন্দু সমাজ কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু যখনই সমাজ নেতা তত্ত্বাবধী মহাত্মাগণ দেখিয়াছেন যে পদ্ধতিবর্তন অবশ্যজ্ঞাবী হইয়া পড়িয়াছে এবং পরিবর্তনেই শুভ ফল সম্পূর্ণ বর্তমান, সে স্থলে তাঁহারা সে পরিবর্তন করিতে, সে বিধির নিয়ম বাবস্থা দিতে পশ্চাৎপদ করেন নাই।

বর্তমান সময়ে সমুদ্রপথে বিদেশযাত্রা নানা কারণে অস্বদেশীয়দিগের ন্যূন প্রার্থনীয় হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশের উন্নতি, স্বজা-তীয় শ্রীবৃদ্ধি, স্বদেশের মাহাত্ম্য কীর্তন ইত্যাদি বহুবিধ আশঙ্ক্যতা আমাদের ন্যূন বিদেশে সমুদ্র-পথে গমনের অন্ত অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, ইহা ভগবদীচ্ছা! কর্তৃকই আজ কোন কোন

বিষয়ে ইয়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ আমাদের শিক্ষক স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তত্ত্বদেশীয় বিশেষ বিশেষ শিক্ষালাভের জন্য তদ্দেশে গমন করাও আমাদের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই সব দেশের অধিবাসীগণ ভিন্ন কৰ্ম, আচার ব্যবহার ও মতাবলম্বী হওয়াতে তথায় যাইয়া বাস করিবার কালে আমাদের হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে আচার ব্যবহার হইতে কোন কোন বিষয়ে বিচ্যুতি ঘটা অসম্ভব নহে। আবশ্যক স্থলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও ঋগ্বেদাচাৰ্যের অঙ্গ গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সুতরাং সেরূপ স্থলে অন্যদণ্ডিরও স্বধৰ্ম্মানুগামী আচার হইতে ত্ত্বিৎসংক্রমণ বোধহয় মার্জ্জনীয় হওয়া উচিত। স্বদেশে হিন্দু নামধারী এমন কি অনেক মহাত্মা নাই, যাঁহারা বিজাতীয় ভোজন্যাগারে বিজাতীয় যবনাম ও অস্ত্রাশ্রয় নিষিদ্ধ খাদ্য আহার করিয়াও হিন্দু হইতে স্থানিত হন নাই? সমাজ কি সেরূপ সমস্ত ব্যক্তির সংবাদ রাখেন না?

কেহ কেহ এতদ্বত্তরে বলেন যে ঐরূপ ব্যক্তির যদিও এই সব নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা সমাজকে ভয় করিয়া চলেন এবং সেই জন্যই সমাজকে লুকাইয়া গোপনে এই সব আচরণ করিয়া থাকেন। কেহ গোপনে কি করিতেছে না করিতেছে সমাজ তাহা দেখিবেন না; ব্যক্ত

ভাবে কে সমাজের শাসন অমান্য করিতেছে তাহাই সমাজ দেখিবেন এবং তদনুসারেই তাহার দণ্ড প্রয়শ্চিন্তের ব্যবস্থা করিবেন। আচ্ছা ভাল কথা;—এরূপ স্থলেও বোধ হয় যাঁহারা স্বীয় জ্ঞান পরিধি বৃদ্ধির নিমিত্ত বিদেশগামী হইয়া জীবন ধারণের জন্য (আমোদ উপভোগের জন্য অথবা বানরী বৃত্তি অবলম্বনের জন্য নহে) স্বধৰ্ম্ম বিগর্হিত ভোজ্য পানীয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন অথচ স্বদেশে আসিয়া স্বীয় সমাজের নিকট তজ্জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন এবং সমাজ কোন দণ্ড দিতে চাহিলে তাহাও গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছেন, তাঁহারা কি অধিক সহানুভূতির, অধিক দয়ার যোগ্য পাত্র নহেন? আমি স্বদেশে স্বজাতির মধ্যে থাকিয়া জঘন্য প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সমাজ ও ধৰ্ম্ম শাসনকে অমান্য করিয়া নিষিদ্ধ খাদ্যাদি ভোজন করিতেছি, আমি সমাজের নিকট অঙ্গুলীর অন্তরালে থাকিয়া নির্দোষী রহিলাম, আর অপর ব্যক্তি মহত্বদেখে যাত্রা করিয়া বাধ্য হইয়া এইরূপ আচরণ করিল সে সমাজের ক্ষমার্হ হইল না?

এ সময় যদি একত পক্ষে সমাজনেতৃগণ স্বপক্ষে প্রতীতিত থাকিতেন; যদি হিন্দু রাজত্ববর্গ দ্বারা সমাজ নিরমিত হইত, হিন্দু-নরপতির যদি সমাজ-পতিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহা হইলে আমাদের বোধ হয় এই আবশ্য-

কীর বিধানটির ব্যবস্থা এত দিন সমাজে প্রণীত ও প্রচলিত হইয়া বাইত। শাস্ত্রদর্শী জগৎ-হিতব্রত ব্রাহ্মণগণ স্বদেশ ও স্বীয় সমাজের এই কলাপকর সমুদ্র গমন ও পাশ্চাত্য দেশে অধিবাসের বিষয় কোন একটা বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া দেশের ও সমাজের মঙ্গলের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের আজ সে অবস্থা নহে। এখন সমাজ নামে মাত্র পর্যাবসিত। হিন্দু সমাজে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাব নাই ইহা সত্য এবং আমরা এখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিধি নিষেধের উপর আত্মবান্ সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যেও এই বিষয় লইয়া ঐক্য মত দেখা যায় না। আমার যতদূর ধারণা তাহাতে বোধহয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবহারও সকল সময়ে আমরা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করি না। যদি স্বমত পোষক ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে আমরা তাহা লইয়া একটা মহা কলরব করিতে পারি বটে কিন্তু স্বমত বিরোধী প্রস্তাব হইলে তখন আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের উপর শ্রদ্ধার অভাব হইয়া তাহাদের এত তীব্রপ্লেব, তাঁহাদের শাস্ত্র জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি প্রদর্শন প্রবৃত্তিই প্রবলা হইয়া উঠে। এই সমুদ্র যাত্রা ও স্বেচ্ছদেশাধিবাসের স্বপক্ষে যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা না পাওয়া গিয়াছে এমত নহে কিন্তু যে সব পণ্ডিত ইহা কর্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা

দিয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তর্গতের তীব্র সমালোচনাও কম ভোগ করিতে হয় নাই। ইহাতে আমাদের শাস্ত্রের বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় না বলিলে বোধ হয় দোষের হয় না।

আমরা দেখিতেছি—বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে এইরূপ বিলাত প্রত্যাগত বিচ্ছিন্নকে সমাজ গ্রহণ করিতেছেন। বঙ্গদেশীয় কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ সুখী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত কথোপকথন করিয়া বুঝিয়াছি, তাঁহারা এই পুনর্গ্রহণ প্রথা প্রবর্তনের পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁহারা “গতাহুগতিক ভ্রম” অবলম্বন করিয়া চলিই সর্সাপেক্ষা নিরাপদ বলিয়া মনে করেন, বিফলশ্রমের অমূল্য উপদেশের (ন গণ্যতা প্রতো গচ্ছৎ) অবমাননা করিয়া ইহলোকে লোকের দস্তকুচি কৌমুদী উদ্ভাসিত করিতে চাহেন না। সমাজে যে সমস্ত পাবণ্ড ও বিদ্রোহীর স্থান রহিয়াছে, তাহাদের তুলনায় এই সমস্ত জ্ঞানলিপু ভ্রমগণ বচ প্রকারেই শ্রেষ্ঠ এবং সমাজে গৃহীত হইলে তাঁহারা সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ হইতে পারেন, একথাও অনেকেই স্বীকার করেন।

আমরা বলি যে এইরূপ ক্ষেত্রে সমাজের এই সমুদ্র অশিক্ষিত ব্যক্তির সম্বন্ধে পুনর্গ্রহণের একটা ব্যবস্থা প্রচলিত করা একান্তই কর্তব্য। আজকাল এই জ্ঞান বিজ্ঞানের দিনে যদি বিদেশে গমন পূর্বক

বৈশেষিক শিল্প বিষয়ে নানা বিষয়িণী অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া স্বদেশে আনিয়া দেশীয় শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি করিতে পারা যায় তাহা হইলে সেই কল্যাণকর বিষয়ে মত প্রদানে ইতস্ততঃ করা একপ্রকার সমাজদ্রোহ বলিয়া আমরা মনে করি।

যদি সমুদয় ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের উত্তোপে শাস্ত্রদর্শী অভিজ্ঞ পণ্ডিতকুলপতিগণের প্রতিনিধিহে একটি বিরাট সভা আহূত হইয়া তথায় এই বিষয়ের যথার্থরূপে বিচার করা হয় এবং সমগ্র হিন্দু সমাজ যদি তাঁহাদের ব্যবস্থা নির্দিষ্টবাদে মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকেন তাহী হইলে বোধ হয় ভাল হয় এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্বদেশের কল্যাণকামী শাস্ত্রকর্তাগণ কখনই স্বধর্মনিষ্ঠ স্বজাতিবৎসল বিদেশীয় জ্ঞানপুটে ব্যক্তিদিগকে বিদেশীয় জ্ঞানার্জন অপরাধে সমাজ হইতে নির্বাসিত করিবার ব্যবস্থা দিতে পারেন না। সনাতন হিন্দুধর্মও এই সমস্ত সন্তানগণকে স্বীয় মতে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে আপত্তি করিতে পারেন না।

তবে এ কথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে এই সমুদয় বিলাত প্রত্যাগত মনিষীগণের অন্তঃকরণে হিন্দু সমাজে পুনঃ প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা এবং সমাজশাসন মানিয়া চলিবার প্রবৃত্তি থাকিবে একান্তই আবশ্যক।

তাঁহারা যদি স্বধর্মে ও স্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত

কাম হইয়াও খাণ্ড পানীর আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সমাজ ও ধর্ম-রীতি-নীতির পরিবর্তে নিজ স্বাতন্ত্র্যই প্রচলিত রাখিতে ইচ্ছা করেন এবং তত্তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য ও অবহেলা করেন, তাহা হইলে সমাজ তাঁহাদিগকে পুনর্গ্রহণ করিয়া স্বীয় শরীরে আর এক নূতন ব্যাধির সৃষ্টি করিবেন ভিন্ন অল্প কোন বিষয়ে লাভবান হইবেন বলিয়া আমরা বোধ করি না।

বাহারা বিলাত প্রত্যাগত হইয়া জাতি-ভেদ ও বর্ণাশ্রম প্রথা মানিতে চাহেন না, মানবজাতেরই স্পৃষ্ট ও পক খাণ্ড পানীর বাহার্য্য অবশ্যে গ্রহণ করিতে বস্তুশীল, তাঁহাদের পক্ষে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহাদের জন্ত ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতিই রহিয়াছে। তত্তৎ সমাজে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। বাহার্য্য হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতি আস্থাবান, তাঁহাদের সম্বন্ধেই আমরা এত কথা বলিতেছি। বাহার্য্য বিলাত প্রত্যাগত হইয়া নিজ সাহেবীয়ানা পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় পরিচ্ছদ ও ভাবা-কেই আদর করিয়াছেন, বাহার্য্য রহিম চাচার হস্তপক কুন্ধুটাদি ভোজ্যে বীতস্পৃহ এবং সর্বপ্রবর্তে হিন্দু আচার ব্যবহার পালনে বস্তুশীল, তাঁহাদের জন্ত হিন্দু সমাজের একটা ব্যবস্থা স্থির করা একান্তই প্রয়োজন। এখন সমাজ তাঁহাদিগকে লইতে চাহেন না বলিয়া

অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে বাবুর্জি রাখিতে হইয়াছে, কিন্তু সমাজ তাঁহাদিগকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করিলে আর তাঁহাদের ঐ প্রয়োজন নিশ্চরই থাকিবে না।

অনেক ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট সমুদ্র জলের সহিত পরিচিত না হইয়া তা বাহ্যত হিন্দু পরিচয় দিয়া এবং হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশিয়া থাকিয়াও যে প্রকাশ্যে বাবুর্জির হাতে থানা খাইতেছেন, সাহেবদের টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন, সমাজ তাঁহাদের এই উশ্মানতা, এই অবহেলা কি ভাবে দেখিতেছেন তাহা কি বিবেচ্য নহে? ইহা কি সমাজকে সন্মান করার চিহ্ন? তবে যাঁহারা বিলাত গিয়াছেন তাঁহাদের অপরাধ কি এতদপেক্ষাও গুরুতর?—আমরা তাহা মনে করি না।

আমার যতদূর স্মরণ হয়, বোধ হয় পূজাপাদ ৬ হৃদেবমুখোপাধ্যায় তদীয় “সামাজিক প্রবন্ধে” এই বিষয়ের অবতারণা করিয়া ঈদৃশ ব্যক্তিগণকে সমাজে পুনর্গ্রহণই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান মনীষী ব্যক্তির মত উপেক্ষণীয় নহে।*

অতএব আমাদের বিবেচনার মহারাজ হর্যাকান্ত স্বীয় পুত্রকে বিলাত-প্রত্যাগত হিন্দু ধর্ম্মমুরক্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের কস্তার সহিত বিবাহ দিয়া স্বীয় নৈতিক বল ও সাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন এবং সমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষার একটি নব সংস্কারের পথ উন্মুক্ত

করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তিনি স্ববর্ণ ও সমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের প্রশংসা পাইবার যোগ্য। দেশের কৃতবিদ্যা প্রতিপত্তিশালী মহাত্মাগণ যদি এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করেন, এবং মহারাজকে সমাজ-দ্রোহী মনে না করিয়া সমাজের প্রকৃত মিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলেই বোধ হয় প্রকৃত কার্য্য করা হয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এইরূপে সমাজ স্বীয় উপযুক্ত সম্মানগণকে পুনর্গ্রহণ করিলে ক্রমেই সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এবং ধর্ম্মের ও গৌরব ও মহাত্মা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না। আমাদের স্থান সংক্ষিপ্ত, এতদ্ভিন্ন অন্য এই স্থানেই বিরত হইতে হইল। আবশ্যক বোধ করিলে ভবিষ্যতে এতদ্বিষয়ে আরও কিছু বলিবার চেষ্টা রহিল।

শ্রীগুণনাথ চক্রবর্তী বি, এ।

কবিরাজ ৬নিশিকান্ত সেন কবি-
ভূষণ মহাশয়ের উদ্দেশে রচিত

শোকগীতি।

নীরব হৃদয়ে আজি চিরতরে বীণাতান,
কাকলী-সুধর-পিক, ছাড়িয়া দিয়াছে গান।
স্বহাস-রজত-গুহ-কৌমুদীর স্থপ্ত ছায়া,
যেন গো মিলারে গেছে তিমিরে ঢাকিরে কারা

বিষণ্ণ প্রকৃতি বালা নীহার-নিসিক্ত হ'য়ে,
 বেন গো কাঁদিছে এবে নেত্রাসার বরষিরে ।
 কেন গো কেন গো আজি কি গভীর বেদনায়—
 ঝিল্লি-মল্ল-মুখরিত-নিশিগীর্ন কাঁদে হায় ?
 নিদাঘ-প্রকৃতি জাত রক্তিম-প্রবাল-দল
 রহিয়াছে অধোমুখে,—জাঁখি যেন ছল ছল ।
 বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি তোমার বিরহে আজি,
 নূতন বরষমুখে নব আভরণে সাজি'—
 সলজ্জা স্বভাব-সতী তব গুণরাশি স্মরি' ।
 তাই বুঝি কিছুতেই স্ময়মা নাহিক হেরি ?
 শ্রীনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

জীবনে মরণে ।

এ জীবনে আর কোন সাধ নাই মোর
 হে কল্যাণি, মনোরাণি ! শুধু মন ডোর
 বাঁধা থাক্ হু'জনার ! নীরব নিকুণ
 জেগে থাক্ হু'অধরে । তুষিত-নয়ন
 থাক্ চির তৃষাভর । অমৃতবে হোক
 তোমাতে আমাতে শুধু অন্তরে সন্তোষ ।
 তার পর একদিন বিশ্রু সঙ্কায়
 বিশ্রাম পাখীর স্তায় কিরিব কুলায়
 পশ্চিম গগনে ;— দূরে হের রবি-রেখা !
 আমার নয়নে বেন হয় সখি দেখা
 তোমার নয়ন ! মুষ্টিময়ী রূপে আসি'
 একটা চুপনে দিও দুই চক্ষু ভাসি ।
 আমার বুকেতে বেন তোমারি চরণ
 পড়ে থাকে !—তারপর আশ্রুক মরণ ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল ।

তৃপ্ত ।

দূরে থাক স্নেহে থাক'
 দেখ আর নাই দেখ,
 তাই ভাল,—তাই ভাল সখা ।
 ছিঁড়ে যাক্—ভেঙ্গে যাক্
 মন প্রাণ,—তবু থাক্
 না'ই হ'ল—না'ই হ'ল দেখা ।
 কেন দিব—কেন হব—
 স্নেহ নাশা,—বাথা তব,
 তা'তে মোর কিবা অধিকার ?
 এই ঢের—এই বেশী—
 আমারে যে ভালবাসি
 দেহ তব বিন্দু প্রেমধার ।

অতৃপ্ত ।

আরো দাও—থুব দাও
 যত পার টেলে দাও •
 এ তৃষিত পরাণে আমার ;
 ছেড়ে' দাও—থুলে' দাও—
 থু'জে-নিকু-পরে যাও
 বাকি যদি থাকে কিছু আর ।
 বুঝে নাই—শিখে নাই
 ভাবিয়াছে বুঝি তাই
 ছলিয়াছি—ভুলায়েছি তারে,
 আরো আছে—তাই নাকি
 দেই নাই, আছে বাকি—
 থু'জে নিকু যদি নিতে পারে ।
 শ্রীদেবেশনাথ মহিতা ।

সোণার পারিজাত ।

উপন্যাস ।

প্রথম পণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

“সে কই ?”—জনকোলাহল ভেদ করিয়া একটি যুবকের ভগ্নতার-বীণার স্রাব রুদ্ধকণ্ঠ হইতে হতাশ-বাধিত সুদীর্ঘ স্বর উঠিল,—
“সে কই ?”

কে সে ?—যুবকের স্ত্রী সোণামুখী । সোণামুখী পূর্ণ যুবতী—রূপে জ্যোৎস্নার নীতল মাধুরী,—জ্যোৎস্নানীতল নৈশ ক্রমের হৃদয়-হারিণী প্রভা উছলিয়া উছলিয়া উঠিতেছিল ।

যুবকের নাম নীলরতন রায়,—জাতি ব্রাহ্মণ, নিবাস যাদবপুর গ্রামে ।

কুক্ষণে সেবার অর্কোদয় যোগ দেখা দিয়াছিল ;—এই অর্কোদয় যোগে বাদ্যালার অন্ততঃ অর্ধেক লোক নানাপ্রকারে বিপন্ন, রোগগ্রস্ত ও মৃত্যুগুণে নিপতিত হইয়াছিল । গ্রামে গ্রামে, রাস্তার রাস্তার, পথে, ঘাটে, সর্বত্রই গজান্নানার্থী মানবগণের বিপুল স্রোত । নৌকা, অশ্ববান, গোবান সমস্তই হস্ত্রাপ্য—বহব্যয়সাধ্য হইয়াছিল । রেল গাড়ীতে আরও

জনতা—সরিষা কেলিবার স্থান ছিল না । যে গাড়ী দেখে, সেই গাড়ীতেই লোকে লোকারণ্য ; কেহ ঠেলিতেছে, কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ কাহারও চরণস্তরে নিশ্চেষ্ট ও বিদলিত হইতেছে ;—আবার কেহবা উপর হইতে তাহার সর্কাক্ষে নিষ্টিবন নিরূপ করিতেছে । কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ কেহ বা কুজভাবে, কেহ কেহ বা উত্তানভাবে অবস্থিত । কেহ বসিতে গিয়া নিয়তগের লোকের ঠেলা খাটয়া উঠিতে যাইতেছিল,—এবার উপরের লোকের গুঁতা লাগিয়া আর উঠা হইল না—কাজেই মাঝামাঝি ভাবে থাকিতে হইল । কোলের ঢেলে নিশেষণে কাঁদিয়া আকুল হইতেছিল,—কামিনীর কোমল কায় কঠোর কর-নীড়িত হটয়া ঘামিতেছিল । বৃদ্ধ বৃদ্ধা ঠেসাঠেসির আলার—কেহ হেলিয়া, কেহ ছলিয়া, কেহ বাঁকিয়া মুখ সিটুকাইয়া বসিয়া চক্ষু সুঁদিয়া ইষ্টনাম স্মরণ করিতেছিল ।

তার উপরে আবার মারামারি—গালাগালি—
হুড়াহুড়িও যথেষ্ট বর্তমান ছিল।

গাড়ীর মধ্যকার কথা এই,—তত্ত্বির
রেলওয়ে স্টেশনে হয়ত তিনদিন পর্য্যন্ত টিকিট
করিয়া কত নরনারী বসিয়া আছে—গাড়ীতে
লোকের স্থান আর হয় না, কাজেই যাওয়াই
ঘটে না। যাত্রারের পচাখশা দ্রব্যাদি ভক্ষণ
করিতেছে, আর স্টেশনের সেই অল্প স্থানে
বহুলোক একত্রে জমাট পাকাইয়া একটা
কোলাহল তুলিতেছে—এবং মধ্যে মধ্যে রেল
বাযুদের ডাকে, হাঁকে, অগুরু-ক্ষীত পদক্ষেপে
ও যুবতীগণের প্রতি কটাক্ষপাতে আপ্যায়িত
হইতেছিল। একথানা গাড়ী আসিতেছে, দূর
হইতে তাহার ধুম দেখিবামাত্র হুড়াহুড়ি
দোড়াদোড়ি করিয়া মোট, বোকা, গাঁটরী,
টানিয়া প্লাটফর্মেরে গিয়া দাঁড়াইতেছে, কিন্তু
গাড়ী আসিয়া পৌহছিলে, হতাশ মেয়ে
চাহিয়া দেখিতেছে,—তিল ধারণের স্থান নাই
লোকের উপরে লোক চাপিয়াছে। স্টেশন-
মাষ্টার তথা রেলের ঢাকটাকিটি পর্য্যন্ত প্রে-
মের গর্কোন্নত মতকে হুই একবার ডাক হাঁক
করিয়া, হুই একজনকে প্রবেশ করাইবার
হলে গাড়ীর মধ্যে হুই একটি তত্ত্বমহিলার
উপরে জুলুম করিল, কিন্তু সর্ব্বত্রই প্রার
হতাশ হইয়া ক্রিান্তে হইল, কেন না, তাহা-
দের সঙ্গী পুরুষগণ আন্তর গুটাইয়া রক্তমূর্ত্তি
ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। গাড়ী স্টেশন

পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, আবার সকলে
দ্রব্যাদি টানিয়া লইয়া স্টেশনের মধ্যে প্রবেশ
করিল।

রেলগাড়ী ছাড়িয়া পথে চল,—ঐ এক-
রূপই দৃশ্য! কেবল জনস্রোতের বিশাল
প্রবাহ। দেখিলে বোধ হয় যেন কোন কারণে
বঙ্গের রক্তগৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অথবা
কোন কারণে বঙ্গের সমাজবন্ধন বিচ্ছিন্ন
হইয়া গিয়াছে, তাই আজ মাতা, পুত্র, ভ্রাতা
ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, যুবক যুবতী, কিশোর
কিশোরী, গৃহবিরাগোপক সকলে ছুটিয়া চলি-
য়াছে। দোকানীগণ বহুদিনের সঞ্চিত পচা
খশা দ্রব্য চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে,
ঘোষানী দুগ্ধভাণ্ড হাতে করিয়া জল বোচিয়াই
পরলা লইতেছে। গ্রামের মধ্যে বাজারের
সরাইয়েরে এত লোকের স্থান কোথায়?
অনুধ্যাপ্তা কুলের বধু ধানের ক্ষেতের পাশে
মামাখণ্ডেরে সম্মুখে বসিয়া চিড়া ভিজাই-
তেছে—বৃকতলে শয়ন করিতেছে। এইরূপ
সর্ব্বত্র—এইরূপ সাধারণ ব্যবস্থা।

• যেখানে সেখানে পৃথসলিলা ভাগীরথী
অবহিতা—সেই সেই স্থানে লোক আসিয়া
পূর্ণ হইতেছে। গ্রামের লোকের আহারাভাব
ঘটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত, তরকারি, দধি, দুগ্ধ
বিশুণ মূল্য দিয়াও পাইবার উপায় নাই।
চিনি মিশ্রী একবারেই ছুআপা। সে বাহা
ইউক,—এত জনতার, এত গোলযোগে সর্ব্ব-

এই ভীষণ বিহুটিকা-ব্যাধি করাল মূর্তিতে দেখা দিয়াছিল। বাতীগণের মধ্যে মড়ক লাগিয়া গিয়াছিল। জননী হয়ত পুত্রকে লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন,—স্নেহাধার নয়নমণি পুত্রকে কালের কোলে ডালি দিয়া পুত্রশোকে হাহাকার করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন। সতী হয়ত পতি-পতিসহ “ঘোড়ে গঙ্গাস্নান” করিতে আসিয়াছিলেন,—শেষে জন্মের মত ঘোড় ভাঙ্গিয়া সিন্ধের সিন্ধুর মুছিয়া নয়নজলে বক্ষবিন্দিত করিতে করিতে উদাস-প্রাণে হতাশ বিহ্বল-চিত্তে বাড়ী চলিলেন। ভগিনী ভ্রাতা হারাইলেন, ভ্রাতা ভগিনীকে চিতার আগুণে ভস্ম করিয়া দেশে গমন করিলেন। পথে, ঘাটে মাঠে সর্বত্রই মড়ক—সর্বত্রই হাহাকার!

আরও উপসর্গ আছে। এই অর্দ্ধোদয় যোগে চোর, জুরাচোর ও দস্যুগণের পূর্ণ স্বেযোগোদয় হইয়াছিল। ভীষণ জনতার কাহারও অর্থ শুদ্ধ পকেট অদর্শন হইতেছে, কাহারও গাঁটরী অপহৃত হইতেছে, কাহারও ব্যাগ বা বস্ত্র হারাইয়া যাইতেছে। অনেক খুঁটী লাহিত ও অপমানিত হইতেছে—অনেকস্থলে অনেক প্রকারের কুকার্য্য সংঘটিত হইয়া বাইতেছে।

নীলরতন রায়, তাঁহার মাতা এবং জী সোণামুখীকে লইয়া অর্দ্ধোদয়ের পবিত্র যোগে গঙ্গাস্নান করিতে নৈহাটী আগমন করিয়া-

ছিলেন। সঙ্গে গ্রামস্থ ভ্রাতৃত্ত্র জীপুত্রকে আরও দশ বারজন ছিল।

সন্ধ্যার পরে বখন তাহারা গঙ্গাস্নান করিয়া বাগার ফিরিতেছিল, সেই সময়ে গঙ্গাভীরে তারি একটা জনতা হইয়া উঠিয়াছিল,—কেন সহসা এত জনতা, এত তিড়, এত ঠেলাঠেলি, হড়াহড়ি, পেগাপেসি, মিশামিশি, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি, মারামারি হইল, তাহার কারণ কেহই কিছু ঠিক করিতে পারিল না। একটা বৃদ্ধা গঙ্গাস্নান করিয়া বাইতেছিল, এই ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া মানব-চরণ-দলিত হইয়া সে গঙ্গালাভ করিল। লোক সকল এহার খাইয়া,—দলিত ও পিষ্ট হইয়া, ব্যুমিয়া ব্যথা পাইয়া বাহির হইল,—কিন্তু কোথায় গিয়াছে দলন্ত কে কোন দিকে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, কে কোণার রহিয়াছে, তাহার অজ্ঞান করিতে অনেকক্ষণ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল।

নীলরতনের দলও এইরূপ বিধ্বস্ত ও বিচ্ছিন্ন,—নীলরতন বলিষ্ঠ যুবক, কিন্তু বল-প্রয়োগে তিনি হাঁচোট খাইয়া একধারে পড়িয়াছিলেন,—কোন একটা প্রবল শক্তি যেন তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া তাঁহার দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। জনতার বেগ একটু মন্দ হইলে, তিনি তাঁহার দলস্থ সকলকে অজ্ঞান করিলেন,—সকলকেই একস্থানে একত্রে সাক্ষাৎ পাইলেন। কিন্তু “সে কই?”

কে সে ? নীলরতনের জ্যৈষ্ঠাশ্রমখী ।
সোণামুখী কোথায় ?

নীলরতনের ধর্ম-ভ্রাতা অতি দ্রুত স্পন্দিত
হইয়া উঠিল,—ছুটিয়া আবার সেই মন্দিরভূত
বিচ্ছিন্ন জনতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । চারি-
দিকে ছুটিয়া : ছুটিয়া অহুসন্ধান করিলেন ।
কিন্তু সে কই ! সোণামুখী কোথায় ?

বেশানে মাতা ও অন্তান্ত সকলে দাঁড়াইয়া-
ছিলেন, নীলরতন তথায় ফিরিয়া আসিলেন,
মনের আশা হয় ত এতক্ষণ সোণামুখী তথায়
আসিয়া পঁহুঁছিয়াছে ! উপস্থিত হইয়া দেখি-
লেন, সোণামুখী সেখানেও নাই ।

নীলরতনের চক্ষু ফাটিয়া অল বাহির
হইল । সহসা, সোণামুখীর অন্তর্দানে তাহার
বক্ষপঙ্কজ ধসিয়া বাইতে লাগিল । বাষ্পরুদ্ধ
কণ্ঠস্বরে বলিলেন, “সে কই ?”

“সে কই ?—বোমা কোথায় ? ওগো,
তোমরা আমার লক্ষ্মীমাকে খুঁজিয়া দেখ,
স্বামী আমার কি হ’ল—সে আমার কোথায়
গেল !” নীলরতনের জননী হাহাকার করিয়া
কাঁদিয়া উঠিলেন । সঙ্গীগণের মধ্যে আরও
তিন চারি জন গভ্রলোক এদিক ওদিক ছুটি-
লেন । ইহার আগেই নীলরতন অহুসন্ধানার্থ
পুনরায় গমন করিয়াছিলেন ।

কিরণক্ষেপ পরে সকলেই ফিরিয়া আসি-
লেন—সোণামুখীর সন্ধান কোথাও মিলিল
না । নীলরতনের মাতা কাঁদিতে লাগিলেন,

সন্দের জ্যৈষ্ঠাশ্রমখী ও হা-হতাশ করিতে লাগি-
লেন ; নীলরতনের বুক ফাটিয়া : বাইতে
লাগিল । তখন পরামর্শ স্থির হইল, জ্যৈষ্ঠাশ্রম-
দিগকে বাসায় রাখিয়া, পুরুষগণ চারিদিকে
সোণামুখীর অহুসন্ধানার্থ বাহির হইবে ।

তাহাই হইল । সকলে বাসায় গমন করি-
লেন,—কেবল নীলরতন গঙ্গার তীরে তীরে
ছুটিয়া ছুটিয়া সোণামুখীকে খুঁজিয়া বেড়াইতে
লাগিলেন । তৎপরে থানায় গিয়া সংবাদ
দিগলেন, এবং গ্রামের মধ্যে গৃহস্থের বাড়ীতে
বাড়ীতে, বাজারের প্রত্যেক দোকানে
দোকানে, যাজ্ঞীদিগের প্রতি বাসায় বাসায়
খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লাস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু
কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না ।

নীলরতন বাহুজ্ঞান বিরহিত,—রাজি
তৃতীয় প্রহর অতীত । সমস্ত স্থান ঘুরিয়া যখন
কোথাও সোণামুখীর সন্ধান মিলিল না, তখন
তিনি আবার গঙ্গাতীরে ছুটিলেন । মুখে
কোন কথা নাই, শুধু এক একটি উচ্চ দীর্ঘ-
শ্বাস তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া শূন্যে বিলীন
হইতেছিল ।

গঙ্গাতীর তখন কতকটা জনশূন্য—নিশ্চল ।
যাজ্ঞীগণ সকলেই বাসা লইয়াছে । কল্ কল্
শব্দ শব্দে ভাগীরথী-প্রবাহ বহিয়া চলি-
তেছে । দূরে দূরে পালতোলা নৌকা ভাসিয়া
চলিয়াছে, - কতক বা তীরে বাঁধা রহিয়াছে ।
শেষরাত্রির প্রোচ্ছন্ন নক্ষত্রগুলি গঙ্গার নিশ্চল

সলিলে আপন আপন রূপের ছটা ছাড়িয়া দিয়াছিল ।

নীলরতন গঙ্গার তীরে তীরে সোণামুখীকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাসের ব্যথিত স্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—“সোণামুখি, প্রাণের সোণামুখি !—তুমি আমার কোথায় ?”

কেহ উত্তর দিল না । কেহ সে কথা শুনিল না । করুণহৃদয়া প্রতিধ্বনি একবার সে কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছিল, আর গঙ্গার বক্ষ দিয়া বায়ুপ্রবাহ হঠাৎস্বরে সে স্বর বহিয়া বৃক্ষশাখা তাপিত করিয়া দিয়াছিল । নীলরতন বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুটস্বরে বলিলেন, “সোণামুখী—যাহাকে না দেখিলে একদণ্ডও বাঁচিতে পারি না—যে আমার জীবনের ধ্বংসাত্মক—সে কোথায় গেল ?—আমার সে কই ?”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ক্রমে রাজি প্রভাত হইয়া গেল ;—পূর্ক-দিক্ভাগে হৈমকিরণছটা বিকীর্ণ করিয়া দিন-দেবের সমুদয় হইল । বিহঙ্গকুঞ্জে, বাতী-দিগের কলরবে, দোকানদারগণের আয়-জিনিষের প্রশংসাবাদে সমস্ত গ্রামখানি মুখ-রিত হইয়া উঠিয়াছে ।

আজি বাতীগণ বাতী কিরিয়া বাইবে,

তাই সকাল সকাল গঙ্গায়ান করিয়া লই-তেছে : প্রভাত হইতেই সকলে মানার্থী হইয়াছে,—কেহ স্নান, করিতেছে, কেহ স্নান করিয়া উঠিয়া স্তব পাঠ করিতেছে, কেহ সিন্ধুবস্ত্র পরিভ্যাগানন্তর শুকবস্ত্র পরিধান করিতেছে । আগ্রীব নিমজ্জমানা কুলবধূগণ উপরে শতদল ভাসিতেছে । সমস্ত রাজ-বিলাসিনীর বিলাসকুঞ্জে কাল কাটাইয়া যাইয়া আঁখির কামকটাক লইয়া, কাণ্ডজানহীন বর্ণজানশূন্য “হুতাং পুরোহিতগণ” বজমান খুঁজিয়া লইয়া মত্তপাঠ করাইতেছে । সহসা শুনিবে, তাহারা সংকৃত কি আরবী অথবা পার্সীভাষা গড়াইতেছে, তাহায় কিছুই বুঝা যায় না ।

হায়, বেদমন্ত্র ! আজি তোমার কি দুর্দশা ! একদিন তুমি উদাসাদি স্বর সংযোগে প্রজ্ঞা-শীল ব্রাহ্মণের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়া, দিক্‌বধূকে আকুল করিয়া তুলিতে, আর আজ তুমি “ক”—অক্ষর-জ্ঞানবর্জিত লুচি-ভাজা বাসুনের বিকৃতকণ্ঠ হইতে ভগ্নপদ চূর্ণ-কৃতভাবে উচ্চারিত হইতেছ ! দোষ তোমার নহে, আমাদের,—আমাদের হিন্দুসমাজের, আমরা সব হারাইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও হারাইয়াছি—কিন্তু তোমাকে হারাইয়াছি বলিয়াই, আমরা অধঃপাতের গুহার এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছি !

নীলরতনের প্রাণের সকলেও বাতী বাই-

বেন। নীলরতন সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া, এই মাত্র ভগবদ্বরের বাধাটুকু লইয়া বাসার কিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার চক্ষুর ঘোর লোহিতরাগে রঞ্জিত, উদাস-বিফারিত।

নীলরতনের মাতা কাদিতে কাদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বাবা! আমার বোমা কোথায়?”

নীলরতনের চক্ষু দিয়া স্রোত বহিল। গলা কাড়িয়া, কঁকরু কহিলেন,—“আর তাহাকে পাইলাম না। বুঝি এ জন্মে আর পাইব না।”

মাতা উঠেঃস্বরে কাদিয়া উঠিলেন। কাদিতে কাদিতে বলিলেন,—“ওগো, আমার কি হ'ল! আমি কি আমার গৃহলক্ষ্মীর স্বর্ণ-প্রতিমা গলার বিসর্জন দিতে আসিয়াছিলাম! আর কি মার! সেই দেহ-ভক্তি মাথান সুল্লর মুখখানি দেখিতে পাইব না? আমি কেমন করিয়া কি বলিয়া গৃহে কিরিয়া লাইব?”

নীলরতন বলিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা নীলরতন বুঝিতে পারিলেন না। বুঝি, মাতার ক্রন্দনে সেই ব্যথিত হৃদয়ে আরও বৃশ্চিক সংঘর্ষের জ্বালা অন্তত্ব করিয়াই নীলরতন উঠিয়া পড়িয়াছিলেন।

উঁহাদিগের সহযাত্রী রামগোবিন্দ চক্র-বর্তী বলিলেন,—“নীলরতন! আর শোক করা বৃথা। সকলই ভগবানের ইচ্ছা—বাহা ঘট-বার ঘটয়া গিয়াছে। দেখিতেছ না, কত

লোক মরিয়া বাইতেছে,—মনে কর, তোমার জ্ঞীও মরিয়া গিয়াছেন।”

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নীলরতন বলিলেন,—“ব্যারাম হইয়া আমার কোলের উপরে মাথা রাখিয়া, যদি সোণামুখা মরিত, গলাতীরে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যসম্পন্ন করিয়া বাড়ী কিরিভাম—এ ত তাহা নহে। তাহাকে কোথায় রাখিয়া চলিলাম,—কাহার করে ডালি দিয়া গেলাম! কি বলিয়া মনকে বুঝাইব? হা ভগবান! না জানি, মে আমার কি বিপদে পড়িয়া কোথায় হাহাকার করিতেছে!”

রাম। তা আর কি হবে বল। এখন বাড়ী যাওয়া ভিন্ন আরও কোন উপায় দেখিতেছি না।

নীল। আজিকার দিনমানে একবার ভাল করিয়া খুঁজিতে যাইতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া সহযাত্রীগণের মধ্যে কেহ বলিলেন, আজি আর আমাদের খোঁজাকি নাই; কেহ বলিলেন, এ বেলা থাকিতে হইলে গাড়ীর ভাড়ার পরমা খাইয়া ফেলিতে হইবে; কেহ বলিলেন, আমার শরীরটা বড়ই খারাপ হইয়া উঠিয়াছে—যেদ্রুপ মড়ক, বাড়ী পঁহাছিতে পারিলেই বাচি। কোন ত্রীলোক বলিলেন, আমার বোনের ছেগেটিকে না দেখিয়া, আমি আর থাকিতে পারিতেছি না; কোন কামিনীর

একটি লাউগাছ আছে, পাছে সেটা গাড়ার চোখাপীদের গাভীকর্জুক ভক্তিত হয়, এট মহাদাশঙ্কা জানাইয়া, থাকিবার একান্ত অসম্ভাবনা বিজ্ঞাপিত করিয়া দিলেন ; কোন সন্ধিনী বলিলেন, রায়দের নুতন জানাই আসিবার কথা আছে, জানই ত, বোমা তার ঘেরের বরকে লইয়া আমোদ-পমোদের তার আমার উপরই ক্রম করিয়া রাখিয়াছেন— কাজেই আমার আর তিলান্নি বিলম্ব করা নিতান্ত দ্বন্দ্বহীনতার কার্য্য হইবে।

নীলরতন বলিলেন, “যদি তোমাদের থাকিবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে আমার শোকাক্তা মাতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। আমি রাজির গাড়ীতে বাইব এখন।”

মাতা বাইতে অস্বীকৃতা হইলেন। বলিলেন, “আমি কোন্ প্রাণে বাড়ী ফিরিব ?”

রামগোবিন্দ চক্রবর্তী সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন, “দিনের গাড়ীতে বড়ই ভিড় হইবে—কোন মতেই তাহাতে যাওয়া বাইবে না। কতক বাড়ী চলি, গেলে, আমরা রাজির গাড়ীতেই বাইব।”

তখন বিনা ওজরে সকলেই তাহাতে স্বীকৃত হইল, এবং রক্তদানির উদ্যোগে মনঃ-সংযোগ করিল।

রামগোবিন্দ চক্রবর্তী, নীলরতনকে সঙ্গে লইয়া সোণাখুয়ার অল্পসন্ধানার্থ বাহির হই-

লেন। প্রথমেই তাহার গিয়া থানার উপস্থিত হইলেন।

গজাননের বাড়ী-জমতা হইবে জামিয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়াছিলেন। ক্যান্স হইতে তিনি তখন থানার আসিয়া বসিয়া ছিলেন। দারোগাবাবুর সঙ্গে ঐ বিবরণ কথোপকথন হইতেছিল—এমন সময় নীলরতন ও রামগোবিন্দ চক্রবর্তী তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। নীলরতনের চেহারা দেখিয়াই সহজে প্রতীকমান হইতেছিল যে, এ ব্যক্তি কোন প্রকারে বিপন্ন হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব নীলরতনের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“তোমার কি হইয়াছে ?”

নীলরতন বাস্তবিককর্তে কহিলেন, “সাহেব ! আমার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে।”

মা। তোমার কি প্রকার সর্বনাশ হইয়াছে ?

নীল। কাল সন্ধ্যার পরে, আমরা গজানন করিয়া ফিরিতেছিলাম, সেই সময় গজাতীরে তারি একটি জনতা হয়, আমরা সেট ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলাম—অনেক কষ্টে বাহির হইয়া দেবি, আমাদের একটি স্ত্রীলোক নাই। তার পরে কত খুঁজিয়াছি, কিন্তু আর তাহার সন্ধান পাইলাম না।

মা। সে স্ত্রীলোক তোমার কে হয় ?

নীল। আমার স্ত্রী।

ম্যা। বরস কত ?

নীল। বোল সতের হইবে।

ম্যা। তোমার সন্তানাদি হইয়াছে ?

নীল। না।

ম্যা। হাঁ, হুজুর,—কা'ল সেট সময় হইতেই আমি গঙ্গার তীরে তীরে—গ্রামের মধ্যে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী, বাজারে বাতী-গণের আবাসে আবাসে অহুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—কিন্তু কোথাও সন্ধান পাই নাই।

ম্যা। থানার এজেক্টার কপিয়াছিলে ?

নীল। হাঁ—কালই দারোগাবাবুর নিকটে এজেক্টার করিয়া গিয়াছিলাম।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব দারোগাবাবুর নিকটে “দৈনিক লিপি” পুস্তক চাহিলেন। দারোগা তাহা আনিয়া সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন। পাঠ করিয়া সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি দংশন করিতে করিতে বলিলেন,—“ওধু উহার জী নহে! একই সময়ে আরও একটি নবম বর্ষীয়া বালিকা অপহৃত হইয়াছে।”

দারোগাবাবু কর-কণ্ঠস্বন করিতে করিতে বলিলেন,—“হাঁ,—এজেক্টার করিয়া গিয়াছে। আমরা লিখিয়া রাখিয়াছি।”

ম্যা। কেবল লিখিয়া রাখিয়াই তাহা-বিপক্ষে কৃতার্থ করিয়াছ, না সন্ধানাদি কিছু করিয়াছিলে ?

দারোগা। আজ্ঞা,—তদন্তওই সন্ধানার্থ

বহির্গত হইয়াছিলাম, কিন্তু ফল কিছুই করিতে পারি নাই।

সাহেব অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। শেষে একথানা পত্র লিখিয়া দারোগাবাবুর হস্তে দিয়া বলিলেন, “মোড়ক করিয়া, এখনই ডাকে রওনা করিয়া দাও।

অতঃপর সাহেব উঠিয়া গেলেন। দারোগা বাবু সে পত্র পাঠ করিয়া দেখিলেন। উহা পুলিশের ইনস্পেক্টার জেনারেল সাহেবকে চঠিয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—“গঙ্গা-স্রানের জনতার নৈহাটিতে একটি যুবতা জীলোক ও একটি বালিকা অপহৃত হই-
ছে। স্থানীয় পুলিশের এবং তাহাদিগের অহুসন্ধানে কোন ফল হয় নাই। স্থানীয় পুলিশের দ্বারা এই ঘটনার তদন্তে স্রফলের আশা করা যায় না। সূচত্বর বদমায়েসগণ কর্তৃক এই কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। অতএব অগৌণে একজন বিচক্ষণ গোয়েন্দা পুলিশকর্মচারী পাঠাইবেন।”

নীলরতন রামগোবিন্দের সহিত সেখান হইতে বিদায় লইয়া, সমস্ত গ্রামস্থানি অহু-সন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও সোণামুখীর সন্ধান মিলিল না।

রাত্রি সাড়ে সাতটার গাড়ীতে উঠিবার অন্ত নীলরতন নৈহাটি পরিত্যাগ করিয়া ষ্টেশনান্তিমুখে চলিলেন। বাইতে বাইতে তখনও তিনি কিরিয়া কিরিয়া পশ্চাদ্ধিক

চাটয়া দেখিতেছিলেন,—কিন্তু সে কি আর আসে।

টেশনে গিয়া নীলরতন গাড়ীতে উঠিলেন। শূন্তপ্রাণে, হতাশমনে নৈহাটীর দিকে চাহিলেন,—সেই দীর্ঘপথ, সেই আম্রবাগান, সেই দীর্ঘ দীর্ঘ নারিকেল বৃক্ষ—সকলই রহিয়াছে, আর বৃক্ষি দেখা হইবে না। নীলরতনের বক্ষ ভেদ করিয়া শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ও ব্যথিত হৃদয়ের গভীর কাতরতা সেই সকলের অঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিল, নীলরতন প্রতিমা বিসজ্জন দিয়া গৃহে চলিলেন; এবং বাস্পীয়মান সগর্বে উত্তরাভিমুখে ছুটিয়া বাহির হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্বরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সুখের সংসার।

(১)

পরিবর্তনশীল অদৃষ্টচক্রের গতি বুঝা ভার।
ইহা যে কখন কিরূপ ভাব ধারণ করিয়া
জীড়ার পুত্তলী মানবকে হাসায় কাঁদায়, তাঁহা
কে বলিতে পারে। মহামায়া কুলীনের
মেয়ে,—বড় গরীব হইলেও এতদিন সে বেশ
সুখে সচ্ছন্দে কানারিপাত করিতে ছিল,
স্বামী-সোহাগে জীবন-মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তাহার
কোনও কষ্ট হয় নাই, সদাই হাস্যরসে প্রমত্ত
হইয়া এই দুঃখের সংসারে সুখের খেলা

খেলিয়া তিনজনে বেশ একভাবে জীবন
কাটাইয়া আসিতে ছিল। কিন্তু অদৃষ্টে সুখ
না থাকিলে কে কবে চির-সুখ ভোগের
অধিকারী হইতে পারিয়াছে?

দেখিতে দেখিতে-মহামায়ার অদৃষ্টেনেমী
হঠাৎ পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাহার পরম
পূজনীয় স্বামী হঠাৎ কাল কবলে পতিত
হইল, অভাগিনী মহামায়া জগতের সকল
সুখে জলাঞ্জলি দিয়া চির বৈধব্য-যন্ত্রণার
অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। মহামায়ার বয়স
এখন চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এতদিন
স্বামীসুখে কাল কাটাইয়া জীবনের সন্ধ্যা-
কালে সে ঘোর অন্ধকারে ডুবিল, হরস্ত কাল
তাহার সংসার-সুখাভিনয়ের যবনিকা ফেলিয়া
দিল। হিন্দু রমণীর বৈধব্যের তুল্য যন্ত্রণা
আর কি আছে। সে জীবিত থাকিলেও
মৃত, নিকটে থাকিলেও কেহ তাহাকে ডাকে
না, কেহ তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা
কহে না, তাহার ভাল কাপড় থাকিলেও
পরিবার যো নাই, ভ্রমর রুম-কুঞ্চিত বেশ-
রাশির সংস্কার পরিবার তাহার অধিকার
নাই, রূপ থাকিলেও তাহা দেখাইবার যো
নাই, সে জগতের একটি প্রান্তে একাকিনী
পড়িয়া সেই কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে।
সহানুভূতি করিবার লোক এ জগতে তাহার
আর নাই, মরিয়া যাইলেও কেহ তাহার
প্রতি ফিরিয়া চায় না। হিন্দু বিধবার তুল্য

দুঃখভাগিনী বুঝি জগতে আর কেহ নাই ? মহামায়ার দরিত্রের গৃহিণী হইলেও এতদিন সে কিছুই জানিতে পারে নাই । হিন্দু স্ত্রী স্বামী-সুখে সুখিনী হইতে পারিলে, অনন্ত দুঃখকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে । স্বামী-সোহাগে থাকিয়া অন্তপ্রকার সহস্র দুঃখকেও হিন্দুরমণী দুঃখ বলিয়া মনে করে না । অন্তান্ত জাতীয় রমণীগণের অপেক্ষা এইটুকুই হিন্দুরমণীর বিশেষত্ব এবং এইজন্যই তাহারা সকলের আদর্শ ।

মহামায়ার যৌবন উজ্জ্বল হইয়াছিল । তাহার পুত্র হইবার বয়স অতীত হইয়াছে দেখিয়া প্রতিবাসিনী সকলেই মনে করিয়াছিল—তাহার আর পুত্রাদি হইবে না, কিন্তু অদৃষ্টে ফল থাকিলে—তাহার অন্তথা হইবার নয় । কিছুদিন পরে তাহার পুত্রের পরিবর্তে একটি কন্তারত্ন লাভ হইয়াছে । এখন শেটের কোলে কন্তাটির বয়স একাদশ বৎসর—ন্যূন কমলা । কমলা রূপে গুণে বড় মন্দ নহে, তবে তাহার রূপ যে কাঁচা সোণার মত বা ঝুঁকু গোলাপের মত ছিল তাহা নহে । যেরূপ থাকিলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহ আলোকিত হয়, যেরূপ থাকিলে কেহ ঘৃণা না করিয়া সকলেই তাহার হাতের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে, কমলার রূপ সেইরূপই ছিল । কলিকা প্রায়ুটিতা হইবার পূর্বে স্বভাবতঃ সতেজ ভাব ধারণ করে । কমলা-কলিকার ফুটিবার সময় ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতেছে বলিয়া সমস্ত

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন সতেজভাবে ধারণ করিয়া রূপের ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি হইতেছে । এখন দেখিলে তাহাকে রূপসী না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না । বিশেষতঃ রূপের সহিত তাহার সেই সলজ্জস্বভাবের সংমিশ্রণ হওয়ায় সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বাড়িয়াছে আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে । রূপ লজ্জার আবরণে আবৃত হইলে এইরূপ সুন্দর হইয়া থাকে । যাহার লজ্জা নাহি, সে পরমা-সুন্দরী হইলেও তাহার রূপ মনোনয়নের তৃপ্তি-কর হয় না, নির্লজ্জা স্ত্রীলোকের রূপ থাকিলেও তাহার শোভা নাহি । রূপের মাধুরী বাড়াত্তে হইলে লজ্জাই তাহার একমাত্র উপকরণ ।

(২)

মহামায়ার স্বামী ধর্ম্মানন্দ মুখোপাধ্যায় আজ এক বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন । ধর্ম্মানন্দ দেশীয় জমীদারের অধীনে সামান্ত বেতনের গোমস্তাগিরি চাকুরী করিতেন । যাঁহা আয় ছিল,—তাঁহাতে এক-রূপ কষ্টে সংসার চলিত, তবে মহামায়ার জ্ঞান গৃহিণীর গৃহিণীপনায় ধর্ম্মানন্দের সংসারে কোনরূপ অনাটন হইত না । মহামায়া নিজ কার্যাদক্ষতা গুণে ঐ সন্ন্যাসীর বৈশিষ্ট্য হইয়া চলিতেন । দেখিলে সহজে কেহই তাহাদের দরিত্রতার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিত না । ধর্ম্মানন্দ অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য কর্ম্ম সকল প্রতিপালন করিতেন,

ত্রিসন্ধ্যা ও বিষ্ণুপূজাদি না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অবধি তিনি এই কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এই জন্ত তিনি ইংরাজী লেখা পড়া জানিলেও সরকারী চাকুরী করিতে পারেন নাই। ধার্মিক ধর্ম্মানন্দ ধর্ম্মকার্যেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রতিদিন আহালাদির পর অপরাহ্নে তিনি প্রভুর কাছে বাহির হইতেন। ইহকালের জন্ত অল্প মাত্র সময় নষ্ট করিয়া পরকালের চিন্তাতেই তিনি সঙ্গুল বিব্রত থাকিতেন। উত্তমকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি এ কার্যে তিলমাত্র অবহেলা করিতেন না। মহামায়াও সে কালের স্ত্রী, ধর্ম্মক্ষেত্রে স্বামীর সহায়তা করিয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংসারে ধর্ম্মকে সহায় করিয়া মহামায়া স্বামী ও কন্তাটির সহিত একদিনের জন্ত কোন কষ্ট পান নাই। কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায় না—চিরস্থ কাহার ভাগ্য ঘটে না বলিয়া, মহামায়া স্বামীর মৃত্যুর পর হঠতে আজ একবৎসর সাতিশয় কষ্ট অল্পভব করিতেছেন।

বিলাসপুরে তাহার শশুরবাড়ী, স্বামীর মৃত্যুর পর ছহিতাকে লইয়া সেই নিবাসপুরাতে তাঁহার থাকিতে আর মন উঠিল না। এখানে তাঁহার কোন আশ্রয় নাই, যে বিপদে আপদে তাহাদের দেখিবে। বিশেষতঃ

কমলা বড় হইয়াছে, আর তাহার বিবাহ না দিলে ভাল দেখায় না, যেমন করিয়া হউক, এই বৎসর তিনি কন্তার বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছেন। বিবাহে অর্থের আবশ্যক, কিন্তু তাঁহার ত অর্থ নাই, অবশেষে তিনি নিজের বাস্তবিক করতঃ দুইশত টাকা মাত্র সংগ্রহ করিয়া শিত্তগুহ কুমারপুরে আগমন করিলেন। শিত্তকূলে এখন তাঁহার বৃদ্ধা জননী, কনিষ্ঠ সহোদর, বধু ও দুইটা ভ্রাতুষ্পুত্র বর্তমান, ভ্রাতার অবস্থাও তথৈবচ, তিনিও ছাপোষা লোক। তবে হিন্দু হাজার দরিদ্র হইলেও একরূপ নিরাশ্রয় আশ্রয়কে ফেলিতে পারে না। ভ্রাতা রুদ্ররাম ভগ্নিকে আশ্রয় দিয়া নানাপ্রকারে সাধনা করিলেন। হিন্দু যতই দরিদ্র হউক না কেন, তাহারা চিরকাল এ প্রকার অনুমোদন করিবে।

রুদ্ররাম ভগ্নির শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—“দিদি ! তুমি আর শোক করিও না, যদি আমরা দিনান্তে একমুঠা খাইতে পাই, তাহা হইলে কমলাও তুমি বাদ পড়িবে না।

মহামায়া বলিলেন—“ভাই ! ভগবান তোমাকে দীর্ঘকালী করুন, পুত্রটা তোমার চিরজীবী হউক, চাটী ভাতের ভাবনা যে ভাবিতে হইবে না—তাহা আমি জানি। কিন্তু ভাই ! এখন কমলার ভাবনাই আমার মহা ভাবনা হইয়াছে। একদণ্ড ঐ দুইশত

টাকার মধ্যে বাহাতে তাহাকে সংপাত্রে অর্পণ করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর, এখন ত এ তার তোমার উপরেই পড়িল, তুমি না করিলে আর আমার কে আছে? রুদ্ররাম বলিলেন—“দিদি! আমি সে বিষয় নিশ্চিত নাই, প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, এখন বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেই শুভ কার্য্য সমাধা হয়। এইরূপে ভ্রাতা ভগ্নিতে কমলার বিবাহের বিষয় লইয়া ঘোর চিন্তায় পড়িলেন। দরিদ্র কুলীনের ঘরে কত বড় হইলে, তাহাদের যে কিরূপ চিন্তানলে দগ্ধ হইতে হয়—তাহা ভুক্তভোগী মাঝেই অবগত আছেন।

(৩)

পূর্বে আমাদের সমাজে বিবাহের বড়ই বাধাবাধি নিয়ম ছিল। এখন সে নিয়ম অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া গিয়াছে। পূর্বে সমান ঘর ও সংপাত্র না হইলে বিবাহ হইত না! এখন আর ঘর বর তত কেঁহ দেখে না। এখন অর্থের সমান সর্সাপেক্ষা বেশী, অর্থ থাকিলে, সে কুলীন না হইলেও কুলীন পদবাচ্য, সে নিগুণ হইলেও গুনবান। পূর্বে কিন্তু অর্থের কত কেহ জাতি মর্যাদা নষ্ট করিত না। যে যেমন ঘর, সে সেইরূপ ঘরেই কত সস্ত্রদান করিত। দেখিবার মধ্যে দেখিত কেবল পাত্রটাকে; পাত্রটি সংপাত্র হইলেই তখনকার লোক কত সস্ত্রদান করিতে দ্বিধা ভাবিত না। এখন

সংপাত্র ও স্বঘর দেখিয়া বিবাহ হয় না, তাহার বিষয় আশার কিরূপ আছে—ইহা প্রথম লক্ষ্যস্থানীয় হইয়াছে। তখন সংপাত্রে কস্তাদান সকলেরই লক্ষ্য ছিল। হিন্দু চিরকাল অদৃষ্টবাদী; তাহারা জানিতেন অদৃষ্টে সুখ থাকিলে কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম হইবে না! বাস্তবিক পাত্র চরিত্র-বান হইলে, তাহাতে কত সস্ত্রদান করিলে কষ্ট হইবার কোন কারণ নাই; যেমন করিয়াই হউক, সে উদরার্নের সংস্থান করিতে পারিবে; নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে না পারিলেও চরিত্রবান স্বামী তাহার জীপুত্র লইয়া এইরূপ সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে, সে বিষয় সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। নতুবা তুমি বতই ধনীর পুত্রকে কত সস্ত্রদান কর, তাহার সুখ হইবে না। আজীবন একটা না একটা মহা কষ্টে তোমার প্রাণের কত দুঃখ পাইবে! একপ দৃষ্টান্ত আমরা শত শত চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি। রুদ্ররাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স বেশী না হইলেও তিনি পূর্বের প্রথা বড় ভাল বাসিতেন। তিনি জানিতেন কস্তার অদৃষ্টে বাহা আছে তাহা নিশ্চয়ই হইবে; তবে পিতামাতা বা অভিভাবকগণের কর্তব্য যে বাহাতে কত সংপাত্রে পড়ে। আর তিনি ধনী সংপাত্রই বা কেমন করিয়া সংগ্রহ করিবেন, সে রূপ পাত্রের মূল্য যে অনেক,

কাজেই তাঁহাকে অবস্থাস্থানে ব্যবস্থা করিতে হইবে, অথচ কমলার মুখের দিকে চাহিতে হইবে; জাঁতিকুল বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। রুদ্ররাম আপনার কর্তব্য কার্য্য মনে মনে স্থির করিয়া ভায়েদ্বি-
টার জন্ত যথাসম্ভব সংপাত্রে অহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

(৪)

আমরা মতই কেন আশ্চর্য্য করি না, জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ বিষয়ে আমাদের কোন আশ্চর্য্য নাই! ইহা ঈশ্বরাদীন কার্য্য—ইহাতে মানবের কোন হাত নাই। পুত্র জন্মবার পূর্বে ভগবানের রূপায় মাতৃ-
স্তন্থে যেমন ছুঁকের সঞ্চার হয়। কস্তা জন্মাইবার পূর্বে তাহার পাত্রে জন্মগ্রহণও সেইরূপ বিধাতৃবিধান, তবে চেষ্টা করিয়া সেই পাত্রটির সন্ধান করিতে হইবে, তাহা হইলে আর কোন চিন্তা করিতে হইবে, আপনাপনি কোথা হইতে সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে; কোন বাধাই মানিবেনা। যতদিন সেই বিধি-নির্দিষ্ট পাত্রের সংযোগ না হইবে, তত দিন ভূমি যত চেষ্টাই কর, একটা না একটা বিষ উপস্থিত হইয়া সে সম্বন্ধ ভাবিয়া যাইবে! ধনী ও দরিদ্র সকলের পক্ষেই এই নিয়ম, এ নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। এই জন্তই বলিতে হয় জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বর-
দীন, ইহাতে মানবের কোন সাধ্য নাই!

রুদ্ররাম আহা! নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আজ তিন মাস হইল নানা স্থানে কমলার পাত্রে সন্ধান করিতেছেন। কমলার বিবাহের জন্ত শুধু রুদ্ররামের ভাবনা নয়, তাহার জননী, ভগ্নি ও স্ত্রী সকলেই মহা ভাবিতা হইয়াছেন। চেষ্টা করিলে কিনা হয়; বিশেষতঃ যখন ভবিতবোর ভাগ্য-স্থানের আকর্ষণ রহিয়াছে; তখন চেষ্টা করিলেই অবশ্য পাত্র মিলিবে। যে যেমন, তাহার সেইরূপ সংযোগই হইবে। যোগাং যোগ্যেণ স্যাত্তে” শাস্ত্রের কথাটা আদৌ মিথ্যা নহে। রুদ্ররাম বচকটে ছয় মাসের পর গোবিন্দপুরে নিত্যানন্দ চট্টো-
পাধ্যায়ের পুত্রের সহ কমলার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। নিত্যানন্দ গোবিন্দপুরের স্কুলে ২৫ টাকা বেতনের পণ্ডিতছিলেন। সংসারে স্ত্রী, চারিটা পুত্র আর এক কস্তা। কস্তাটির বিবাহ দিয়া তিনি পূর্ব হইতেই দায়োদ্ধার হইয়াছিলেন। চারিটা পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মনমোহন স্ত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু পিতার অবস্থা তাদৃশ ভাল নয় বলিয়া তিনি ইচ্ছা আর পড়িতে পাইতেছেন না। ইহাতে সন্তোষ তাহার মনে ভয়ানক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ অর্থাভাবে পড়িয়া পুত্রের ইচ্ছা সন্তোষ তাহাকে পড়াইতে পারিতেছেন না;—ইহাতে তিনি যে কদরে বিরূপ দুঃখ পাইতেছেন তাহা সচক্ষেই বিবেচ্য। পুত্রের

লেখা পড়া হইতেছে না। ইহাতে কোন পিতামাতা স্তম্ভিত হন। নিত্যানন্দ এক বেলা আহারের বন্দোবস্ত করিয়া পুত্রের পাঠের জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুইমাস পরে তিনি পুত্রকে সংস্কৃত কণ্ঠে প্রবেশ করিয়া দিলেন কিন্তু একরূপ অন্ন আয়ে সংসার চালাইয়া একটি পুত্রকে উচ্চশিক্ষা প্রদান বড়ই কষ্ট কর, নিত্যানন্দ ক্রমশঃ বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে জগতের লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়—তাহাদের হিংসারক্তি প্রবল হয়, স্বার্থপর জগতের রীতিই এইরূপ। তোমার উন্নতিতে জগতের সকলেই হিংসা করিবে, প্রত্যক্ষ না হউক পরোক্ষেরূপে করিতে ছাড়িবে না। কিন্তু পিতা অপেক্ষা পুত্র যদি ধনী বা শিক্ষিত হয়—তাহা হইলে তাহাতে কেবল পিতা মাতার কোনরূপ হিংসার উদয় হয় না! পুত্র পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইলে তাহার অন্ন-শিক্ষিত পিতার মনে কোনরূপ নীচ কবিত্তি প্রবল হইবে না। স্বার্থপর জগতে এমন নিঃস্বার্থ—পর বন্ধু, ইহকালের একমাত্র দেবতা, পুত্রের আর কে আছে ?

নিত্যানন্দ যখন পুত্রের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় লইয়া মহা বিব্রতে পড়িয়াছেন, কি করিবেন, কি করিলে তাহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, এই চিন্তায় তিনি মহা চিন্তিত। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার সেই সময়েই রুদ্ররাম বন্দোপাধ্যায়ের

সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রুদ্ররাম পূর্বে হইতেই তাঁহার জাতাসের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মিনতি করিয়া তাঁহার নিকট পুত্রের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। প্রথমতঃ এত অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ দিতে নিত্যানন্দের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া শেষে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। কথা বার্তা স্থির হইয়া গেল। কুলীনের মর্যাদা স্বরূপ দুইশত টাকা নগদ লইয়া তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন—তাই! আমার বিবাহ দিতে এখন ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু মনমোহনের পাঠের ব্যয়ানুকূল্য জন্য ২০০ টাকা নগদ গ্রহণ করিতেছি। তবে অল্প বিষয় আমার কিছু বক্তব্য নাই; তুমি যেরূপ করিলে কোনরূপ কষ্ট হইবে না—তাহাই করিবে, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। এ বিবাহে ভবিষ্যৎকালের স্থির সংযোগ হইয়াছে বলিয়া, আর কোন গোলাযোগ হইল না।

• (৫)

শুভদিনে শুভকালে মনমোহনের সহিত কমলার শুভ পাণিগ্রহণ কার্য্য নিবিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। মহামায়া আজ একটি মহা চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন! তাঁহার প্রাণের কণ্ঠা কমলাকে প্রার্থনীর পাত্রে সমর্পণ করিয়া সুখী হইলেন। রুদ্ররাম

ও একটি অবশ্য-বর্তব্য-কর্ম প্রতি পাণন করিয়া নিজে সন্তুষ্ট হইলেন। মনমোহন নির্ঝিল্লি কলেজ পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময় হইতেই তাহার পিতার স্বাধা ভগ্ন হইল, ক্রমশঃ নানা পীড়ার আক্রান্ত হইয়া তিনি দৃষ্টি শক্তি হীন হইয়া গেলেন। এই সময় হইতেই মনমোহনের দুর্ভাগ্যাবস্থাপাত হইল। মনমোহনের সমস্ত আশা ভরসা এককালে লোপ পাইল। অগত্যা তাঁহাকে কলেজের পাঠ বন্ধ করিয়া পিতার কার্যোত্তী হইতে হইল। নতুবা তাহার পুত্রনীর পিতামাতার ও ঘরের ভাগ দুইটিকে প্রতিপালন করিবে কে ?

হুঃখ এখন মানবকে আক্রমণ করে, তখন তাহার দলবল সহ আসিয়া উপস্থিত হয়। মনমোহন বৎসরের মাত্র পিতার পদে কার্য্য করিতে না করিতে তাহার জননী স্বামীর পীড়ার জ্ঞাত এবং অহোরাত্র সংসারে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া অপটু হইয়া পড়িলেন। কাজেই মনমোহনকে বাধ্য হইয়া তাহার স্ত্রীকে আনিতে হইল, নতুবা তাঁহার সংসার অচল হয় ; সমস্ত দিন অর্থের চিন্তায় তাঁহাকে কার্য্য স্থানে থাকিতে হইল, কেইবা ছোট ছোট ভ্রাতাগুলিকে দেখে, আর কেইবা বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা গুরুত্ব করে, একাত্ত সকল দিক বজায় রাখা যায় না ?

কমলা এখন গৃহের কাজ কর্ম সমস্তই

শিখিয়াছেন। জননীর স্তায় গৃহিণীর নিকট গৃহকর্ম শিখিতে তাহার কম দিন যায়। বিশেষতঃ তিনি দরিদ্রের কষ্ট, গৃহকর্ম তাহার অবশ্য জানা কর্তব্য। তাহা ব্যতীত কমলা রামায়ণ, মহাভারত বেশ পড়িতে পারিতেন। তাঁহার মাতা-মহী অবসর সময়ে কমলাকে কীর্তিবালী বা কালীরাম দাসের রামায়ণ মহাভারতের বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিতেন। অকিঞ্চিৎকর নাটক, নভেল পাঠে তাঁহার তাদৃশ রুচি ছিল না। এখনকার স্ত্রীলোকেরা যেমন লেখা পড়া জানিলে একটু শিক্ষার অহঙ্কার দেখান তখন স্ত্রীলোকগণ শিক্ষার বিষয় কিঞ্চিৎ আচারাদির বিষয় পুরুষের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জিত হইত।

কমলা আজ একবৎসর হইল, শিশুর বাটী আসিয়াছেন। এত অল্প বয়সেই তিনি স্বামীর হুঃখের ভাগ লইতে শিখিয়াছেন, তিনি এখনকার রমণীগণের মত পইচ্ছায় কোন কাজ করিতেন না। গৃহকর্ত্তী স্বামী-দেবীর মত হইয়া সমুদয় কাজ করিতেন। ছোট ছোট দেবরগুলিকে সহোদরের স্তায় যত্ন করিতেন। কমলা অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া কিসে সংসারের সংস্থাপন হইবে ; কিসে সংসার ভালরূপ চলিবে, কিসে স্বামীর মনস্থখী করিতে পারিবেন—ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষাতেই নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার গৃহিণী

পণা দেখিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। দরিদ্র কন্ডা শ্রমশীলা না হইলে তাহার কষ্টের একশেষ হয়। মনমোহনের জননী বিন্দুবাসিনী বধুমাতার গুণে বশীভূতা হইলেন। কমলা এখন আর বৃদ্ধা ঋক্সদেবীকে কিছুমাত্র পরিশ্রম করিতে দেন না। বিন্দুবাসিনীকে কেবল কর্ত্রীর কার্যা করিতে হয়; কমলা গুরুদেবী থাকিতে আর কর্ত্রী পদে নিযুক্ত হইতে চাহেন না। মনমোহন পিতার দ্বার অতি অমায়িক। ঐক্ৰুতি সম্পন্ন, সকলেই তাহার গুণের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেনা; এক্ষণে তাহার জীব গুণে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাহাদের এই গুণে মিলনের প্রশংসা করিতে লাগিল।

৬

কমলার আগমনে গৃহের পূর্ব সৌন্দর্য্য যেন পুনরায় উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। মনমোহন প্রতি মাসে সংসার খরচের দ্রব্যাদি জননীর নিকট আনিয়া দেন। জননী সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দৈনন্দিন খরচের সমস্ত দ্রব্যাদি বধুমাতাকে প্রদান করিতেন। কমলা সেই দৈনিক খরচের দ্রব্য দেড়দিন করিয়া চালাইতেন। ঋক্সদেবী যে তত্ত্ব প্রত্যাহ রক্ষন করিতে দেন, তাহা হইতেও কমলা একমুষ্টি বাঁচাইয়া রক্ষন করিতেন, “নিজের না হয় চাটি কম হইবে” এরূপ মনে করিয়া আজকের জিনিস কাগ

করিয়া সংসার চালাইতেন। কমলার প্রাণান্ত পরিশ্রম দেখিয়া মনমোহন জীব নিকট দিন দিন বশংবদ হইতে লাগিলেন। এরূপ জীব গুণে কোন স্বামী না মুগ্ধ হয়।

মনমোহন এত কষ্টে পড়িয়াও লেখা পড়ার উন্নতি করিতে একদিনের ক্ষত্র বিরত হন নাই। রজনীযোগে আহাৰাদির পর তিনি শায় সমস্ত রাত্রি রথুবংশ, ভট্ট, কুমার প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করিতে লাগিলেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি বেশ সংস্কৃত শিক্ষার পারদর্শী হইলেন। এই সময় ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের পদশূন্য হইলে, মনমোহন আবেদন করিলেন, অধ্যক্ষ কর্তৃক তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইল। মনমোহন প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া বেশ দক্ষতার সহিত বালকগণকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এই পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেতনও বৃদ্ধি হইল। সংসার বেশ সুশৃংখলার সহিত চলিতে লাগিল। কমলার প্রাণান্ত পরিশ্রম ও মনমোহনের একান্ত অধ্যবসায় এবং একান্ত ধর্ম্মাভিরাগে তাহাদের সংসার আবার শটনৈশটনৈশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। পাঠক! বলিতে পারেন কি? ইহা কার গুণে। আমরা বলি—ইহা দুইটিরই গুণে? দুইটা জিনিস একত্র হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। দুই দ্রব্য একত্র হইলে; স্বামী জীব

হুইটী মন একত্র সম্মিলিত হইলে সংসার শাস্ত্রময় হয়। সে সংসারে থাকিয়া সুখ দাবদস্ত মানব অনারসেই সুখ লাভ করিতে পারে। সংসারাত্মক মানবের পরীক্ষা স্থল। এখানে প্রবেশ করিয়া যে ধর্ম উপার্জন করিতে পারে, তাহার জীবন ধারণ সার্থক হইয়াছে, সে ধর্মবীর নামে খ্যাত হইতে পারে। আমাদের পূর্বকালের পূজাপাদ মহর্ষিগণ কেহই সংসার ধর্মের জলাঞ্জলী প্রদান করেন নাই। সংসারে ধর্মভাবে থাকিতে পারিলে সংসার ভূলা ভান আর নাই।

বিবাহের আট বৎসর অতীত হইয়াছে, মনমোহন গোবিন্দপুরের বিজ্ঞান্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতার কোন স্থানে অধ্যাপনা করিয়া এবং ২০টী গৃহের গৃহাধিকার নিবন্ধ হইয়া বেশ দশ টাকা উপার্জন করিতে লাগিলেন। কালে তাহাদের সেই সুখের সংসারে একটি সুখের ফুল ফুটিল। কমলার একটি পুত্র সন্তান হইল। মনমোহনের তখন অর্থের তাদৃশ অভাব ছিল না। পিতামাতাকে কলিকাতার রাখিয়া চিকিৎসা করাইয়া তাহাদের চিকিৎসা করাইয়া কপকিং আরোপ্য করাইয়াছেন। পুত্রের স্বপ্নে নিভা-
নন্দ ও বিদ্যুৎবাসিনী সংসারে পুনরায় সকল সুখে সুখী হইবেন। মনমোহন প্রত্যক্ষ দেখিয়া পিতা মাতার পূজা করিয়া গুণ হইল। সংসারে প্রবেশের ক্ষণেই সকলের এক-

মাত্র লক্ষ্যমান; ধর্ম বন্ধার সাধিতে পারিলে দুঃখের সংসারত সুখের হইয়া থাকে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নিবেদন।—ভগবানের রূপায় “আলোচনা” বৈশাখ মাস হইতে নবম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বঙ্গদেশে সামগ্রিক পত্রের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, আলোচনার বড়ই যোজনা তাই সে এতদিন জীবিতা থাকিয়া জন সমাজের কল্যাণে বক্ষিতা হয় নাই। গত বৎসরে আমরা অনেক গ্রাহকের নিকট হইতে মূল্য প্রাপ্ত হই নাই। এবার আমরা আলোচনাকে নব কলবেশে, মূল্য সার্থক সজ্জার সজ্জিত করিয়া তাহাদের নামে মোট ২০ টাকার ভিঃ পিঃ করিবার মনস্থ করিয়াছি, তাহাদের আগতি থাকে সবর জানাই-
বেন। গত বৎসরের আলোচনা পত্রিকার যে কোন সংখ্যা গ্রাহকগণের নষ্ট হইয়াছে বা প্রাপ্ত হন নাই, এই মাসের মধ্যে লিখিলে আমরা বেয়ারিং পোটে পাঠাইতে পারি। বিলম্বে পার দিতে পারিব না।

মাসিক সমালোচনা।

আমরা বিদ্যুৎ বৎসর ত্রিভুক্ত কলমবন্দ
ধর্ম প্রবর্ত “কপালিনী” ত্রিভুক্ত কলম-
সোহন ত্রিভুক্ত প্রবর্ত “বোধ ও সর্বক-

রহস্য" চাকা হইতে প্রকাশিত "নববিকাশ" নামক মাসিক পত্রের ১২শ সংখ্যা উপহার পাইয়াছি। গ্রীষ্মক কৃকানন্দ শর্মা প্রণীত "কপালিনী" সামাজিক নাটকখানি তদীয় পিতৃদেব, সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ৮কালী-মর ঘটক মহাশয়ের "ছিন্নমস্তা" উপজ্ঞাসের প্রতিপন্ন আদর্শ চরিত্র লইয়া লিখিত হইয়াছে। প্রথম উত্তমে গ্রন্থকার পুস্তকখানিতে বেশ কৃতীত্বের পরিচয় দিয়াছেন, লেখা বেশ সরল ও মধুর হইয়াছে, তবে গ্রন্থকারকে আমরা বলি যে, সামাজিক নাটক লেখার পদ্ধত্বন্দ ব্যবহার না করিয়া, চলিত ভাষা ব্যবহার করিলেই ভাল হইত, আর পুস্তকখানির কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে পত্রগুলিকে পত্রের ভাবে না সামান্যই অল্পরূপ করিলে সকল দিক রক্ষা হইত। বাহা ইউক গ্রন্থকারের উৎসাহ থাকিলে কাগে উন্নতি হইতে পারিত, এরূপ আশা করা যায়। "বোগ ও সাধন-রহস্য" গ্রন্থকার সুরেন্দ্র বাবু একজন উন্নয়মান লেখক ও সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত। উপজ্ঞাস রচনার তাহার জ্ঞান কৃতীত্ব দেখাইতে খুব কম লেখকই পারেন। এক্ষণে তাহার সেই সুমধুর লেখনী নিঃসৃত শাস্ত্রীয় উপদেশ উক্ত গ্রন্থে যেরূপ সরলভাবে লিখিত হইয়াছে। তাহা সকলেরই বোধগম্য। অকপালা ভাষার এরূপ গ্রন্থ বড়ই প্রকাশ হইত হইত। "নববিকাশ" পত্রের একখানি

মাত্র সংখ্যা পাঠে কিছুই বুঝা গেল না। অল্পএবং সমালোচনা করা অসম্ভব।

মাসিক সংবাদ সংগ্রহ।

জনরব কি সত্য?—শুনা যাইতেছে,—ভারতের অঙ্গীলাট লর্ড কিচেনার শীঘ্রই পদ্ম ভাগ্য করিবেন, কি কারণে তিনি ভারত ছাড়িবেন, তাহার কিছুই প্রকাশ নাই, তবে কি জনরব সত্য? সত্য হইলে কারণ অবশ্য প্রকাশিত হইবে।

সময় সংবাদ।—করাসী গবর্ণমেন্টের অধিকৃত সমুদ্রে অবস্থিতি করিয়া কৃষীর বাণটিক নৌ বাহিনীর পরিচালক এডমিরাল রোজডেবা তেনকি প্রভূত করণা ও খাজ সস্তার সংগ্রহ করিতেছেন বলিয়া, আপানের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সমূহ তুমুল আন্দোলন করিতেছেন। এদিকে বিলাতের টাইমস প্রমুখ প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রও করাসীর আচরণে কুপিত হইয়া ইংরাজগণকে এংমো আপানী সন্ধি অহুসারে আপানীগণকে সাহায্য করিতে বলিতেছেন। করাসী গবর্ণমেন্ট কিন্তু "আমরা যথাসাধ্য নিরপেক্ষতা রক্ষার চেষ্টার আছি" বলিয়া সকলকে শোক দিতেছেন। কলতঃ আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষতা উপলক্ষে ফ্রান্স, জাপান ও ইংলণ্ডের রাননীতিকসমাজে তুমুল আন্দোলন উখিত হইয়াছে এই গোলযোগের সুমীমাংসা না হইলে পরিণামে যে প্রাচ্য ভূখণ্ডে অবিলম্বে নিদারুণ সন্ন্যাসন প্রকলিত হইয়া উঠিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

“মস্তকের সাধন কিম্বা শরীর পতন।”

নবম বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ মন ১৩১২। } দ্বিতীয় সংখ্যা

ছায়াপথ।

মহাবালেশ্বর।

কে তুমি হে ধরণীর চত্ৰাতপ সম
আলো করি দশদিক স্বর্গীর বিস্তার ?
তোমার কি দুই পাশে মল্লার বিমল
পবনে মিশারে রেণু সাজে ধরে ধরে ?
কিবা পুত ধূলি তব অঙ্গরা হলৈর
সশব্দ চরণ ফেপে ? অথবা তোমার
বিশাল উরস কিহে পুষ্পকর রথের,
সুৰ্য্যমান অরশ্রেণী-বর্ষর-নির্বোধে
কল্পিত হতেছে সদা ? জান ছায়াপথ
যদি, বলহে আমারে—সর্বদাত্রী তুমি
তোমা অল্পসরি’ কিবা অস্তপথ ধরি,
পাইব তাঁহারে আমি, বাহারে পাইতে
আকুল—নিবরণ তপে হিমাত্রি শিখরে
যোগীকুলখোরবোণী বৃষভ-কেতম।

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কটক জেলার একটি বালেশ্বর আছে,
আমাদের আলোচ্য বালেশ্বর সেটি নহে।
বোম্বাই নগরের ৭৫ মাইল দক্ষিণ পূর্বে এবং
পশ্চিম সমুদ্রতীর হটতে ৪০ মাইল ব্যবধান
সাহায্যিরা গিরিপুঞ্জের উপর সংস্থাপিত মহা-
বালেশ্বর নামক একটি গ্রাম আছে, তাহাই
আমাদের আলোচ্য। কৃষ্ণ নদীর উৎপত্তি
স্থানের নিকট বলিয়া তদদেশবাসী হিন্দুদিগের
চক্ষে গ্রামটি অতি পবিত্র। তাহার মহাদেব
নামক একটি শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন—
তাঁহার মন্দিরের নাম মহাবালেশ্বর। এখান-
কার প্রধান দৃষ্ট কৃষ্ণানদীর মন্দির। কৃষ্ণার
উৎপত্তি স্থানের সম্মুখে প্রায় ১৩০ বৎসরের
একটি পুরাতন প্রস্তরমন্দির লোকের ভক্তি
ও বিশ্বর উদ্ভূত করিয়া দণ্ডায়মান আছে।
প্রত্যেক ঋতুতে বৎসর পরে সংপতি

কভা রাখিতে প্রবেশ করিলে তখান একটি উৎসব হইয়া থাকে। তখন নিকটবর্তী বহুতর স্থানের লোক সমবেত হইলে স্থানটি অপূর্ণ দৃষ্ট দারণ করে। লোকে সেইদিনে কৃষ্ণার অবগাহন করতঃ গঙ্গান্নানের পূণ্য সঞ্চয় করে। বারবৎসর পর বৃহস্পতিগ্রহ কভা রাখিতে প্রবেশ করিলে গঙ্গাদেবী তাহার কনিষ্ঠা সহোদরা কৃষ্ণাকে দেখিতে আসেন, তদ্বন্দীন্দ্রদিগের ইহাই ধারণা। গঙ্গা আগিয়া নাকি একবৎসর স্তম্ভীর অবগাহন করেন।

জনশ্রুতি এই যে, ঐ মন্দিরটি সাতবা আঙ্গল পরিবারের অনঙ্গল নামক এক বাক্ত কর্তৃক নির্মিত হইরাছে এবং মন্দির পরিচালনের ভার এক 'কোলি' পরিবারের প্রতি অর্পিত হয়। তাহাদিগকে 'গঙ্গাপুত্র' বলে। বাক্তীগণ স্থানের পর যে সমুদ্র দ্রব্য দেবতরে নামে উৎসর্গ করে তাহা তাহাদের প্রাপ্য এবং জ্ঞানের পুঙ্খ বাহা উৎসর্গীকৃত হয় তাহা পুরোহিত গণের প্রাপ্য। মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় বে কোলির উপর উহা পরিচালনের ভারার্পিত হইরাছিল, তাহারই বংশধরগণ উত্তরাধিকারী হুজ্রে উহার কর্তৃত্ব ভার পাইয়া আসিতেছে। 'শুরভ' পুরোহিতগণ পার্শ্বতীর আতির সহিত বিশেষ সম্পর্কিত, অন্যদশবাঙ্গীগণের সহিত তাহাদের আদাম প্রধান প্রায় দেখা রাই না।

কৃষ্ণামন্দিরের উপর তাহাদের কোন কর্তৃত্ব নাই, কোলিগণই তাহার সর্ব্ব সর্বা। এই দুই মন্দির সংসৃষ্ট জনশ্রুতি আশেচনা করিলে ও তাহার ইতিহাসের সহিত উত্তর কানেকার গৌকর্ণের মহাবালেশ্বরের ইতিহাস তুলনা করিলে কৃষ্ণা মন্দিরই প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। মহাবালেশ্বর মন্দিরভাস্করে এক খানি প্রস্তরে জলপূর্ণ কতকগুলি গর্ত আছে। লোকে বলে, ঐ গর্তে কৃষ্ণা, বেণী, কোয়ালা, গায়ত্রী, সাবিত্রী, ভাগিরথী এবং সরস্বতী এই পবিত্র সপ্তনদীর আদিম অবস্থান। এই গর্তের সহিত কোনো প্রকারে কৃষ্ণামন্দিরের সংযোগ নাই, অথচ ইহার দুই একটীর শ্রোত এই গ্রামের পাঁচটা নদীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। এবং গে-মুখ হইতে নিঃসৃত যে জলধারা নিম্নস্থ চৌবাচ্চার পতিত হইতেছে, তাহার সহিতও ঐ পাঁচটা নদীর সংযোগ পরিলক্ষিত হয়।

এই সকল নদীর মধ্যে কৃষ্ণাই প্রধান এবং ঐ মন্দিরের নিকট হইতে তাহার উদ্ভব হইরাছে। বহু প্রাচীনকাল হইতে কৃষ্ণার নাম শ্রুত হইতেছে এবং অষ্টাদশ প্রধান পুরাণের অন্তর্গত রুদ্র পুরাণে কৃষ্ণামাহাত্ম্য নামক অধ্যায়ে ইহার পৌরাণিক ইতিবৃত্তও আনিত্তে পারা যায়। কিন্তু ইহার সাহায্য বা পুঙ্খ বহুপুনাভন বলা যায় না, কারণ

সংস্কৃত অভিধান অমর কোষে ইহার নাম নাই। প্রথম খৃষ্টাব্দের অতি প্রারম্ভে অমর কোষ সংকলিত হয়। ভারতবর্ষের এই অংশে প্রচলিত অস্ত্রান্ত অভিধানেও কৃষ্ণার নাম নাই। বিষ্ণু ও অস্ত্রান্ত পুঁরণে কৃষ্ণার নাম পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ইহার মহাশায়া বোধ হয় সাতারা রাজগণের সময় হইতে প্রচারিত হইয়াছে। তাহারাই এই মন্দির ও মহাবালেশ্বরের নিকটবর্তী অস্ত্রান্ত মন্দির নির্মাণ করান। শুনা যায়, ঐ প্রদেশে 'মোর' নামে একটা রাজা ছিল। এই রাজপরিবারের অন্তঃপুরবাসিনীগণ ঐ মন্দিরে আসিয়া যে স্থানে অবগাহন করিত, যে স্থানে আদ্যবস্ত্র ত্যাগ করিত, যে স্থানে বেশভূষা করিত, লোকে এখনো তাহার নির্দেশ করিয়া থাকে। তাহার কারণ ৩৫০ বৎসর পূর্বে মোর রাজা বিদ্যমান ছিল।

মহাবালেশ্বর মন্দির আধুনিক এবং উত্তর কানাদার গোকর্ণের মহাবালেশ্বর মন্দিরের আদর্শে নির্মিত। বর্তমান কারোয়ার হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে কানাদা জেলায় গোকর্ণ অবস্থিত। মহাত্মারতের সময় হইতে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, বন্দুপুরাণেও তাহার উল্লেখ আছে, বাজালা পঞ্চ গ্রন্থেও তাহার মহাশায়া কীর্তিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক ভীৰ্ণবাজী এই স্থানে আগমন করে; দক্ষিণ ভারতে ইহা একটা

প্রাচীনতম শিবমন্দির। শিব ও কার্ণকারী বিহান মন্দিরটী সমুদ্রতীরে প্রতিষ্ঠিত, তদুৎসাহিত লিঙ্গের নাম মহাবালেশ্বর। লক্ষ্যধিপতি রাক্ষসেশ্বর দণানন সর্পগ্রাম এই স্থানে পূজা-মাহাশায়া প্রকাশ করেন।

মহাদেবের ভূষণ সর্প, কাজেই মন্দির গাজে সর্পমূর্ত্তি অঙ্কিত ও খোদিত আছে। গোকর্ণের মহাবালেশ্বরকে একটি পাৰ্ব্বায়স সর্প বেটন করিয়া আছে। লোকে বলিয়া থাকে একটা জাতিসর্পই নাকি কৃষ্ণামন্দিরের লিঙ্গকে রক্ষা করিতেছে। এই উভয় মন্দিরের পুরোহিত গণই অনার্য্য বংশ সম্ভূত, ইহাদের কেহ কেহ অস্ত্র ব্রাহ্মণের হস্তে আহ্বার করে না। তাহাদের সমশ্রেণী ভিন্ন অস্ত্র কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এট সকল মন্দিরের পোরহিত্য করিতে পারে না।

• পশ্চিম ভারতে প্রচলিত মহাবালেশ্বর-মাহাশায়া সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে এতরূপ অবগত হওয়া যায় যে, সাহদ্রিয়া গিরি শ্রেণীর উপর মহাদেবের জটা হইতে উৎপত্ত কৃষ্ণা, বেণী, কাকুদমতি বা কোরাগা, গারত্মা এবং সাবিজী এই পাঁচটা নদী আছে। কৃষ্ণা—বিষ্ণুর তুল্য, বেণী—শিবের তুল্য, কাকুদমতি, ব্রহ্মার তুল্য এবং অবশিষ্ট দুইটা ব্রহ্মার ভার্য্যা। মানবের পরিজ্ঞান নিমিত্ত আটটা ভীৰ্ণ আছে,—(১) ব্রহ্মা (২) ব্রহ্ম, (৩) বিষ্ণু, (৪) চক্ৰ, (৫) হংস, (৬) অরণ্য,

(৭) মালাপা এবং (৮) গিফ্‌মুক্তিলা, তিনটি পিবিজি আছে,—মহাবল, অতিবল এবং কোটাগর। এই গ্রামের জঙ্গলাকীর্ণ ভাগকে ব্রহ্মারণ্য বলে। পূর্বে ব্রহ্মা নাকি এই বনে তপস্তা করিয়াছিলেন এবং তৎকালে গারজী ও সাবিত্রীর উদ্ভব হয়। বার বৎসর পর যখন বৃহস্পতি ব্রহ্মা রাশিতে গমন করেন তখন এখানে স্থান করিলে বেল্লপ মহতী পুণ্য সঞ্চার হয়, অল্প কোন তীর্থে নানে সেরূপ পুণ্য সঞ্চার হয় না। ইহাকে ব্রহ্মা পুত্রও বলে এবং উপাসনা উপবোধী স্থানকে বেদান্ত্রম বলে। পদ্মপুরাণ ও হর্যুপুরাণোক্ত কৃষ্ণা মাহাশ্মাও মহাবালেশ্বরের ইতিহাস আছে। প্রাচীন পুরাণাদির ভাষায় সহিত মহাবালেশ্বর মাহাশ্মার ভাষা তুলনা করিলে শ্রেষ্ঠোক্ত থানি আধুনিক বলিয়া বোধ হইবে।

সাতারার মারাঠি রাজপুত্রের সময় হইতে মহাবালেশ্বরের মন্দিরের গৌরব বিস্তারিত হয়। শিবাঙ্গী এবং তাঁহার বংশধরগণ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান সময়ে পশ্চিম ভারতে ইহা একটা সন্নিহিত পুণ্য তীর্থ। গোবর্ধন-মহাবালেশ্বরের মন্দিরের স্তায় ইহা অতি প্রাচীন নহে এবং পুস্তকোক্তের আদর্শে ইহা নির্মিত। শৈবগণ প্রত্যহ অচ্চনা কালে যে ‘জ্যোতির্শ্বর’ লিঙ্গের নাম সংকৃত বা প্রাকৃত ভাষায় আবৃত্তি করিয়া থাকেন, তাহাতে ইহার নাম মাই এবং

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কেদারখণ্ডে ও লিঙ্গ-পুরাণে ইহার উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল কারণে ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে হয় এবং মহাবালেশ্বর মাহাশ্মা নামক ইহার গৌরবিক ইতিবৃত্তকেও আধুনিক কালের চেনা বলা যায়।

শ্রীব্রহ্মসুন্দর সান্তান।

(Moore রচিত Thou art O God !)

অবলম্বনে

সকলি তোমার !

(১)

হে প্রভু ! সে তুমি, বাহা জীবের জীবন ;
জগতের চারিধারে করি দর্শন ;
দিবসে কিরণ তুমি, জোছনা নিশায় ;
সব তব প্রতিবিম্ব, তোমাকে মিলায় ;
চারিধারে হেরি তব মহিমা অপার,
যা কিছু সুন্দর আছে সকলি তোমার !

(২)

অন্তর্গামী রবিকর ধীরে চলে যায়,
কিরি কিরি স্বরগের তোরণে ঝড়ায় ;
যেথিলে সে দৃষ্ট হার। কর্ণপথ দিয়ে
কত সুখ ছবি মনে, উঠেহে আগিয়ে ;
ঐ যে সুন্দরবর্ণ—অত নেত্র তৃপ্তি কর ;
ঐ যে মধুর দৃষ্ট—সকলি তোমার !

(৩)

স্বল্পিত পক্ষ মেলি হবে নিশা এসে—
ভ্রমসার আচ্ছাদিত করগো আকাশে ;
কৃষ্ণবর্ণ সূচিক্রিত বিহগের স্তায়
যার পক্ষ বিভূষিত,—দীপ্ত তার কার ;
সেই সে পবিত্রতমঃ—জ্যোতি স্বরণের ;
অমুট ভাবের ছবি—সকলি তোমার !

(৪)

চারিধারে বহে হবে বসন্ত বাতাস ।
তোমারি প্রভাব তা'র দেয় উষ্ণতা ॥
নিদাঘেতে যত পুষ্প বিকশিত হয়,
সে সব তো পার, প্রভু ! তোমাতে আশ্রয়,
নয়ন কিরালে হেরি মহিমা অপার,
বা কিছু হুসমা মাথা—সকলি তোমার !
ঐকিত্তজন্যে বন্যোপাধায় ।

কারে চিত চায় ?

(১)

হৃদয়ের অন্ততল ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি—
কারে চিত চায় ?

অমনি হৃদয় পাখি, সন্ধ্যাপনে কহে ডাকি,
তীরে চিত চায় যিনি উৎস করণায়,
অস্ত্রিমে করেন—যিনি ভবনদী পার ।

(২)

হৃদয়ের অন্ততল ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি
কারে চিত চায় ?

অমনি হৃদয় পাখি, সন্ধ্যাপনে কহে ডাকি,
তীরে চিত চায়, যিনি ভব-মূল্যধার,
অস্ত্রিমে যাঁহারে বিনা নাহিক নিস্তার ।

(৩)

হৃদয়ের অন্ততল ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি
কারে চিত চায় ?
অমনি হৃদয় পাখি, সন্ধ্যাপনে কহে ডাকি,
তীরে চিত চায় যিনি এই বসুধার ;
সামোর নরনে চেয়ে পালেন সবার ।

• • (৪)

হৃদয়ের অন্ততল ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি
কারে চিত চায় ?
অমনি হৃদয় পাখি, সন্ধ্যাপনে কহে ডাকি,
তীরে চিত চায় যিনি বিশদে পড়িলে,
রেহে বাড়াইয়ে হাত টেনে লন কোলে ।

(৫)

হৃদয়ের অন্ততল ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি
কারে চিত চায় ?

অমনি হৃদয় পাখি, সন্ধ্যাপনে কহে ডাকি ;
তীরে চিত চায় যিনি সবারি "আমার",
সকলেরি প্রতি যার রেহ অনিবার ।

(৬)

হৃদয়ের অন্ততল ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি
কারে চিত চায় ?

অমনি হৃদয় পাখি, সন্ধ্যাপনে কহে ডাকি !
তীরে চিত চায় যিনি আর আর বলে,
ভাবিলে তবেই খেলা টেনে লন কোলে ।

ঐকিত্তজন্যে মোজাবলহক ।

প্রার্থনা ।

দিনান্তে আসিলে কিরে'

হাসি মুখে দেখা দিও ;

হেরিলে নয়নে অশ্রু,

অকলে মুছিয়া নিও !

দিবসের ক্রান্ত দেখে,

অবশে পড়িলে ঘুমি ;

মৃত-সজীবনী-মত্রে,

জাগাইয়া দিও তুমি !

অসহ বিরহে যদি

কঁদে কতু ওঠে প্রাণ ;

মধুর বীণার তব

তুলিও মিলন তান !

হাসিও আনন্দে বসি'

নিভৃত্তে নিরুজ্জ্বল বনে ;

জুড়াব গাণের আলা,

রূপরানি দরশনে ।

স্বশীতল সন্ধ্যানিল,

আনন্দে বহিলে বীরে ;

গোপনে গোপনে তুমি

আসিও,—মাথার কিরে !

হাসিলে গগনে বিধু,

অনন্ত মাধুরী খুলে ;

ভাটিনী হইয়া তুমি,

ছুটিও ভরল তুলে ;

হইয়া সুবর্ণ সিদ্ধ,

আনন্দে করিও বেলা,—

সারাক্ষণ-গগনে যবে

ভূবে বা'বে স্বর্ণ বেলা !

প্রার্থনা ইহাই শুধু,

আর কিছু নাহি মোর ;

অপূর্ণ থাকিতে যেন,

ভাঙ্গেনা এ ঘুম ঘোর !

শ্রীঅটলবিহারী দাস ।

ক্ষুদ্রের কথা ।

ও কি ! আমি কেবল মুখ দিয়া ছুইটি মাত্র কথা বাহির করিয়াছি অমনি যে একটা স্বণাব্যঞ্জক, তাজ্জিলাজ্জাতক ক্রকুটী আপনাদিগের সরলদৃষ্টিকে কুটিল করিয়া তুলিল ! ক্ষুদ্রের কথা ! সেটা কি আবার শুনিবার যোগ্য ! তাহা শুনিয়া কি সময়ের অপব্যবহার করিতে আছে ! আমাদের সময় অনেক বেশী মূল্যবাস ! আজ্ঞা হাঁ। সে কথা অবশ্যই সত্য আপনাদের সময়ের মুখ অনেক বেশী, তাহা সহস্রবার স্বীকার্য কিন্তু তাই বলিয়া আমি ক্ষুদ্র আমার যে একটা কথা থাকিতেই পারেনা ইহার কি একটা অর্থ আছে ? এসংসারে কথা কি কেবল মহতের জন্তই হইয়াছে ? লোকবাজাতে এইরূপই দেখা যায় বটে—এ ভুবনে সকলেই কেবল

মহৎ লইয়া ব্যস্ত ! মহতের কথা থাকুক বা না থাকুক—তাঁহার কথা শুনিবার জন্য শতসহস্র লোক উদ্গীৰ্ব্বে হইয়া আছে ! লক্ষ লক্ষ লোক উৎসুক হইয়া আছে ! কোটি কোটি লোক উৎসুক হইয়া আছে ! কিন্তু আমি ক্ষুদ্র—আমার কথা যদি আমি গগনভেদী চক্ষু নিনাদের দ্বারা অনন্ত জগতের অনন্ত বায়ুতে অনন্তকাল প্রতিধ্বনিত করি তথাপি সে তরঙ্গ সংসারের কর্ণকূহর স্পর্শ করিবে না ! সংসার আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিবেন না । আর মহৎ যদি কোন কথা নাও বলিতেছেন তথাপি বলিতে পারে না বলিয়া ঐ দেখ সহস্র চক্ষু তাঁহার ওষ্ঠপুটের প্রতি অনিমিষ-দন্ত-দৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে !

এ সংসারে বাঁহারা বড়লোক বলিয়া খ্যাত আছেন একজন বলিতে দশজন তাহাদের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সমস্ত লোন্মোসে প্রতিধ্বনিত করিতেছে তাঁহার অশ্রু বিস্তৃত আছে কিনা, রাত্রিতে সুনিদ্রা, হইয়াছে কিনা, তাঁহার ছপের সর অতিরিক্ত পুরু বা অতিরিক্ত পাতলা হইয়াছে কিনা, তাহার তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ঐ দেখ দ্বার দেশে অসংখ্য গুপ্তচর অপেক্ষা করিতেছে; কিন্তু আমি ক্ষুদ্র পাখা ওরালা, আমি যে সারা রাত্রি জাগিয়া পাখা টানিতে টানিতে একটু তন্দ্রাবিষ্ট হওয়াতে কশাঘাত লাভ করিয়া একহতে বাধিত হলে অবমৰ্ষণ করিতে

করিতে অন্ত হস্তে পাখা টানিতেছি কথির ঘোতে আমার পরিধেয় বস্ত্র রঞ্জিত হইয়াছে তাহা বিজ্ঞাসা করিবার, তাহা দেখিরা আহা বলিবার কি একজন ইহাদের মধ্যে আছে ?

সুতরাং তোমরা যে ক্ষুদ্রের আবার একটা কথা থাকিতে পারে ইহা ধারণাই করিতে পারনা—ক্ষুদ্রেরও যে একটা বেদনা একটা অশ্রু-ধারা-হুতি, একটা হর্ষ, একটা বিবাদ—হউক তা সব ক্ষুদ্র—হউক যত তুচ্ছ কিন্তু তবু যত ক্ষুদ্রই হউক যত তুচ্ছই হউক একটা কিছু আছে, সেটা তোমরা মননাতো আনিতে পার না । ক্ষুদ্রের অস্তিত্বের একটা কিছু মূল্য আছে বলিয়াই তোমরা বুঝিতে পার না বা বুঝিতে চাও না । কিন্তু তাই তোমাদিগকে আমি সামান্য হই চারিট কথা বিজ্ঞাসা করিব । আমার কথা বেশী নহে সুতরাং একটু অগ্রগম্য করিয়া কথা করটা শুনিও, একটু বুঝিবার চেষ্টা করিও ।

আমি ক্ষুদ্র—চিরকাল ক্ষুদ্র আছি—চিরকাল ক্ষুদ্র থাকিব ! কিন্তু আমি যে তোমাদের এত স্বগা এত অবহেলার পাত্র হইব, আমার অপরাধটা কি ? তুমি বলিবে ক্ষুদ্রতাই তোমার অপরাধ । তুমি যদি নৈরাসিক হও—তবেতো আবার তাহার মধ্যে ক্ষুদ্রতাবিহীন ভাবাদির সমাবেশ করিয়া আরও মাদুশ ক্ষুদ্রের অবাধ্য করিয়া তুলিবে । ভাল, ক্ষুদ্রতাই যদি আমার অপরাধ হইল, তবে

মহৎখটাই বা তোমার অপরাধ না হইবে কেন! আমার ক্ষুদ্রও দেখান হইতে, তোমার মহৎও দেখান হইতে। সুতরাং আমি যদি ক্ষুদ্রবাহির তাবের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হই, তবে তুমিই বা মহাবাহির তাবা-বিষ্ট হইয়াও নিষ্কৃতি পাইবে কেন? যেনে সবারই এক অঙ্গুলিপরিমিত মানুষ দেখানে পাড়ে তিন হাত মানুষ গিয়া উপস্থিত হইলে তাহার তাহার সেই গুরুবপুষ্মতাকে নিশ্চয় একটা মহান অপরাধের মধ্যেই গণ্য করিবে। সুর্ব্বের দেশে পণ্ডিত ও সুসংকৃত-বাক্য-কথন জনিত গুণতাপের প্রারম্ভিত করিতে বাধ্য হন! অতএব তুমি যেমন এক হিসাবে আমাকে অপরাধী বলিতে পার, আমিও তোমার সেই হিসাবে তোমাকে অপরাধী বলিতে পারি।

বাহু, তাও না হয় ছাড়িয়া দিলাম। আরও অনেক বিষয় আছে।

তোমরা যে ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা কর, বাহার অভিষেক মূল্যই আদৌ বুঝিতে পার না সেই ক্ষুদ্রই যে তোমাদের মহত্বের মূল সে কথাটা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ? আমরা ক্ষুদ্রেরা আছি বলিয়াই যে তোমরা বৃহত্তেরা বৃহৎ হইয়াছ, মহত্তেরা মহান হইতেছ সেটা একবার প্রমাণ করিও। এ অগতে যদি আমরা এই-ক্ষুদ্রেরা না থাকিতাম, তবে তোমাদের এ মহত্তের বিকার হইত কেমন করিয়া?

এ সংসারগ্রণ্থে আমরা সব ক্ষুদ্র লভাঙ্গুর আছি বলিয়াই তোমরা সহকার শাল তমাল সমূহ যথেষ্ট শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ করিয়া অঙ্গংগিহ হইয়া উঠিতে পারিয়াছ। যদি সকলেই একই ভাবে বৃদ্ধি পাইতাম, যদি এ অগতে ক্ষুদ্র না থাকিত তবে বৃহত্তের বৃহৎ, ও মহত্তের মহৎ কোথায় থাকিত, সে সম্মান, সে প্রতিপত্তি কোথা হইতে আসিত? আমরা ক্ষুদ্র আছি বলিয়াই তোমরা বৃহৎ—আমরা ক্ষুদ্র না থাকিলে তোমরা বৃহৎ ও থাকিতে না! অতএব বলিতে হয় যে আমরাই তোমাদিগকে রাখিয়াছি—তোমাদের অভিষেক মূল আমরা। জগাই মাখাই ছিল বলিয়াই শ্রীচৈতন্যভট্টের গৌরব কুটীরাছিল—আস্‌সেওড়া কাঁটা নটে আছে বলিয়াই রসাল, কটকটী মান! যে দেশের মধ্যে একটা গ্রামে মাত্র একটা উপাধি-ধারী আছেন সেখানেই তিনি একটা কিছু, কিন্তু যে গ্রামে বরে বরেই বি, এ, এম, এ, সেখানে কি আর তাঁদের খাতির আছে?

অতএব বুঝিয়া দেখ হে মহৎ, হে বৃহৎ, যে তোমরা, যে আমাদিগকে এত ঘৃণা এত অবহেলা কর যে আমাদিগকে স্পর্শেরও অবোধ্য বলিয়া মনে কর সেই আমরাই তোমার ভূমিষের মূল। প্রজা আছে বলিয়াই রাজা, নতুবা রাজা প্রজা সবই এক! ক্ষুদ্র আমরা, তোমাদিগকে কুটীয়া রাখিবার জন্য, তোমাদিগকে বিকশিত করিবার জন্য

আমি বিসর্জ্য দিরাছি বলিয়াই তোমরা এখনও জীবিত আছ এখনও ক্ষুধি করিয়া বেড়াইতেছ ! অতএব বল দেখি হে মহৎ, হে বৃহৎ, কার নীতি প্রশংসনীয় ? যে নীটকে সর্বদা প্রকট করিবার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে তা'র অথবা যে অন্তের সুখের জন্য, সম্মানের জন্য অবিরত নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিতেছে অবিশ্রান্ত নিজ স্বার্থ বলি দিতেছে তাহার ? কাহার স্বার্থ অগাধ অধিক ? কাহার পরহিতাকাঙ্ক্ষা প্রকটতর ? তুমি মহৎ, তুমিই এ প্রশ্নের সমাধান কর !

অতএব তোমরা যদি নিজ স্বার্থের কামনা কর, নিজবশোদ্ভাবিত ক্ষুধা নিবারণে যদি আত্মার তৃপ্তি সাধনের ইচ্ছা তোমাদের থাকে তবে তোমাদের স্বীয় সমর্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই আমাদিগকে রক্ষণ করিবার প্রয়োজন তোমাদের আছে বলিয়া আমি মনে করি । কিন্তু তোমরা যদি অবিরাম আমাদের প্রতি এইরূপ ঘণা, এইরূপ অবহেলা এইরূপ নিষ্পীড়ন ও নিষ্পেষণ চালাইয়া শেষে আমাদিগকে আমাদের অটল—ঐর্গ্যহিমাচলকে টলাইয়া দাও, এবং আমরা যদি তৎকালে আমাদের ক্ষুদ্রত্ব এ পৃথিবী বক্ষ হইতে একেবারে মুছিয়া কেলিবার সংকল্প করি—সংকল্প করি কেন, যদি তাহা কার্য্যে পরিণতই করি তাহা হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গেই যে তোমাদের মহত্ত্বও

মুছিয়া যাইবে ? তাইবলি হেমহং, তোমরা মহৎ আছ তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই তোমরা মহৎই থাক, কারণ তোমরা না থাকিলে আমরা নিজ ক্ষুদ্রত্ব উপনদ্ধি করতে পারি না—আমরা তোমাদের বিনাশ কামনা করি না কিন্তু আমাদের প্রার্থনা এই যে আমাদিগের কথা, আমাদের বেদনা শুনিতেই সেটাকে একেবারে অবহেলা করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিও না ;—আমরাও একটা জীব, ভগবানেরই সৃষ্ট এবং তাহারই প্রতিপালিত, একথাটা মনে রাখিলে কোন অপমান নাই ।

তোমরা মহত্ত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া অনেক সময়েই আমাদের কথা এই কুদ্দের কথা একেবারেই ভুলিয়া যাও সেটাও আমাদের বড়ই দুঃখ ! যেমন অনেক গরীব পিতামাতার গরীব সন্তান তাহাদের শোণিত-ঐর্গ্য-কারিণী চেষ্টা এবং ভিক্ষানুক অর্ধের সাহায্যে শিক্ষিত (!) হইয়া সুসংস্কৃত স্ট্রট প্রভৃতি শোভনীয় পদপ্রাপ্ত পুরুষ হইয়া পিতামাতাকে ভুলিয়া যার তাহাদের পরিচরিত্ব লজ্জা বোধ করে, তেমনি আমাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কল স্বরূপে তোমরাও আমাদেরই দ্বারা মহৎ হইয়া আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছ এ পরিভাষণ রাখিবার স্থান আমাদের নাই ।

তোমরা কংগ্রেশন কর, কনফারেন্স কর, বক্তৃতা কর, সভা কর, কতই কি কর—

অথচ সে সবই ভাল কথা, কিন্তু তাহার মধ্যে আমরা ক্ষুদ্রেরা কতখানি আছি? আমরা উচ্চপদ চাহিনা, উচ্চ অধিকার চাহিনা, সে সব তোমাদেরই জন্ত। আমরা চাহি মাত্র ছোটো পেটের ভাত, আর একটু পরিবার কাপড়। এই আমাদের জোটেনা, তারই কোন উপায় আমরা করিয়া উঠিতে পারিনা, মনে ভাবি তোমাদের দ্বারা আমাদের একটা কিছু সুবিধা হইবে কিন্তু সতই দিন বাটতেছে ততই আমাদের সে আশা আকাশকুসুমবৎ প্রতীক্ষমান হইতেছে। এখন আমরা বুঝিতেছি যে তোমরা মহৎ মহতের কথা লইয়াই আলোচনা করিবে। ক্ষুদ্রের দিকে দৃষ্টিনিষ্কপ করিবার অবসর তোমাদের নাই। ইচ্ছা আছে কিনা সেও সন্দেহ!

দুইশত দিয়া দেখাইবার প্রয়োজন আছে কি? তোমরা শিরবিজ্ঞানের উন্নতির জন্ত সভা সমিতি করিয়া দলে দলে ছেলেপিলে-দিগকে বিলাত পাঠাইতেছ, তাদের বৃত্তি দিতেছ বেশ ভাল, উদ্বেগ্ত মহৎ, কিছুই সন্দেহ নাই কিন্তু আমি দেখিতেছি আমাদের ক্ষুদ্রদের তাহার দ্বারা বেশী কোন সুবিধার আশা নাই। আমি একজন ক্ষুদ্র, একটা ফলী কেষ্টন করিয়া একটা মৃতন কিছু বলনা করিলাম কিন্তু তাহা খাড়া করিবার অর্থ সমর্থ্য আবার নাই—তোমরা কি আমাকে সাহায্য করিবে? কই তাহা বোধ হয়না।

তোমরা জাপানী তাঁত, আমেরিকান তাঁত ইত্যাদি আনিবার বন্দোবস্ত করিতেছ, কিন্তু আমি একজন ক্ষুদ্র যদি ঐ রূপই একটা তাঁত করি তবে সেটার ব্যবসা খুলিবার সুবিধা তোমরা করিয়া দিতে পার না কি? তোমরা মহতেরা যখন মেলা কর তখন আমরা ক্ষুদ্রেরা বড় আশায় বুক বাধিয়া পরিবারের হাতের শাঁখা জোড়া বাধা রাখিয়াও টাকা জোগাড় করিয়া যদি একটা কিছু নূতন মত কাজ দেখাইলাম, তোমরা তাহার পুরস্কার স্বরূপ মুখের বাহোবা অথবা বড় জোর সুবর্ণের কি রৌপ্যের ছেডেল দিয়া আপ্যায়িত করিলে? কিন্তু মেডেলে কি পেট ভরে—না বাহোবাস! ক্ষুদ্রবৃত্তি কিস? আমার সেই পুরস্কৃত জিনিস-টার কাটুতির কোন একটা পণ যদি তোমাদের দ্বারা মহতের দ্বারা না হইল, তবে আর আমাদের আশা কি?

তাই বলিতেছিলাম যে তোমরা মহতেরা মহৎ হইলে আর ক্ষুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পাওনা—ক্ষুদ্র সেতো ক্ষুদ্র—চিরকালই ক্ষুদ্র—তার প্রতি দৃষ্টিপাত করাটা ক্ষুদ্র বই নয় বলিয়াই বোধ হয় উপেক্ষা কর কিন্তু তাই ক্ষুদ্র বলিয়া একেবারেই উপেক্ষা করিও না। এ ক্ষণটাই ক্ষুদ্রের সমষ্টি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু পরমাণু সমবায়ের ইহার উৎপত্তি আবার অণু পরমাণুতেই ইহার লয়। স্বয়ং ভগবান ও 'অগেরগীফান' অথচ 'মহতো মনী-

রান্'। অতএব অত নাসিকা কুঞ্চিত না করিলেও পার। দেখ বাহ্যকে তুমি ক্ষুদ্র বল, সেও মহৎ হইতে পারে, যে মহৎ সেও আবার ক্ষুদ্রপন্থায়ের আনত হইতে পারে। দশ-চক্র-নেমীর আবর্তনের পদ্ধতিই এই। দেখ ক্ষুদ্র গণ্য ব্যার সে দিন কি করিয়াছে—ক্ষুদ্র অসত্য জ্ঞাপন আজ কি করিতেছে! কোথায় মহৎ রসিয়ার বলদর্প, আর কোথায় ক্ষুদ্র দীপবাসী ক্ষুদ্রকার আপু! কিন্তু অণু কাহার প্রতিষ্ঠা?

তাই বলি তাই মহৎ, তাই বৃহৎ, ক্ষুদ্র প্রতি অবহেলা করিও না ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিও না ক্ষুদ্রেরও এ সংসারে স্থান আছে, আশ্রয় আছে, কাজ আছে, কর্তব্য আছে—প্রয়োজন আছে। ভগবানের রাজ্যে কিছুই নিঃপ্রয়োজনীয় নহে কিছুই বিনা কাজে নাই ॥ ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিলে তাহার কল ভাল হয় না। ক্ষুদ্র দোহ উপেক্ষিত হইলে তাহার শ্রেণী জীবনের শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারে ক্ষুদ্রের অবজ্ঞাত হইলে তাহাও অন্ধুরে বিনষ্ট হইতে পারে। সে লতাবার ভাগীও তোমাকেই হইতে হইবে।

আজ তুমি দৈববলে মহৎ হইয়াছ—আজ তুমি পূর্ণ স্ফুটন বলে সমাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছ কিন্তু তাই বলিঃ ক্ষুদ্রকে পদবলিত করিও না ক্ষুদ্রের কাতর প্রাণের বেদনাকে উপেক্ষা করিও না—ক্ষুদ্রের কাতর

ক্লেশনে বঁধির হইও না! যদিও এখন তোমারই সেবার জন্ত তোমারই স্রবের জন্ত লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র আত্মপ্রাণ বিলুপ্ত হইতেছে কিন্তু তথাপি তাহার ক্ষুদ্রত্বের দোহাই দিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ পেথনের উপর পেথন করিও না, তাহার ক্ষতস্থানে মলমের পরিবর্তে, তপ্ত লৌহ প্রয়োগ করিও না, সকলেরই একটা সীমা আছে, মহত্ত্বেরও সীমা আছে, ক্ষুদ্রত্বেরও সীমা আছে, দৈর্ঘ্যেরও সীমা আছে পাছে তোমার এই মহত্ত্বের পীড়নে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার মহত্ত্বের অস্থিমনশী উপস্থিত হয় তাই একটু ইঙ্গিত করিলাম। সময়ান্তরে আরও কিছু হিতকথা তোমাকে বলিবার ইচ্ছা রাখিল।

শ্রীযত্ননাথ চক্রবর্তী বি এ।

একটি চিত্র ।

(১)

নবীন বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত যুবক। পিতার মৃত্যুর পর তাহাকে লেখা পড়ার জগাজনী দিয়া বিবর কর্মে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছে। সংসারে তাহার বৃদ্ধা জননী মাতঙ্গিনী; জ্যৈষ্ঠা দ্বিতী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও একটা ভগ্নী। ক্রান্ত কাল এত বড় একটা সংসার প্রতিপালন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ আজ

কাল চাকুরীর বাজার বেরূপ মহার্ঘ তাঁহাতে
 বি, এ-পাশ করিয়া ২০, ২৫ টাকার বেশী
 উপার্জন হয় না। কাজেই নবীন বাবুর
 সংসারে কষ্টের একশেষ হইয়াছে। মাতঙ্গিনী
 সেকালের জ্ঞানোক, কষ্ট সহ্য করিতে তিনি
 বিশেষ পারদর্শিনী; অহোরাত্র পরিশ্রম করি-
 রাও যখন নবীন বাবু সংসারের সঙ্কলন
 করিতে পারিতেছেন না; তখন জননী আর
 কি করিবেন, নীরবে কষ্ট সহ্য করিতেন,
 তথাপি পুত্রকে একটা দিনেক জুতা কোনও
 কথা বলিতেন না, বরং অহোরাত্র পরিশ্রম
 করিয়া শরীর নষ্ট হইবার জুতা নবীনবাবুকে
 নিবেদন করিতেন। পুত্রগত প্রাণা-অননীর
 পুত্রের প্রতি এমনি মমতা। জগতে এমন
 মমতা এমন স্নেহ ভালবাসা আর কাহার
 নিকট আশা করিতে পারা যায় না। বিমলা
 আধুনিক শিক্ষিতা মহিলা হইলেও অশ্রুদেবীর
 শিক গুণে তাদৃশ প্রগল্ভা হইতে পারেন
 নাই। বিমলা বেশ লেখা পড়া জানিতেন।
 তাহার রূপও যথেষ্ট ছিল। তাহার রূপ-
 সাগরে এখন বোবনের একটানা স্রোত
 প্রবাহিত হইয়া দেহের সৌন্দর্য্যে কিরূপ
 রম্য ময়নের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে; তাহা বর্ণনা
 করা যায় না। বিশেষতঃ এই প্রথম সমস্ত
 অবস্থায় তাহার রূপ যেন ফুটিয়া বাহির হই-
 তেছে। একপের তুলনা নাই। এই রূপ-
 সাগরে পড়িয়া শুধু নবীন বাবু কেন সংসারী

পুরুষকেও যখন হাবুডুবু খাইতে হয় তখন
 নবীন বাবুত কোন ছার? বিমলা একটু
 পরিকার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিতেন।
 ছই একখানি গহনা তাহার অঙ্গের শোভা
 বর্ধন না করিলে তাহার মন ভাল থাকিত
 না। তবে যে তিনি স্বামীকে সে জুতা পীড়ন
 করিতেন, তাহা নহে। আধুনিক শিক্ষিতা
 মহিলা হইলেও তিনি স্বামীর মন কষ্ট দিতেন
 না; তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করি-
 তেন। নবীন বাবু জ্ঞান গুণে সর্বদাই সূক্ষ্ম
 হইয়া থাকিতেন; সাধারণ্যে তাহার মন-
 স্তুষ্টি করিতে, তাহার আব্দার সহ্য করিতে
 প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। নবীন বাবু
 পিতার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর কোনও
 সরকারী আপিসে কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু
 তাহাতে অর্থের অন্যটন ঘুচিতেছে না দেখিয়া
 আজ কয়েক বৎসর নিজ বুদ্ধি বলে একটা
 সামান্য ব্যবসা চালাইয়া বেশ সুখে কাল
 কাটাইতেছেন। এখন তাদৃশ অভাব নাই।
 নবীনবাবুর সকলেই ধর্ম্মকে সহায় করিয়া
 সংসারে বেশ শান্তি-সুখশুভব করিতেছেন।
 পিতা বর্তমানের কল্যাণের বিবাহ দিয়াছিলেন।
 নবীনবাবু এখন ভ্রাতা ছইটিকে শিক্ষা দান
 করিতেছেন; তাহারও এই অল্প বয়সে
 জ্যেষ্ঠভ্রাতার সংস্কার অবগদন করিয়া ক্রমশঃ
 উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। মাতঙ্গিনী
 পুত্রগণের ও বধূতির যত্নে বেশ সুখে আছেন।

বিমলা স্বপ্নদেবীকে বড়ই ভক্তি করেন, মাতৃ-
জ্ঞানীও তাঁহার এই সমস্ত অবস্থায় সান্ত্বনয়
করিয়া থাকেন; বধূর বধন বাহা খাংতে
বা পরিতে ইচ্ছা হয়, যখন বাহা আব্দার
করেন, সাধ্যমত তাহা প্রতিপালন করিতে
মাতাজ্ঞানী ক্রটি করেন না। বিমলা আসন্ন
প্রসব, মাতাজ্ঞানী ভগবানের কৃপায় সকল
সুখে সুখী হইয়াছেন; এক্ষণে দৌহিত্র
সুখাবলোকন করিয়া মরিতে পারিলেই তাহার
জন্ম সফল হয়। গর্ভাবস্থা নারীজাতির বড়ই
সঙ্কট সময়, এজন্য তিনি অহরহঃ বিমলার
নিকটে থাকিয়া, বাহাতে প্রসবের সময়
কোনও কষ্ট না হয় বাহাতে বধূ বিনাকষ্টে
প্রসব হইতে পারেন, সে বিষয় নানাপ্রকার
উপদেশ দিতে লাগিলেন। এইরূপ রাম-
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বংশধরগণ সুখ-স্রোতে
ভাসিতে লাগিলেন। একরূপ সুখ শাস্ত্রের একত্র
সম্মিলন কচিং কোনও সংসারে দৃষ্ট গোচর
হইয়া থাকে।

(২)

চৈত্র মাস; সামান্য ব্যবসায়ীগণের এই
সময় কষ্টের একশেষ হয়। এই সময়
টাকার আদান প্রদান করিতে না পারিলে,
মহাজনগণকে তাহাদের প্রাপ্য দিয়া সন্তুষ্ট
করিতে না পারিলে কারবারের স্থানীয় লোপ
হইবার সম্ভবনা। ধনী ব্যবসাদারগণের কথা
যত্নে কিছু তাহাদের তাদৃশ মূলধন নাই,

কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও
গতিতে বৃদ্ধির সহিত কারবার চালাইতেছেন,
তাহাদের কষ্টের ইয়ত্তা নাই। নবীন বাবু
ব্যবসা করিয়া সংসার বাত্মা নিকাশ করেন
বটে কিন্তু তাঁহার তাদৃশ মূলধন নাই। নবীন
বাবু ইংরাজী শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবক হইলেও
তাঁহার মতিগতি সনাতন ধর্ম্মের প্রতি চির-
প্রিয় বলিয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহার মস্তিষ্ক
বিকৃত হয় নাই বলিয়া ভগবান তাঁহাকে
এই সামান্য বাৎসর্য্যেই একরূপ আশাতীত
ফল প্রদান করিতেছেন। বিগত কয়েক বৎ-
সর তিনি এই সামান্য ব্যবসারেই বিশেষ
ভাগ্যবান হইয়া পিতার ক্রিয়াকলাপ সকল
বজ্রার রাখিয়াছেন। গৃহাঙ্গিও বেশ উজ্জ-
লোকের মত নির্মাণ করাইয়া লইয়াছেন।
কিন্তু বিগত বৎসর হইতে একটা জুরা-
চোরের প্ররোচনায় পড়িয়া অনেক টাকা
লোকসান হওয়ার নবীনবাবু এই আধিরীর
সময়ে বড়ই বিরতে পড়িয়াছেন। জননী ও
জ্ঞীকে তাঁহার এই উপস্থিত বিপদের কথা
বলেন নাই; তাঁহারা ইহার বিষ্ম বিসর্গত
জানেন না। চির হাশুময়ী, সরল প্রকৃতি বিমলা
এখন আনন্দময়ী; এখন তিনি হাসিতে
হাসিতে স্বামীর নিকট কত আবদার করেন।
নবীনবাবু এই চিরানন্দময়ীর আনন্দ স্রোতে
বাধা দিতে প্রাণে আঘাত পান বলিয়া কিছু
বলেন না। কিন্তু আজ তাঁহার মন যেন বড়

ভার ভার। গৃহিণীর সহিত বচসা হইয়াছে ;
 স্পষ্ট স্বগড়া নহে, সেই ছুটি-মাগে এক
 প্রাণের ভিতর কলহ হইতেই পারে না,
 তবে, সামান্য মনস্তর মাত্র। সখ্যজনগণের
 ভাঙনায় তাহার মন ত পূৰ্ণ হইতেই খারাপ
 হইয়াছে ; কি করিবেন, কি হইবে, ইত্যাদি
 চিন্তা করিয়া তিনি পূৰ্ণ হইতেই ত চিন্তানলে
 দগ্ধ হইতেছেন, তাহার উপর অকালে স্ত্রীর
 সহিত একটা সামান্য বিষয় লইয়া বচসা হই-
 য়াছে। এই জন্ত তাহাদের মনে আজ কিছু
 মাত্র সুখ নাই ; মন বড়ই ভার ভার। বহি-
 র্জাতির একটা নিরুদ্ভূত একোঠে বসিয়া মুহু-
 মুহু তাম্রকূট সেবন করতঃ চিন্তা-স্রোতে বাধা
 দিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু যে চিন্তা হৃদ-
 যের ভিতর একবার প্রগাঢ়রূপে আধিপত্য
 বিস্তার করিতে পারিয়াছে, সামান্য তাম্র-
 কূট সেবন জনিত মাদকতার তাহার কি
 হইবে ? নবীনবাবুর ললাটপটের শিরা কুস্ত-
 রন ও ফুল বদন-সরোজের বিবাদমাথা ভাব
 দেখিলে বতঃই প্রতীক্ৰমণ হইবে যে চিন্তা
 রাক্ষসী তাহাকে ভীষণরূপে যাতনা প্রদান
 করিতেছে। মুখই হৃদয়ের দৰ্পণ স্বরূপ, মুখ
 দেখিয়া নবীনবাবুর হৃদয় বেদনা সহজেই
 বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি আজ স্ত্রীর সহিত
 মনস্তর করিয়া কিরূপে বস্ত্রণা ভোগ
 করিতেছেন।

এদিকে রাজি অধিক হইয়াছে দেখিয়া

নবীনবাবু ধীরে ধীরে অন্তরে প্রবেশ করি-
 লেন। পাঠক ! আপনারা যদি ইহার কারণ
 জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আসুন,
 আমরা এই সময়ে একবার তাহার শরন
 মন্দিরে প্রবেশ করি।

(৩)

নবীনবাবু প্রত্যহ রজনীযোগে আহারা-
 দির পর কারবার সম্বন্ধীয় নানা প্রকার কার্য
 করিতেন কিন্তু আজ আহারাদির পর তাহার
 আর কোনও কাজ করিতে ইচ্ছা হইল না।
 নানা প্রকার হুচিন্তায় শরীর অবসন্ন হইয়াছে
 কাজেই আহারাদির পর শয্যায় শরন করি-
 লেন। বিমলা কিরূপে পরে গৃহে প্রবেশ
 করিলেন এবং স্বামীকে শরন করিতে দেখিয়া
 তিনি তাহার পার্শ্বে শরন করিয়া নানা কথার
 স্বামীর মনস্তপ্তি করিতে লাগিলেন। বিমলা
 স্বামীর হুচিন্তার বিষয়, তাহার কারবার
 সম্বন্ধীয় গোলযোগের বিষয় কিছুই জানিতেন
 না। অস্ত্রান্ত দিনের ভ্রাম্য স্বামীর পদসেবা
 করিতে লাগিলেন। নবীনবাবু আসন্ন প্রসবা
 সম্বন্ধকে বেশী রাজি আগ্রহ করিতে নিবেশ
 করিয়া বলিলেন—“রাজি অধিক হইয়াছে,
 তুমি ঘুমাইবার চেষ্টা কর, নতুবা অসুখ হইবে।
 বিমলা এতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই ;
 এক্ষণে স্বামীকে কথা কহিতে দেখিয়া আব-
 দারের সহিত বলিলেন—“তুমি যে কথা
 কহিলে তাই ভাল। সকাল বেলা একটা

জিনিস চাহিয়াছি বলিয়া কি এত রাগ করিতে হয় ; দেখ আমি তোমার কাছে কখন কোন জিনিস চাহি না ; এবার কিন্তু আমার ঐ জিনিসটা চাই, মুখ ভার করলে চলবে না ? নবীনবাবুর চিন্তা শ্রোতে বাধা পড়িল, তিনি প্রশ্নবিধীর মুখের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বাতায়ন প্রবিষ্ট চন্দ্রালোকে দেখা গেল যে সে হাসিতে আনন্দের কোন চিহ্ন নাই ; তাহাতে একটুও মধুরতা নাই, অথচ দ্বারে পড়িয়া হাসিতে হইলে তাহা যেমন নীরস, কষ্ট হাসি বলিয়া বোধ হয় ; এ হাসি সেই প্রকারের, ইহা কান্নার রূপান্তর বলিলেও বলা যাইতে পারে ।

বিমলা স্বামীর মনোভাব কিছু বুঝিতে পারেন নাই, অবশ্য তাঁহার একরূপ মনোভাব দেখিয়া বলিলেন—আজ সকাল থেকে এমন মুখ ভার করেছ, যেন তোমার কি ভয়ানক বিপৎপাত হইয়াছে, দেখ মিত্রবরদের বড়-বৌয়ের সাধের সময় কেমন কুড়ি ভরির রতনচূড় হইয়াছে, আর আমি তোমার নিকট কখন কোনও জিনিস চাই নাই ; আমার এই প্রথম সাধের সময় একছড়া চন্দ্র-হার চেয়েছি, ইহাতেই তুমি অকুল পাথার ভাবছা ; তোমার মত রূপ পুরুষ ত কখন দেখিনি ।

রক্ষী সদাই বিলাসিতার ; ভূষণ প্রিয়

অল্পমাগণ ভূষণের অন্ত স্বামীর নিকট আবেদন করিয়াই থাকে, ইহা তাহাদের মধ্যে একটা স্বভাব সিদ্ধ, সংক্রামক রোগ বিশেষ ; মিত্র-বরদের বড়বৌয়ের হইয়াছে, তিনিও স্বামীকে বলিয়া এবার একখানি গহনা লইবেন ; এই সাধের সময় তাহার মনোসাধ মিটাইবেন । কারণ তিনি জানিতেন তাঁহার স্বামী ত আর অক্ষম নহেন, স্বামীও তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, তবে এখন একখানি অলঙ্কার চাহিতে দোষ কি ?

বিমলা সুবত্তী রূপের তরুণে এখন তাটা পড়ে নাই ; তাহার উপর নূতন গর্ভ সঞ্চার হইয়া রূপের জ্যোতিঃ শতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে । গর্ভ সঞ্চার হইলে স্বভাবতঃই রমণীজাতির অমেক প্রকার সাধ হয় এবং তাহার এই সাধ মিটাইবার অন্ত স্বামী মহাশয় শাস্ত্রসম্মত দায়ী, এই জন্য আমাদের আর্থাশাস্ত্রে গর্ভ সঞ্চারের পর সাধ দিবস একটা নিয়ম আছে । নবীন বাবু জীর কথা শুনিয়া বলিলেন, আচ্ছা ! আন্দাজ কত টাকা পড়িবে ? বিমলা বলিলেন—কত আর পড়িবে, হদ না হয় দুশো টাকা হউক ?

নবীন বাবু টাকার কথা শুনিয়া ইতঃকণ্ঠ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন “আচ্ছা ! এখনও ত সময় আছে । চেষ্টা দেখিবে ।” এই বলিয়া পাখি পরিবর্তন করিয়া মিষ্টাচারেই বাস ভান করিলেন । বিমলাও স্বামীকে তদবস্থায়

দেখিয়া আর কোনও কথা না কহিয়া স্বামীর পার্শ্বে নিদ্রিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে প্রেচারা নবীনবাবু সে রজনীতে নিদ্রা ঘাইতে পারিলেন না। নানা চুচিস্তার কঠোর দংশনে সে রাত্রি অমনি কাটিয়া গেল।

(৪)

নবীনবাবু প্রাতঃকালে পুনরায় বহিঃ-
বাসীতে আসিয়া বসিলেন। চিন্তা যার সহ-
চরী তাহার কিছুতে স্থখ নাই। নবীনবাবু
গৃহের এটা সেটা নাড়িলেন; নাড়িতে
নাড়িতে একটা কাঁচের প্লাস ও একটা চিমনী
ভাঙ্গিয়া গেল। এক্রূপে বেলা প্রায় নয়টা
হইল; এমন সময় ডাক হরকরা আসিয়া
তাঁহাকে দুইখানি পত্র প্রদান করিয়া চলিয়া
গেল। নবীন বাবু প্রথম পত্রখানি পাঠ
করিয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন; সে পত্র
খানিতে টাকার দ্বারে তাহার নামে ছোট
আদালতে একটা গুরুতর অভিযোগ হইয়াছে
জানিতে পারিলেন। আর একখানি পত্র
তাঁহার বন্ধুর নিকট হইতে আসিয়াছে।
তাঁহাতে বন্ধুটি লিখিয়াছেন “যদি ব্যবসায়
কোন সুবিধা করিতে না পার, যদি দেনার
দ্বারে তোমাকে এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়
তাহা হইলে পত্র পাঠ আসামে আমার নিকট
চলিয়া আসিবে। এখানে তোমার একটা
ভাল চাকুরী হইতে পারে। নবীনবাবু দুই
দিন বিশ্রাম মধ্যে কলিকাতা হইতে সূর্য

আসাম প্রদেশে পলায়ন করিবেন; ইহা
স্থির করিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং আহা-
রে না বসিলে জননী ও জ্যেষ্ঠ আহার হইবে না,
বিবেচনা করিয়া অনিচ্ছা স্বত্তে একবার নাম-
মাত্র আহায়ে বসিলেন। মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা
করিলেন—নবীন! এ কয়দিন যে তুমি কিছুই
খাইতে পারিতেছ না। জননীর কথা শুনিয়া
নবীনবাবু বলিলেন—মা! এ কয় দিন আমার
শরীর বড় ভাল নাই। এই বলিয়া মুখ প্রেকা-
শন করিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া বাটীর
বাহির হইলেন। অতিরিক্ত চিন্তায় মানব মন
উদাস হইয়া যায়; কোনও কথাই মনে থাকে
না। বাটীর বাহির হইবার সময় পত্র দুই
খানির কথা নবীনবাবুর আদৌ মনে পড়িল
না। পত্র দুইখানি শয়্যার উপর ছাড়িয়া
তাড়াতাড়ি গৃহবর্হিগমন করিলেন।

(৫)

বিমলা মধ্যাহ্নে আহাৰাদির পর শয়ন
কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয়্যার উপর
দুইখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বলা বাহুল্য
যে পত্র দুইখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত
হইয়াছিল। তিনি বেশ বাঙ্গালা জানিতেন, পত্র
দুইখানি পাঠ করিতে তাঁহার আগ্রহ হইল,
হাতে তুলিয়া লইলেন। একবার মনে করি-
লেন—তাঁহার পত্র আমার কি পড়া উচিত,
পরক্ষণেই মনে হইল—তাঁহাতে কতি কি?
নির্ণয় চরিত্র স্বামীর পত্র জী পাঠ করিবে,

তাহাতে আর কতি কি ? এই বলিয়া পত্র দুই খানি আত্মোপান্ত পাঠ করতঃ বাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহার মন্তক ঘুরিয়া গেল ; স্বামীর নিকট অলঙ্কার প্রার্থনার কথা তাহার মনোমধ্যে জাগরিত হইয়া তাহাকে অশেষবিধ বাতনা প্রদান করিতে লাগিল। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। আর ঠাঁড়াইতে না পারিয়া তৃতলে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিচ্ছা হইয়া বলিলেন—হার ! হতভাগিনী আমি কি করিয়াছি ; তাঁহার এই বিপদপাতের সময় ; তাহার এই ভয়ানক দুর্ভটনার সময়, আমি তাঁহাকে অলঙ্কারের কথা বলিয়া না জানি কতই মন-কষ্ট দিয়াছি। তিনি আমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন বলিয়া এত দুঃসময়েও “অলঙ্কার দিতে পারিব না” বলিয়া একদিনের জন্ত মন কষ্ট দেন নাই ; আর আমি এ কি করিয়াছি। না জানিয়া তাঁহার এই কষ্টের সময় কত মর্শ্ব পীড়ার পীড়িত করিয়াছি। থিক আমাকে, থিক আমার অলঙ্কার পরিধান ; স্বামীর তুণী ভূষণ রমণী জাতির আর জিজ্ঞাস্তে কি আছে ! আমি সেই অমূল্য-ভূষণকে তুচ্ছ করিয়া ; সেই ইহ ও পরকালের একমাত্র দেবতা স্বামীকে অবহেলা করিয়া, ছাত্র অলঙ্কারের জন্ত তাঁহাকে জ্বালাতন করিয়াছি ? বাহা হউক আজ সেই সমস্ত স্বামীর মর্শ্ব-

পীড়াদায়ক অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া আমার এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব,— স্বামীর দেনা পরিশোধ করিয়া দিব আর ন'কর্ত্তার কদাচ তাঁহার নিকট অলঙ্কারের প্রার্থনা করিব না এবং অগ্ন পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট বাহা থাকিবে, তাহাতে পুনরায় তাঁহার ব্যবসার উন্নতির জন্ত মূলধন স্বরূপ প্রদান করিব। তথাপি অভাগিনীর ধনকে দেশান্তরে বাইতে দিব না। এই বলিয়া তিনি দাসীর দ্বারা ন'কর্ত্তাকে ডাকিতে পাঠাইলেন পাঠক ! হয় ত মনে করিতে পারেন, পূর্ব প্রদত্ত গল্পকারের দ্বারা ত আর স্বামীর মর্শ্ব-পীড়া উৎপাদিত হয় নাই, তবে এ সকল বিক্রয়ের কারণ কি ? কারণ আর কিছুই নহে, পত্রে স্বামীর গুণদারে জড়ীভূত হইবার কথা এবং যেই ছেতু দেশান্তর পণ্যবানের কথা পাঠ করিয়া তিনি সমস্ত অলঙ্কারের প্রতিই বীতশ্রদ্ধা হইয়াছিলেন। ন'কর্ত্তা পার্শ্ববর্ত্তিত গৃহের মালিক, তাঁহার পিতার পরম বন্ধু ; এমন কি বাণ্যকাণে তাঁহার পিতৃ বিরোধের পর তিনি ন'কর্ত্তার দ্বারাই একপ্রকার মাল্য হইয়াছেন। এই জন্ত বিষমার নিকট বাইতে তাঁহার কোনও বাধা ছিল না। তিনি বরাবর বিষমার গৃহে গমন করিয়া বলিলেন—বিষমার আমাকে কেম ভেকেহিস ?

বিষমার নকত্তাকে জেঠা বলিয়া ডাকিতেন,

তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া কঁাদিয়া কেলিলেন এবং তিনি যেরূপে স্বামীর মনকষ্ট দিয়া অশেষ বিধি পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন—তাহা আত্মপুণ্ডিক নিবেদন করিলেন। নকর্তা বিমলার প্রগাঢ় পতি ভক্তি দেখিয়া শতমুখে খজবাদ দিতে লাগিলেন। এবং অলঙ্কারগুলি লইয়া বিক্রয় করিয়া আসিলেন। বিমলা সমস্ত গহনা গুলি বিক্রয় করিতে দিয়াছিলেন; কেবল দুইগাছি সুবর্ণ বলয় রক্ষা করিয়া সমস্ত বিক্রয় করিবার জন্ত ন'কর্তাকে দিয়াছিলেন, কিয়ৎকণ পরে ন'কর্তা দুই হাজার টাকা আনিয়া দিলেন। বিমলা বলিলেন—জেঠা মহাশয়! আপনি ঈশ্বর বেনের ৫০০ টাকা ও রামধন দোকানির পাওনা ২০০ টাকা পরিশোধ করিয়া দুই খানি রসিদ লইয়া আমাকে দিন; নতুবা কি, তেই আমার মনস্থির হইতেছে না। নকর্তা তাহাই করিলেন। বৈকালে দেনা পরিশোধ করিয়া দুই খানি রসিদ আনিয়া বিমলার হস্তে দিলেন। এবং বলিয়া গেলেন, আর কোনও চিন্তা নাই, তাহারা বলিয়াছে, কলাই মকদ্দমা তুলিয়া লইবে। বদা বাহুগা যে অনন্দের বিক্রয়ের কথা নকর্তা ও বিমলা ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিল না।

(৬)

রাত্রি অনেক হইয়াছে। প্রাথমিক স্বামী গৃহে প্রত্যাপ্ত হইতেছেন না। বিমলা মহা

ভাবনায় পড়িলেন; শয্যাভঙ্গে বসিয়া কেবল মধুসূদনের নাম করিয়া বকঃস্থল ভাঙ্গাইতে লাগিলেন। সতী বিমলার এ ক্রন্দন বোধহয় ভগবানের কর্ণে পহুছিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১২টার সময় তাহার স্বামী ঘর্ষাক্ত কণ্ঠবরে স্নানমুখে গৃহে আসিলেন। এতক্ষণ বিমলা যেন শূন্য প্রাণে গৃহের ভিতর পড়িয়া ছিলেন; এইবার তাহার জীবনের জীবনকে গৃহে প্রতিষ্ঠা হইতে দেখিয়া তাহার দেহে জীবন সঞ্চার হইল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া স্বামীকে পা ধুইবার জল দিলেন; জলখাবার প্রদান করিয়া স্বহস্তে তামাক সাজিয়া দিলেন। নবীনবাবু সমস্ত দিনের পর জলযোগ করিয়া একটু সুস্থ হইয়া নিম্নোক্ত চক্ষে তামাক টানিতে লাগিলেন। এইবার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বিমলা ছল ছল নেত্রে তাহার নিকট গমন করিয়া রসিদ দুই খানি প্রদান করিয়া একধারে অবগুষ্ঠনে বসন আবৃত করিয়া নতাননে মুক্তিকা ধনন করিতে লাগিলেন, নবীনবাবু ট্যাম্পস্কৃত কাগজ দুইখানি পাইয়া আগ্রহ সহকারে আলোর নিকট পাঠ করিয়া প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, পরে বিমলার প্রমুখ্যে সমস্ত শ্রবণ করিয়া একেবারে স্তম্ভিত ও মোহিত হইলেন; জীকে নিকটে লইয়া তাহার রক্তিমাত গণ্ডে একটা আনন্দ চুমন করিয়া কৃতার্থ হইলেন, তাহার সাক্ষী জী

কর্জুক ঋণ পরিশোধ হইয়াছে দেখিয়া নবীন-
বাবু সে কিরূপ আনন্দানুভব করিলে তাহা
বর্ণনাভীত।

নবীনবাবু জ্বর অসামান্য চরিত্র ও ভাগ্য
স্বীকার দেখিয়া বিস্মিত ও অশ্রুসিক্ত গদগদ
হইলেন এবং মনে মনে কতই বিলাপ করিতে
লাগিলেন। ভায়! এমন স্বীয় লভ করিয়া
তাহার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিলাম না,
আমার জীবনে দিক্, এই বলিয়া তিনিও
রোদন করিতে লাগিলেন।

গহিনী স্বামীর এইরূপ বিলাপ দেখিয়া
তাঁহাকে সান্তনা করিতে লাগিলেন। নিম্ন
অঞ্চলে তাহার প্রাণামিকের নেত্রজল মাফুনা
করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবীনবাবুর মন
কিছুতেই সান্তনা মানিল না, তিনি প্রতিজ্ঞা
করিলেন, অর্থ উপার্জন করিয়া দৈক্যে পাপ
আবার তোমার সোণার অঙ্গ সাজাইব
নতুবা আর গৃহে আসিব না। বিমলা ক্রন্দন
করিতে করিতে বলিলেন—আমি তোমার
অবস্থা না বুঝিয়া এরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা
করিয়াছিলাম। আমার কমা কর; ভূমিহি
আমার অঙ্গের ভূষণ; মাথার মণি,
আমার অস্ত্র ভূষণে আর প্রয়োজন নাট।
এই বলিয়া ভক্তিপূর্ণ স্বরে, কল্পিত হস্তে
স্বামীর পদধূলি জিহবার লেহন করিয়া মস্তকে
প্রদান করিলেন? সেই অবধি জীপুরুষ
অবস্থার বশীভূত হইয়া আন্তরিক সন্তোষ

সহকারে সংসার যাত্রা নিকাহ করিতে লাগি-
লেন। কালে বিমলাও একটা পুত্র সন্তান
হইল; অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া তাহার
পার্থীর ধন রত্নের চিন্তা ভুলিয়া ধর্মভাবে
সংসার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।
নবীনবাবু জীপ্রদত্ত মূলধন লইয়া পুনরায়
ব্যবসার উন্নতি করিলেন।

যে হিন্দুর পবিত্র গৃহে একরূপ আদর্শ নারী
চরিত্রের পুত্র চিত্র সত্ত্ব চিত্রিত, তাহাতে
স্বর্গের বিমল বিভাস বিভাসিত, তাহাই
স্বর্গ। এ অতুলনীয় চিত্র চিন্তা গৃহ ভিন্ন
আর কোনও গৃহে প্রায় দেখিতে পাওয়া
যায় না।।

সোণার পারিজাত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নীলরতন মাতাকে লইয়া বাড়ী ফি-
লেন;—তাহার হৃদয় শূণ্য, গৃহশূণ্য, কান্নেই
জগৎশূণ্য। যে পূর্ণ হৃদয় লইয়া বাড়ী হইতে
বাহির হইয়াছিলেন, তাহা নৈহাটীর পল-
তীরে হারাইয়া আসিয়াছেন। মাঘনাসের
শোণাবতী—জগতে বসন্তের ছবি আঁকটুকু,
কিন্তু নীলরতনের বোধ হইতেছে, জগৎটা
শোণের কুহেলিকার, অপবা শ্রাবণের ধার

বঁধার ক্ষুধা পড়রাছে, তাহার অঁধারে কচি নাই, শরনে নিদ্রা নাই, সংসারে মন নাই,— কাহারও সহিত আলাপ করিয়া আনন্দ নাই, কথা কহিয়া সুখ নাই, ভ্রমণ করিয়া প্রীতি নাই, সর্বদাই বসিয়া বসিয়া ভাবে—আর যজ্ঞার বৃত্তিক দংশনে অস্থির হইয়া উদ্ভ্রান্তের মত চারিদিকে উদাসনেজে চাহিতে থাকে, সে ভাবিত,—এক লোক মরিয়া গেল, গোণা-স্থী কেন মরিয়া না! সে কাহার নিকট অভ্যাচারিত হইতেছে, কাহার নিকট পাপের প্রস্তাব শুনিয়া সহায়হীন অবস্থার দাবানল মধ্যগত। কুরাঙ্গীর জ্বার হতাশে বিহ্বলে কাতরে শূন্যপানে চাহিতেছে,—হস্ত বা নারী কুলের পবিজনিধি—আমার বংশের পবিজ নিধি—তাহার ক্ষমের পবিজনিধি দহ্যকার মানব করে অপহৃত হইবে না হইতেছে!

নীলরতনের মতকের কেশর'শি উর্ধ্বে উৎখিপ্ত হইত, যজ্ঞার দারণ প্রদাহে ছটফট করিত, এইরূপে চার একসপ্তাহ অতীত হইল।

একদিবস প্রাতঃকালে একখানা নীতের বস্ত্র গায়ে অড়াইয়া নীলরতন বাহির প্রেক্ষ-
ণ্ডের অগ্নিকাণ্ড বসিয়া আছে, এমন সময়
খানা হইতে পশ্চিম দেশীয় কনেটবল রঘু-
বীর সিং তাহার কাণপুংরে নাপরাজুতার শব্দ
করিতে করিতে সপকর্মে আসিয়া ভাণ্ডার উপ-
স্থিত হইল।

নীলরতন রঘুবীরকে জানিভেন, কোন
একটা অতীতের অগুত সংবাদ পাইবার জন্য
যেন তাহার ব্যথিত বিদৌর্গ ক্ষম উল্লসিত
হইল। নীলরতন জিজ্ঞাসা করিলেন,—
“রঘুবীর সংবাদ কি?”

রঘুবীর নীলরতনের নিকট স্বকীয় পদধরের
উপর তর দিয়া বসিয়া পড়িল, তারপর সুখ-
ভঙ্গী করিয়া বলিল,—“আপনাকে বলব।”

নী। অমাকে?

র। হাঁ, আপনাকে।

নী। কোথায়? থানার কি?

র। না, আমাদের থানার কাছে ;—
নৈহাটির থানার, পরোয়ানা অসিদ্ধাছে।

নীলরতন পরওয়ানা চাহিলে, রঘুবীর
তাহার স্বক্ৰদেশ লঙ্ঘিত ঝেলার মধ্য হইতে
একখানা কাগজ বাহির করিয়া নীলরতনের
হস্তে প্রদান করিল।

নীলরতন তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন,—
“আগামী কল্য ১৪ই ফেব্রুয়ারি। ১৪ইর মধ্যে
আমাকে নৈহাটির থানার উপস্থিত হইতে
শেখা হইরাছে।”

রঘুবীর মুকব্বাআনার প্রবেশ সুখভঙ্গী
করিয়া বলিল,—পুলিসের কাজ, পাকিস্তান
করিও না, অবশেষে ওয়ারেন্ট হইলে, তখন
দায় হইবে। সকালের গাড়ীতেই রওনা
হইও, আমাকে একটা রসিদ লিখিয়া
“দাও।”

বড় অন্তরনকতাবে নীলরতন রঘুবীর প্রদত্ত একখানি কাগজ হস্তে করিয়া বৈঠক-খানার মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া কিরিয়া আসিয়া রঘুবীরের হস্তে প্রদান করিল। রঘুবীর সেই কাগজখানি নিজের খনিয়ার মধ্যে পুরিয়া লইয়া প্রদান করিল।

নীলরতন অনেককাল বড় অন্তরনকতাবে বসিয়া বসিয়া, কি ভাবিল, অবশেষে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া পাড়ার মধ্যে দলদলসং সুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুলদ্বানে বাহির হইল।

নীলরতন রাড়ীর শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বয়স ত্রিশবৎসরের উপরে নহে। দেহ সুগঠ—বর্ণ উজ্জল, বাদবপূর নিতান্ত গুণগম্ভীর নহে—অনেক ভদ্রলোকের বসতি ও গ্রামে একটাস-কুল, খানা, পোষ্টাকিস, বাজার প্রভৃতি সবই আছে, গ্রাম্যকুলে পাঠ করিয়া নীলরতন প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন;—কিছু সেই সময় নিতু-বিরোগ হওয়ার আর অপর স্থানে গিয়া অধ্যয়ন করিবার সুবিধা হয় নাই, তাঁহার পিতার তিনি একমাত্র পুত্র, পৈত্রিক লাঞ্ছনাজ জমি, বাগান ও ছুইটি পুকুরিণী ছিল, তাহার আরে তাহাদের ক্ষুদ্র সংসার একরূপ বেশ চলিয়া বাইত, কিন্তু সে সকলের ভাবাবধান না করিলে চলে না, বলিয়াই তাহার বিদেশ গাইয়া বিদ্যাভ্যাস

বা অর্থোপার্জননের সুবিধা হয় নাই। বর্তমানে গ্রাম্যকুলে পঞ্চদশমুদ্র। মাসিক বেতনে সে মাটারি করিত। অল্পী অল্পবাসী হইয়া; মাক্চ দেহের ক্ষীরধারার,—গভ্রী প্রেমের পুত্রে প্রবাহে সুখেই দিন কাটাইতে ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ গজামানে বাহির হইয়াছিল, ক্রমশঃ বুঝি জীবনের অতিগণ্ডযোগে, অথবা ক্ষমার অভিসপ্ত তিথিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া-ছিল;—তাই কদম্বের শাস্তি, গৃহের শাস্তি, সংসারের শাস্তি, জীবনের শাস্তি, ধর্মের শাস্তি, সুখের শাস্তি চারাইয়া আসিয়াছে।

দয়ালু সুখুয্যে গ্রামের মধ্যে ডাক ইঁকেক লোক। অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নহে। তিনি সকল কাজেই আছেন, গ্রামের রাতাঘাট, বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তিনি সংলিপ্ত। দলদলি মাংসা মোকদ্দমা ইহাতেও একদলে না এক-দলে আছেন। কলকথা তাঁহার সম্পত্তির যে আর আছে, তদ্বারা তাঁহার সংসারের ব্যয় স্থলরূপেই নির্বাহ হইয়া বাইত,—বয়স বৎসরে বৎসরে কিছু সঞ্চয়ও হইত, তিনি ঐ সকল কার্য লইয়া নিরুদ্ভা জীবনটাকে সঞ্চরক রূপে বজায় রাখিতেন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ,—সকলেই তাঁহার কথা শুনিতে বাধ্য, অনেক লোকজন তাঁহার হাতের মধ্যে, তিনি লোকের বিপদে অগ্রসর হইলেন,—প্রকার পক্ষ হইয়া জমিদারের সঙ্গে মোকদ্দমা করেন; অপর জমিদারে অসি-

দারে বধন লড়াই ঝগড়া, মাংসাশ্রমিকদের
বাধে, তখন একপক্ষে অবগধন করিয়া অপ-
রের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন, সদয়বাবু বুদ্ধি
মান ও কাজের লোক বলিয়া গ্রামের মধ্যে
বিখ্যাত। তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছা-
কাছি হইয়াছে;—পূজা আদিকে কখনও মনঃ
সংযোগ করেন কি না, কেহ সে সংবাদ
দিতে পারে না, কিন্তু মস্তকে একটি শিখা
সগর্বে ছলিয়া ছলিয়া হিন্দুমান্যের পরিচয়
প্রদান করিত।

বধন নীলরতন তাঁহার বৈঠকখানায় উপ-
স্থিত হইলেন, তখন সদয়বাবু দীর্ঘোন্নত শূল
নাসিকার উপরে একখানা চশমা সংস্থাপন
পূর্বক কতকগুলি কাগজপত্র উল্টাইয়া
পাল্টাইয়া নির্বিষ্ট মনে পাঠ করিতেছিলেন।
নীলরতনের পারের শব্দ পাঠের ঈষৎসত চাহ-
নীতে চাহিয়া দেখিয়া তাহাকে অত্যাশ্চর্য
করিলেন।

যে মাহুরের উপরে বসিয়া সদয়বাবু
কাগজ দর্শন করিতেছিলেন, সেই মাহুরের
একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া শীলারণ বলি-
লেন,—“আপনার নিকটে একটা কথা
তথ্যইবার জন্ত আসিয়াছি।”

দ। কি?

নী। এই মাত্র খানার কনষ্টেবল রঘু-
বীর সিং আমাদের এক পরোরানা দিয়া গেল,
১৪ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে নৈহাটীর খানার

উপস্থিত হইবার জন্ত তাহাতে আমার প্রতি
আদেশ করা হইয়াছে।

দ। কিজন্ত?

নী। কিজন্ত, তাহা অবশ্য তাহাতে
লেখা নাই!

দ। যাইবার প্রয়োজন কিছুই বুঝা যায়
না, তুমি একটা বিবাহ কর,—তোমার বিষয়
আশ্রয় আছে, যাইহোক মাসে মাসে কিছু
রোজগারও করিতেছ,—বয়সও অল্প;
তোমাকে সাধিয়াই লোকে মেয়ে দেবে।

নী। বিবাহের জন্ত ভাবিতেছি না।
এখন আমার যাওয়া কর্তব্য কি না, তাহারই
পরামর্শ জন্ত আপনার নিকট আসিয়াছি।

দ। হাঁ, একবার যাইতে হইবে, পুলি-
সের আদেশ অমান্য করিলে, বিপদ ঘটবার
সম্ভাবনা।

নী। আপনি কি কিছু অসুস্থমান করিতে
পারিতেছেন;—কি জন্ত আমাদের ডাকিয়াছে।

দ। দুইটি কারণ থাকিতে পারে,—
এক হয়ত তোমার জীব অল্পসংকানের জন্ত
গৌন আয়োজন করিতেছ, তাই তোমার
নিকটে তাহার বিষয়, তাহার চেহারা—তাহার
নামাদি জানিয়া লইবে; আর নয়ত তাহার
সংকান পাইয়াছে।

“তাহার সংকান পাইয়াছে!”—নীলরতন
বসিয়া ছিল, লাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখ
মণ্ডল আরক্তিম হইল।

সদয়বাবু তাহাকে বসিতে বলিলেন, দ্বির হইতে বলিলেন। নীলরতন নিজের অবস্থা ভাবিয়া অপ্রতিত হইল, এবং যেখানে বসিয়া ছিল, স্নানমুখে পুনরপি সেই স্থানে বসিয়া পড়িল, সদয়বাবু বলিলেন,—“যদি তোমার ক্রীকে পাইয়া থাকে, তবে কি করিবে?”

নী। কি করিব? কিছুই করিব না, — যদি সে আমার কথা শোনে, ডাকিয়া বলিব সোণামুখী! গজাশ্রম করিতে আসিয়াছিলে, আর বাড়ী যাওয়া হবেনা। গজার ঐ শীতল জলে শয়ন করিয়া, গজালাভ কর।

কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু জলিয়া ভাসিতেছিল, সদয়বাবু বলিলেন, উপযুক্ত পরামর্শ দ্বির করিয়াছ, কখনও তাহাকে বাড়ী আনিও না। যে যুবতী, এতদিন অমুদ্রিষ্টা — কোথায় ছিল, কে লইয়া গিয়াছিল, তাহার স্থিরতা নাই — তাহাকে হিন্দুসমাজ কখনই গ্রহণ করিবে না, কখনও তাহাকে বাড়ী আনিয়া বংশের কলঙ্গ করিও না।

নীলরতনের বক্ষঃ পাঞ্জর বসিয়া বাইতে ছিল, নিদাঘের আভ্যন্তর-তাপ-বিদগ্ধ, অগ্নি-শুল্ক-শুল্ক-গাহিত গুরুত্ব পথচারী পথিকের পাদমূলে কালভূজ বিন ফাটা উত্তোলন করিয়া দাড়াইলে, সে যেমন বাধিত, উৎকণ্ঠিত, বিশেষাধার ও অগৎসংসার ঘূর্ণিত, বিচলিত, বিদলিতও আগামের দেখে, নীলরতনেরও তাহাই হইল। কি করিতে হইবে,

কি বলিতে হইবে—সে কিছুই বুঝিতে পারিল না, অনেকক্ষণ দীর্ঘ, বিদীর্ণ বাধিত মথিত বক্ষঃ ধরিয়া সেখানে বসিয়া থাকিল,— তারপরে অতি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, যদি সোণামুখী বলে, আমার নিঃসন্দেহ গ্রহণ কর, আমি সম্পূর্ণ পবিত্র আছি।

স। কেহ তাহার কথা বিশ্বাস করিবেনা।

নী। না করে, — তাহাকে লইয়া এক ঘরে হইয়া থাকিব।

স। জগতে আপনার পক্ষ সমর্থনার্থে সকলেই মিথ্যা! কথা বলিয়া থাকে, সোণামুখী যদি আশ্রয়দান করিয়া থাকে, তবে সে কিছু তাহা ইচ্ছা করিয়া করে নাই; হয় বল প্রকাশে নয়, ভয়েই তাহার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সে কিছু সুখী হয় নাই,—আবার ঘরে কিরিতে পারিলে,—ঘর সংসার পাইলে, খাণ্ডী নন্দ পাইলে, তোমাকে পাইলে সুখী হইবে—কাজেই সে মিথ্যা বলিতে পারে। সে বলিতে পারে, তাহার দেহ নিম্পাপ, জীবন অকলঙ্কিত আছে। তুমি নিশ্চয় তাহাকে কোন্ প্রমাণের বলে পবিত্রা প্রণয়িনী বলিয়া গ্রহণ করিবে। কেন বংশ মর্যাদা, ধর্ম ও পিতৃ-কুল কলঙ্কিত করিবে! তুমি আর তাহাকে গ্রহণ করিও না। রজনগৃহে কুকুর প্রবেশের সন্দেহ হইলেই হিন্দুগণ হাতী ফেলিয়া দেয়। তুমিও তাহাই করিও।

নীলরতনের সর্বাঙ্গ দিয়া আঁরের গিরির
 ভীম অনল ছুটিয়া বাইতেছিল। তিনি আর
 ভনিতে পারিলেন না। আর কোন কথাও
 কহিলেন না। অতি দ্রুতপদে, উন্মাদের
 ভাৱ চলিয়া গেলেন।

তারপর বৈকালে পুরোহিত দরানন্দ
 শিয়োননি ঠাকুরে নিকটে গিয়া নীলরতন
 বলিলেন,—“আমি আগামী কল্য সকালে
 নৈহাটি বাব।—সেখানকার পুনীস আমাকে
 বাটবার জন্ত পরামনা দিয়াছে। আপনাকে
 নিকট দিখাসা করিতে আসিয়াছি, যদি
 আমার স্ত্রী সেগামুখীকে পাওয়া গিয়া থাকে!
 বাকী আনিতে পারিব কি না?”

শিয়োননি ঠাকুর তাহার কেশবিরল
 মস্তক দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া একবার আলো-
 চিত করিয়া বলিলেন,—“তা হইতেই পারে
 না। বেরমণী গৃহ হইতে তথা আত্মীর স্বপ্ন
 হইতে বিচ্ছিন্ন—অপছন্দ তাহার পবিত্রতা
 কোথায়?”

আর কোন কথা কহিতে শ্রদ্ধা হইল
 না,—ইচ্ছা হইল না, কত-মতক কুসুর যেমন
 ছিন্ন হইতে পারে না; কোথায় বাইবে, কি
 করিবে—কোথায় গেলে তাহার বাতনায়
 লাগবে হইবে, তাহা বুঝিতে পারে না—কিন্তু
 ছিন্ন হইতেও পারে না; অনিচ্ছিত পথে
 আত্মহার্য, আকুল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায় সে
 দিবস নীলরতন সেরগ তাবৈ ছুটিয়া

বেড়াইল। রাত্রিতেও নিদ্রা হইল না, পুত্রের
 অবস্থা দেখিয়া পুত্রবধূশোকাকুল। অননী
 আরও ব্যাধিতা ও চিন্তাধিতা হইলেন।

ঐশ্বর্যমোহন তটীচাৰ্য্য।

মাসিক সংবাদ।

সহরে গত কয়েক দিবস হইতে অত্যন্ত
 গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সন্ধ্যাপর্শিতে কয়েক দিবসের
 মধ্যে কয়েকটি ঘোড়া ও গরু মৃত্যুযুগ্মে পতিত
 হইয়াছে। ডাক্তার উদ্দেশ্যে ঘোষ বিদ্র-
 পুর সোডে সন্ধ্যাপর্শি রোগে আক্রান্ত হন।
 তাহাকে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে
 চিকিৎসার্থে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ঐশ্বর্যমোহন মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি ডোম
 জুড়ে কোন আত্মীরের বাটী বিবাহোপলক্ষে
 গমন করিয়াছিল। সে অত্যন্ত ব্যক্তির সহিত
 ছাদে শয়ন করিয়াছিল। তঠাৎ সে ছাদ
 হইতে ২০ ফিট নিম্নে পড়িয়া গুরুতররূপে
 আহত হইয়াছে। তাহাকে হাওড়া হাস-
 পাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি পার্জি-
 টার সাহেব ১লা আগষ্ট হইতে এক মাসের
 অবকাশ গ্রহণ করিবেন।

এখন হইতে নিম্ন হইয়াছে যে, কলি-
 কাতা মেডিকেল কলেজে ৫ বৎসরের পরি-
 বর্তে ৬ বৎসর কাল পড়িতে হইবে।

সোণার পারিজাত ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

বড় বয়সের, বড় দৃষ্টিভঙ্গির বিনীত রজনী অভিবাহিত করিয়া প্রভাত হইতে না হইতে নীলরতন শয্যাত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন, এবং বাতাকে ডাকিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্বক রেলওয়ে স্টেশনান্তিমুখে যাত্রা করিলেন ।

তখনও গ্রাম সুপ্ত । নীড়ে প্রায় সকল বিগল নীরব—কেবল নদীকূলে দূরে একটা বকুল শাখার একটা দয়েল প্রভাতী ধরিয়াছে । তখন দিনের আলো উত্তমরূপে প্রকাশ পায় নাই,—গগনের গারে তারকারাজি রান—কিন্তু নিতে নাই । দূরে বৃক্ষ শাখার তখনও অন্ধকার জড়াইয়া আছে,—নদীর জল তখনও কাল । পূর্বে গগনের উপরে খানিকটা ধূসর—নিম্নে পাটখিলে রং ফুটিয়া উঠিয়াছে ।

নীলরতন একা, বুলিম্বর পল্লীপথে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, স্টেশনান্তিমুখে চলিয়াছেন, পথে একখানা ছইঘেরা গরুর গাড়ী বুলি উড়াইতে উড়াইতে তাহার স্বাভাবিক মধুর গমনে স্টেশনের দিক্ হইতে আসিতেছিল,—দেখিয়া নীলরতনের প্রাণ একবার চমকিয়া

উঠিল, তারপর হির হইল, তাহার মনে হইয়াছিল—হয়ত সোণাবুঝিকে পুলিশ আমার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে, কিন্তু অচিরে গাড়ীর মধ্যে এক বিপুলদেহী কাবুলী ও তাহার পর্ত্তাকার ঘোট দর্শন করিয়া নীলরতন গাড়ীর পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল ।

ঘানবপুর হইতে রেলওয়ে স্টেশন চতুর্দশ মাইল ব্যবধান হইবে, স্ত্রত্যং স্টেশনে পছছাইতে তাহার প্রায় বারটা বাজিয়া গেল । অনাহারে ইচ্ছা নাই, তবে রোজে পথ হাঁটিয়া বড় তৃষ্ণা হইয়াছিল,—তাই এক পরসার বাতার কিনিয়া একঘণ্টা জলে কেলিয়া তাহাই পান করিয়া লইল ।

তারপরে একটার সময় গাড়ী আসিলে, তাহাতে উঠিয়া বসিল । বসন্তের প্রথম-গমন—সমস্ত রাত্রি শীতের প্রাচুর্য্য এবং প্যাঙ্কের অলস উদাস—বিহ্বল বসন্তের আবির্ভাব । সর্বত্র উদাস আকুল উচ্ছ্বাস । নীলরতন গাড়ীর এক পার্শ্বে বসিয়া তাহার দ্রুতবিকৃত রূপের লইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল । পূর্বে প্রত্নির আগমন, পথপ্রান্তি—আর বসন্ত মধ্যাহ্নের অদমিত গতি—এক একবার নীলরতনের তত্ত্বা আসিতছিল, সে এক একবার রিমাই-তেছিল । মধ্যাহ্নের গাড়ীতে লোক সংখ্যা খুব কম । দূরে একটি তরলোক বসিয়া ছিলেন, তিনি ডাকিয়া বলিলেন,—“নিজা

আসিতেছে, গাড়ীতেও লোক নাই, একটু
ওইয়া ঘুমাও না কেন ?”

নীলরতন একবার উদাস দৃষ্টিতে বাবুর
মুখের দিকে চাহিয়া, কাগড়ের পুঁচুলাট
নাখার দিয়া ওইয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া
নিজাকর্ষণ হইতেছিল, কিন্তু শয়ন করিলে
আর সহজে নিজা আসিল না, নানাবিধ চিন্তা
আসিয়া হৃদয়কে আকুল করিতে লাগিল,
কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই চিন্তাকে পরাস্ত করিয়া
নিজা আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া
ফেলিল। কিন্তু নিজা পাড় নহে, স্বপ্নে
জড়িত।

নীলরতন। নিম্নিত হইবামাত্র স্বপ্নে
দেখিতেছিলেন,—“চারিদিকে অন্ধকার—
বঙলে গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকার—যেমন
অন্ধকার, তেমন পুচাতেন্দ্র অন্ধকার নীলরতন
কখনও চক্ষে দেখে নাই—সেই অন্ধকার
রাশির মধ্যে এক একবার ভীষণ বজ্র
চমকিয়া উঠিতেছে—আর কোথা হইতে
করণতমস্বরে কত নর নারী চীৎকার করি-
তেছে। নীলরতন চীৎকার শুনিতেছিল,
কিন্তু বাহ্যিক চীৎকার করিতেছিল, তাহা-
দিগকে দেখিয়া চোঁটা করিও দেখিতে পাইল-
না। কিন্তু মুহূর্ত্তে সেই অন্ধকার রাশিতে
করিয়া—সেই বজ্রাধির কণ বিকার, আর
আর্তস্বরের করণচীৎকার। নীলরতন ভয়ে
কাঁপিতে লাগিল।

সহসা নীলরতনের কর্ণ বিগড়, সমস্ত
শরীরের রক্ত হিম ও চেতনা বিলুপ্ত হইবার
উপক্রম হইল। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে স্তব্ধ নরনের
স্থির দৃষ্টিতে নীলরতন চাহিয়া দেখিল—সেই
অন্ধকার রাশিতেদ করিয়া একটি রমণী
ভ্রাসিয়া আসিতেছে,—সে রমণী সোণামুখী,
সোণামুখীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটি পুরুষ
মুষ্টি আসিয়া উপস্থিত হইল,—পুরুষটিকে
দেখিয়া সোণামুখী কিরিয়া দাঁড়াইল, সে
আসিয়া হাসিতে হাসিতে সোণামুখীর হাত
চাপিয়া ধরিল। সোণামুখীও প্রেমের হাসি
হাসিয়া আদরে তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া
গলা ধরা ধরি করিয়া দাঁড়াইল। তারপর,
পুরুষটি অঙ্গুলী হেলনে সোণামুখীকে নীল-
রতনের দিকে চাহিতে ঈজিত করিল। সোণা-
মুখী পাখাণী সোণামুখী উপেক্ষার বক্তৃত
হাসি হাসিয়া পুরুষটির প্রতি সোহাগের
চাহনি চাহিল। গভীর গর্জনে বজ্র ডাকিয়া
উঠিল—নরকের আগুণ তাহার বিশ্বগ্রাসী
লহ লহ জিহ্বা বিস্তার করিয়া সোণামুখী ও
তাহার প্রিয়তমকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

নীলরতনের স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। অতর্কিতে
অনল—হাতনার তাহার নিজা ডাকিয়া
গেল; বামিয়া চীৎকার করিয়া সে উঠিয়া
বসিল। চারিদিকে বেন সে বজ্রহকার আর
নরকাগ্নির ভীষণতা দর্শন করিতে লাগিল।
একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল,—

বুঝিল, সে স্বপ্ন দেখিয়াছে, কিন্তু স্বপ্ন কি সত্য? কে বলিয়া দিবে, স্বপ্ন সত্য নহে—অমূলক চিন্তামাত্র। যে বলিবে, তাহার কথা অক্ষর অমর ও সত্য হউক। কিন্তু সে কি সত্যই স্বপ্ন দেখিয়াছে না কোন দৈবীশক্তি তাহাকে সোণামুখীর বর্তমানও ভবিষ্য অবস্থা—বর্তমান ও ভবিষ্য দৃষ্ট চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত করিয়াছে। কিছুই বুঝিতে পারিল না—গাড়ী তখন দক্ষিণে, বামে বহল বিটপী, বহল গ্রাম, বহল জলাশয় রাখিয়া ছুটিয়া চলিতেছিল, এবং গাড়ীর মধ্যেই সেই তরু আরোহীটি আপন মনে সুধাকর্ষ নীলকর্ষর গীত গাহিতেছিলেন,—
“সজল জলদ অঙ্গ সুজিতঙ্গ বাক্য তরুণে;
হেরিলে হরে জ্ঞান মন প্রাণ পড়ে পদতলে।
নবীন নটবর কে বিরাজে ত্রঙ্গমণ্ডলে?
সাজ হেরি লাজে বিজরাজ নভোমণ্ডলে।
এমন মনোহর মাধুরী না হেরি মহীমণ্ডলে।
উচ্ছ শিখিপুচ্ছ শিরে উচ্চ চূড়া বামে হেল,
ভুচ্ছ করে জাতি ধর্ম, মুচ্ছ করে নারীকূলে।
মধুর মুহ হাসি রাশি সুধা করিত করে;
বাত্ত করি বাশী মন উদাসী করিতে পারে।
নীলকর্ষ তপে কপে কপে

অচেনার চিনিতে পারে,

চিনিতে পারে জিনিতে পারে

কিনিতে পাবে বিনামূল্যে ॥

পানের স্বরে নীলরতনের প্রাণে কোন

অধুর ভবিষ্যতের একটু শান্তি ঢালিয়া দিবার জন্য আশা প্রদান করিল;—নীলরতন মনে করিল, আরও একটু অগ্রসর হইয়া গারকের নিকটবর্তী হয়,—বুঝি তাহার গানের মধুর সুরে তাহার দম্ভপ্রাণের ভীষণ ব্যগ্রতার উপরে একটু শান্তি ঝরিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তাহার মনের বাসনা মনেই রহিল,—সেই সময় গাড়ীর গতি স্থির হইল, আর উচ্চকণ্ঠে বাক্য ভাবার একজন কুলী ডাকিয়া গেল—“না—ঈ—হাঁটা।” নীলরতন গাড়ীর দরোজা টানিয়া নামিয়া পড়িল, এবং ব্যগ্রা জড়িত হৃদয়ের উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তারপরে পূর্ণ পার হইয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিল।

থানা যে স্থলে অবস্থিত, তাহা নীলরতনের জানা ছিল, সুতরাং কাহাকে কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়াই নীলরতন একেবারে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন,—বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে।

ধানার দারোগা যেমন একটি গোপাল পুষ্প বামহস্তে লইয়া প্রাক্ষণ-পাতিত একখানি কেদারার বসিয়া সুগন্ধি তামাকুর ধূম পান করিতেছিলেন। ধীর পাদক্ষেপে নীলরতন গিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

দারোগাবাবু তাঁহার সূখের দিকে গভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কে?”

নীল। আমার নিবাস বাগদপুত্র—বাগদ

পুত্রের খানার কনঠবলের হস্ত হইতে আপনার একখানি আদেশ পত্র পাইয়া আনি আসি-
রাহি, আমার নাম নীলরতন রায় ।

না । হাঁ হাঁ—আপনাকে আসিতে বলা
হইরাছিল,—বহু, রামচরণ ।

একজন কনঠবল আসিয়া সম্মুখে দাঁড়া-
ইল । দারোগাবাবু বলিলেন,—“কলিকাতা
হইতে যে দারোগাবাবু আসিয়াছেন, তিনি
খানাবরে শুইয়া আছেন, ডাকিয়া আন ।
বলি, যার বো হারিয়েছে, সেই লোক এসে
পৌছেছে ।”

রামচরণ চলিয়া গেল । নীলরতন স্বপ্নার
লজ্জায় অঙ্গ সঙ্ক হইয়া বসিয়া পড়িলেন ।

কিয়ৎক্ষণপরে কলিকাতার দারোগা
বাবু উঠিয়া আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ।
একবার নীলরতনের মুখের দিকে চাহিয়া
দেখিয়া, দারোগাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এই ভক্তলোক
কিস্তি সেই সর্কনাশ হইরাছে ?”

কথাটা অনেকটা স্মৃশস্ত ও ভক্ততার
সীমাবদ্ধ । কিন্তু স্থানীর দারোগা একটু
বুহু হাসিয়া বলিলেন,—“হাঁ হাঁ, ওরই বো
হারিয়েছে ।”

* কলিকাতার দারোগা অর্থে তিনি রিজার্ভ
ডিটেণ্ট পুলিসের ইন্সপেক্টর । নাম বহু
বাহু,—বহুবাহু বি এ পাশ করিয়া পুলিসে
প্রবেশ করিয়াছেন ।

বহুবাহু বলিলেন,—“আপনাকে আসিতে
নিষিদ্ধাছি, আমিই আপনার যৌকদ্দমার
তত্ত্ব করিবার জন্য আমাদের উদ্ধৃত্তম
কর্মচারী কর্তৃক নিযুক্ত হইরাছি—প্রাণ-
পণে আপনার জীব অহুসন্ধান করিব—কিন্তু
সেই অহুসন্ধান কার্যে আপনার সহায়তার
প্রয়োজন ।”

দীর্ঘবাস পরিত্যাগ করিয়া নীলরতন
রায় বলিলেন,—আমার অহুসন্ধানের
প্রয়োজন নাই ।”

ব । কেন ?

নী । আর তাহাকে খুঁজিয়া কি হইবে ?
হিন্দুসমাজ—পদ্ধতি অহুসারে আর তাহাকে
গ্রহণ করা যাইবে না । নিজের মনও ভাল
বলিবে না ।

ব । তথাপি অহুসন্ধানে সাহায্য করিতে
হইবে । সরকারি কার্য বলিয়াই আমাদ
সাহায্য করিতে হইবে ।

নী । আমার কি কহিতে হইবে ?

ব । অস্ত্র রাখেই আমার সহিত কলি-
কাতার বাইতে হইবে ।

নী । কিন্তু আমি দরিদ্র,—পরের চাকুরী
করিয়া খাই, সত্তরেই আমাকে ছাড়িয়া
দিতে হইবে ।

ব । হুই এক দিনের মধ্যেই কাড়ী কাইতে
পারিবেন । একপে বেড়াইয়া আহুন,
সন্ধ্যার পরে কলিকাতার রওনা হইব ।

নীলরতন খানা হইতে বাহির হইল, কিন্তু কোথায় বাইবে? একবার পদ্মাতীরে গেল—বেখানে সোণামুখী অবদর্শন হইরাছিল, সেখানে বাইরা চহিরা চাহিরা চারিদিকে দেখিতে লাগিল,—ভাহার জ্ঞান হইতেছিল, সোণামুখী বুঝি তাহারই প্রতীকার এমনও কোথায় সুকাইরা আছে। সে ডাকিলেই বুঝি সাড়া দিবে—কিন্তু ডাকিতে গিয়া বামিয়া পড়িল, বেদনাগ্নুত চক্ষু দিয়া জলরাশি ঝরিয়া পড়িল,—তিনি ব্যথিত বিদীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া ভাগীরথীর দিকে চাহিলেন—ভাগীরথীর জলচর সঞ্চার চঞ্চল জলরাশি স্থির, এবং অন্তঃপিরির সমুজ্জল শিখরে রজনীর সুদীর্ঘ পক্ষছায়ার দিবসের শেষ কনক কিরণ আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল।

ঐশ্বরেয়মোহন ভট্টাচার্য্য।

চণ্ডীদাসের প্রেম ।

প্রথম প্রস্তাব ।

অজয় নদীতীরের রাধাকৃষ্ণ প্রেমে বিভোর কবি তরল সংস্কৃতে কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে পর, একই ভেলাবাসী আর একজন প্রেমিক, ভদীর পদ্যক অল্পসরণ করতঃ রাধাকৃষ্ণের বাণ্য-লীলা অবলম্বনে বৈষ্ণব ধর্মের সখ্য, দাত,

বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বহুত রস ছড়াইয়া বঙ্গবাসীকে এক অপূর্ণ অনন্তত্ব অমৃত মদি-
রাতে বিহ্বল করিয়াছিল। তদবধি একাল পর্য্যন্ত কত শত কবির আবির্ভাব হইল, কত কতজন বৈষ্ণবীর সখ্য দাত্তের নিগৃহীতত্ব বিকাশে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কেহই তাঁদের নাম সরণ, সরণ, বা ভাবিক কথার রাধাকৃষ্ণের সহিত সেরূপ সখ্যতা, সেরূপ দাত্ততা এবং সর্বোপরি সেরূপ প্রণয়ানুরাগ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই! চণ্ডীদাসের রাধাবী প্রেম এবং অগণ ছাড়াইয়া অমাবসী প্রেম-
রাজ্যের সামগ্রী হইয়া আজ পর্য্যন্ত আমাদের তত্ত্ব ও বিশ্বর উদ্গুণ্ডকরতঃ সর্বকো প্রভি-
ষ্টিত আছে। জননী বঙ্গভূমির জ্ঞানল জ্ঞান-
ছাদিত শান্ত শীতল কোড়ে এখন কোনে
হুলজান ঘুমঘোরে অচেতন আছেন কিনা,
যিনি অদূর ভবিষ্যতে নিদ্রাশ্রিত হইয়া সেই
অবর কবির রচিত কাব্যোদ্যানের পারিজাত
—মধুর কলিকামাজেরও অধিকারী হইবেন,
তাহা ভবিষ্যতের কুহেলিকাঙ্কর নীরব গম্বুজে
প্রতিফলিত হইতেছে।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি একই সময়ে ধরা-
ধামে আবির্ভূত হইয়া সর্বপ্রথম বাঙাল পদ্য-
সাহিত্যের উন্নতি করে লেখনী ধারণ করেন।
চণ্ডীদাসের পদ্যাবলী পাঠ করিয়া আমাদের
ইহাই ধারণা হইরাছে যে, সাহিত্যের উন্নতি
কল্প ভাহার উদ্বেগ ছিলনা। তিনি একান্ত

ভিত্তে সরল প্রাণে নিজের উদার হৃদয়ের প্রেম ভাগবাস। অবিরনিহিনিহ্নরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—সেই হৃদয় আজিও আমাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিতেছে। তিনি বৎকালে এইরূপ সৰ্ব্বকথা উল্কাটনে ব্রতী ছিলেন। তাহা তৎকালে চিরপ্রতিভা দাসীর দ্বারা তাঁহার পদানুগরণ বিশাল সাহিত্য-রাজ্যের স্রষ্টি করিয়াছে। অপরপক্ষে বিদ্যাপতির আশঙ্কা সাহিত্যের পুষ্টিগুটি সংসাধনে প্রধাবিত হইয়াছিল। তাঁহার পদাবলী বহুত উপমা বাহন্যে ও অনাবশ্যক শব্দাঙ্কুরে কষ্টকৃত। টিকা চীপনীর সহায়তা খাতিত তাহা সাধারণ পাঠকের অধিগম্য নহে। এক কথার বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করা আয়াস সাধ্য ব্যাপার। এতৎবিষয় আমি মৎপ্রণীত ছতীদাস চরিত পুস্তকে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।

গীতিকাব্যে চতীদাসের দ্বারা উচ্চস্থান আর কোনো কবির ভাগ্যে ঘটে নাই, ভবিষ্যতে ঘটবে কিনা তাহাও বোর সম্ভেদ স্থল। চতীদাস খাঁটি ও প্রেষ্ঠ প্রেমিক। এ অংশে রিতাপতিও তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। চতীদাস দেখাইয়াছেন যে, প্রেম করিতেই হইবে কিন্তু তাহাতে হৃৎ অনেক, বাধা রিপত্তি প্রচুর। এতৎসঙ্গেও তাহা ত্যাগ করিতে পারিবেনা, কেননা হৃৎ কষ্ট আছে বলি। এই প্রেমে এত হৃৎ। কঠিন শিলাখণ্ডে

বলিয়া যেমন চন্দনের সৌরভ বাহির করিতে হয়, হৃৎখের পাখাণে প্রেম বড় ববিবে, ততই উহার সৌরভ বিছুরিত হইবে।

যেন মনরজ অতল,

অধিক সৌরভময়।

স্ত্রাম বধুরার পিরীতি ঐজন,

বিজ চতীদাস কর।

চতীদাসের প্রেম কঠোর সাধনা সাপেক্ষ। এ প্রেম কঠোর হৃৎ তপস্তা ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। ‘পিরীতি, পিরীতি’ তো সকলেই বলিয়া থাকে কিন্তু পিরীতিকি সহজ কথা? পিরীতিকি ‘বিরিখের ফল’ যে যেখানে সেখানে পাওয়া যাইবে? তাহারই প্রেম তপস্তা সার্থক যে,—

পিরীতি অন্তরে পিরীতি মস্তরে,

পিরীতি সাধিবা যে।

পিরীতিরতন লভিল সেজন,

বড় তাগাবান্ সে ॥

সেই প্রেমিক, যে—

পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া,

পরেতে মিশিতে পারে।

পরকে আপন করিতে পারিলে।

পিরীতি মিলয়ে তারে ॥

পরকে আপন করিতে পারিলে পিরীতি পাওয়া যায়। নিজকে পরের সম্পূর্ণ অধীন করতঃ তাবেরই ইচ্ছাছানারে চালিত হওয়া

কি সাধারণ তপস্তার কথা ? তাই কবি
গাহিতেছেন,—

পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন,
কহে ষিখ চণ্ডীদাস।

হুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও,
ধাকিলে পিরীতি আশা ॥

প্রেম তপস্তা বড় কঠিন। যদি প্রেমে
মজিতে চাও, তেদ জ্ঞান মিটাইয়া এক হইতে
চেষ্টাকর। নতুবা তোমার কাদা মাথা সার
হইবে, মাছ খরিতে পারিবেনা। কিন্তু কবি
এ কঠোর সাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার ও
একটু আবছায়া দেখাইয়াছেন,—

চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী,
পিরীতি না কহে কথা।

পিরীতি লাগিলে পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা ॥

এই পথে ধীরে অতি সন্তর্পণ অগ্রসর
হইতে হইবে, খুব সাবধান—পদে পদেই পদ
অগনের সম্ভাবনা। পথ চলিতে আর পিরীতি
লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে, হুই ঘুচাইয়া এক
হইতে চেষ্টা করিবে, কারণ—‘ইহা বই নাহি
,আর।’ প্রেমের আড়ালে অগং ঢাকা আছে।
পিরীতি’ বলিয়া অন্ধর তিনটী ত্রিভুবনের
মধ্যে সারবস্ত আর।

পরাম সন্ধান পিরীতি রতন,
কুকিহু হনরতুলে।

পিরীতি রতন অধিক হইল,
পরাম উঠিল ফুলে ॥

কবিকল্পনা এখানেই অসীম ছাড়াইয়া
অসীমে পৌহছায় নাই। কবি-তুলাদণ্ডে
মাগিয়া আনিলেন, পরাম হইতে প্রেম অধিক
ভারী, কিন্তু এখানেই উহার শেষ পরিণতি
নহে; উহা আবার

নিতই নূতন পিতি হু’জন,
ভিত্তে তিলে বাড়ি যায়।

ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি খায় ॥

শেষে যীমাংসা কি হইল ?—প্রেমের
পরিণাম নাই। চণ্ডীদাস যখন যে বিষয়
লিখিয়াছেন, তখন তিনি তাহাতে ভুব দিয়া
তলাইয়া দেখিয়া গিখিয়াছেন। কবিদিগের
যাষ্ট্র ক্ষমতা—হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করা,
সে ক্ষমতা চণ্ডীদাসের পূর্ণমাত্রার ছিল এবং
ইহারই জন্ত তিনি প্রকীর্ণ কবিসমূহ হইতে
শ্রেষ্ঠ। তাঁহার জ্ঞান একরূপ গভীর প্রেমভিত্তি
আর কোন কবি অন্ধন করিতে পারেন
নাই—বিদ্যাপতিও পারেন নাই। বিদ্যাপতির
একটা মাত্র পদ চণ্ডীদাসের পদের সহিত
তুলনা হইতে পারে, তাহা অনেক অনেক-
বার উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, আদর্শ ও
এখানে সে প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি-
লাম না।—

সখিরে, কি পুছসি অহুতব ঘোর ?

সেই শিরীতি অহুতব বাথানিতে,

তিলে তিলে নুতন হোর ॥

জনম অবধি হামরূপ নেহারিছ।

নয়ন না তিরণিত তেল ।

সেই মধুর বোল শ্রবণহি শুনছ।

• স্রুতি পথে পরশ না গেল ॥

কত মধু বামিনী রঙসে গেরোরহু।

না বুঝছ কৈছন কেল।

লাখ লাখ যুগ হিরে হিরে রাখছ।

তবু হিরে জুড়ানা গেল ॥

যত সত রসিকাজন রস অঙ্গুগমন।

অহুতব কহে না পেখে।

বিদ্যাপতি কহে, প্রাণ জুড়াইতে,

লাখে না মিলিল একে ॥

বিদ্যাপতির ভাবার মাধুর্য্যও রচনার পারিপাট্য আছে, এ বিষয়ে তিনি অধিক প্রশংসনীয় কিন্তু চণ্ডীদাস যে ভাব-বে নুতনত্ব ঢালিতে পটু, তাহাতে তিনি অধিক কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই। চণ্ডীদাসের ভাবার শকাঙ্কর কিছুমাত্র নাই, যে কথা বলিলে ভাল শুনার বা মানার, সে কথাটি না বলিলে নয়, কেবল সেই কথাটি অপূৰ্ণ কোশল সহকারে বলাইয়া তিনি পাঠকের হৃদয় সিংহল জোরের দ্বারা হরণ করিয়াছেন।

ঐতর্য্যস্বর সান্যাল ।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে কোথা গেলে চলি

ভাবুক প্রবর তুমি গৌরব-কেতন ?

কণেকের তরে উদি, দীপ্ত-স্বৰ্ণা যথা,—

বিকাশিরে জ্ঞানদীপ্তি, আগারেছ তুমি

অলস মানবে স্নিগ্ধ গভীর আরাবে ;

যে আলোক জ্বালায়েছ, ধার্মিক মহান্

মানব-মানস-পটে দীপ্ত-রশ্মি তা'র

সহিবে হে চিরকাল অক্ষর স্পর্শেতে।

লভিরে অশেষ জ্ঞান অতৃপ্ত পিরাসা

লগ্নে সাথে চলিলে কি অজ্ঞাত প্রদেশে

অধিক শিকার তরে, ছাড়ি এ সংসার

ছিন্ন করি রেহ মায়া প্রেমের বন্ধন

অথবা বিপ্রাশ হেতু শাস্তিময় স্থানে ?

যাও তুমি সগৌরবে শান্তিলাভ আশে।

সংসার মরুভূ মাঝে চিরকাল ধরি

কাঁদি ঘোর সবিবাদে তোমার বিহনে।

সংসার অনলে তুমি আর না জলিবে

অনন্তকালের তরে জলিব আমরা।

সুখেছ অগৎ কেন ? হা বিধি নির্ময় !

এক স্বপ্নারেতে যদি চূর্ণিবে পর্ত্তত,

অস্তাচল শিরে যদি পূর্ণ স্তম্ভাকর

নিশান্তে পড়িবে চ'লি প্রকৃত কমল

দিনান্তে যদি গো বুদে স্বন্দর বরান।

হায় মাগো বঙ্গভূমি, অভাগিনী তুমি

উন্নতি সোপানে উঠ বাহার প্রাণেবে

সেই মাগো চলি বার ছাড়িরে তোমার।

ঐতর্য্যস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

অহল্যা-উদ্ধার ।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতিপূর্ণ সুপবিত্র চরিত্র কবিগুরু বান্দীকির মোহকরী বর্ণনার প্রভাবে অগতে অক্ষরবর্ণে বিরাজ করিতেছে । এই চরিত্র সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর । মহাকবি ভবভূতি ইহাকে চরিত্র-পঞ্জিকা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন । * । বাস্তবিকই ইহা সুচারুরূপে পঞ্জিকা ও স্মৃতি রত্নাকর স্বরূপ । কবিগুরু বান্দীকি শ্রীরামচন্দ্রের মহানীর চরিত্র এইরূপে গাথাবদ্ধ করিয়া ভারতের যে, অশেষ মহোপকার করিয়া গিয়াছেন, আজি অধঃপতিত অবস্থার আমরা তাহা স্পষ্ট ব্রূতিতে পারিতেছি । বহুবিধ ধর্ম ও সামাজিক বিপ্লবের পরেও ভারতীয় আর্থাগণ শিষ্টত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও দাম্পত্য-প্রণয় প্রভৃতি পবিত্র গুণাবলী অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে এবং আত্মোৎসর্গ ও লোকসুখের জন্যে এখনও যে, এত আদর রহিয়াছে, বান্দীকি-প্রণীত রামায়ণ তাহার প্রধান কারণ ।

মিথিলা রাজ্যের প্রান্তভাগে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম । সুনিপত্নী অহল্যা পতিশাপে

* “প্রতিমহত্তরং ভূতৈর্গৌরমানা চরিত্রাতি ।
প্রোতঃ পবিত্রং লোকানামিযং চারিত্রপঞ্জিকা ।

সর্বলোকের অদৃষ্টা হইয়া সেই তপোবনে উৎকট তপস্যায় নীরত ছিলেন । ষিষ্যমিহ তাঁহার পূর্ণশাপ-ব্রতান্ত কীর্তন করিয়া শ্রীরামকে বলিলেন “এই দেবকণিণী মহাভাগা অহল্যাকে উদ্ধার কর ।” গৌতমের শাপে অহল্যা এতদিন সর্বলোকের অদৃষ্টা হইয়া ছিলেন ; কিন্তু শ্রীরাবের আগমনে এক্ষণে নিজ শাপাবসান-কাল অবগত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন । শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তাঁহার সেই তপঃকর্ষিত ভেজঃপুঞ্জ কলেবর দর্শন করিয়া সানন্দে তমীর চরণ সুগল গ্রহণ করিলেন । গৌতমের পূর্ব কথা শ্রবণ করিয়া সাধ্বী অহল্যা শ্রীরামলক্ষ্মণকে সাধরে গ্রহণ করিয়া পান্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা আতিথ্য করিলেন । সেই সময়ে বর্গ হইতে পুন্সবৃষ্টি এবং দেবদ্রুতি নামিত হইতে লাগিল ; গরুড় ও অশ্বরোগণের মহানন্দজনি উদ্ভিত হইল । দেবগণ তপোবন-বিগ্ৰহাদী গৌতমবশাহুগা সাধ্বী অহল্যার সম্যকরূপে পূজা করিলেন । এই সময়ে মহাতেজা গৌতম হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া অহল্যাকে গ্রহণ পূর্বক পরম সুখ প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীরামকে বিদ্যবৎ পূজা করিয়া ত্রীপুংসবে মহাতপশ্চরণ করিতে লাগিলেন ।

বান্দীকীর রামায়ণে অহল্যা-উদ্ধার সম্বন্ধে বাহা বর্ণিত আছে, এখানে তাহাই উদ্ধৃত হইল । ইহাতে অতিপ্রাকৃতের অনন্য ছায়া

দেখিতে পাওয়া যায়। বিষয়টা অতীব গুরু-
তর; সুতরাং বিশদরূপে আলোচনা করা
যাইতেছে। গৌতম ইচ্ছাকে শাপ দিয়া
অহল্যাকে বলিতেছেন :—

“ইহ বর্ষসহস্রাণি বহুনি নিবসিষ্যসি
বাততক্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভগ্নশারিণী।
অদৃশ্তা সর্ক্কতুতানামাপ্রমেহস্মিন্ বসিষ্যসি।
বদা যেতবনং ঘোরং রামো দশরথায়জ্ঞঃ।
আগমিষ্যতি হর্ক্কর্বত্তদা পুত্রা ভবিষ্যসি।
ভক্ত্যতিথেন হর্ক্কৃত্তে লোভমৌহবিবজ্জিতা।
বৎসকালং মুদা যুক্তা স্বং বপুর্ধারিষ্যসি॥” *

অনাহারে বাত ভক্ষণ করিয়া তপঃ অমু-
ষ্ঠান পূর্বক সর্ক্কতুতের অদৃশ্তা হইয়া এই
আশ্রমে বহু সহস্র বৎসর ভগ্নশরমানে বাস
করিবি। তাহার পর দশরথায়জ্ঞ হর্ক্কর্ব রাম
বধন এই বনে আগমন করিবেন, তখন তুই
পবিত্রতা লাভ করিবি। যে হর্ক্কৃত্তে! লোভ
মৌহ বর্জন পূর্বক তাহার আতিথ্য করিয়া
স্মনস্বে পুনর্বার আমার সহিত মিলিত হইবি
এবং নিজ দেহ ধারণ করিবি।

কথিত আছে অহল্যা গৌতমের শাপে
পাষাণী হইয়াছিল, এখানে তাহার কিছুমাত্র
জ্ঞেয় নাই। পুনশ্চ অহল্যার উদ্ধারকালে
বান্দীকি যাহা বলিয়াছেন, এখানে তাহাও
উদ্ধৃত হইল।

১০। বান্দীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৪২ সর্গ।

“বিখ্যামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষণঃ।
বিখ্যামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমং প্রবিবেশহ॥
দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।
লোটেকরপি সমাগম্য হুনিরীক্ষ্যাং সুরাসুতৈঃ
প্রযত্নান্নির্মিতাং ধাত্রা দিবাং মারাময়ীমিব।
ধূমেনাভিপত্রীত্যঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব।
সতুবারাবৃতাং সাত্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।
মধ্যাহ্নমসৌ দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্য্যপ্রভামিব।
সাহি গৌতমবাকোন হুনিরীক্ষ্যা বভূবহ।
জ্ঞানানামপি লোকানাং যাবদ্রামশ্চ দর্শনম্॥
শাপস্তাস্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা।
রাঘবৌ তু তদা তস্তাঃ পানৌ জগৃহতুর্মুদা॥
স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজ্ঞগ্রাহ সা হি তো।
পাদ্যমর্ঘ্যাস্তথাতিথ্যং চকার স্তসমাহিতা॥”

মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম লক্ষণের
সহিত বিখ্যামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই
আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ;— করিয়া তপস্তা
ঘরা দ্যোতিতপ্রভা ও সুরাসুতের হুনিরীক্ষ্যা
মহাভাগা অহল্যাকে দেখিতে পাইলেন।
দেখিলেন বিধি যেন তাঁহাকে পরম যত্ন সহ-
কারে দিবা মারাময়ীর জায় সৃষ্টি করিয়া
রাখিয়াছেন ; তিনি ধূমাজ্জর প্রদীপ্ত অগ্নি-
শিখা, তুবারাবৃতা অজ্ঞাষিতা পূর্ণচন্দ্রপ্রভা, ও
সলিল মধ্যাহ্ন দীপ্ত সূর্য্যপ্রভার জায় দুরাধর্ষা
হইয়া বিরাজ করিতেছেন। গৌতমের
বাক্যানুসারে শ্রীরামের দর্শন পর্ষ্যন্ত তিনি
জিলোকেরও হুনিরীক্ষ্যা হইয়াছিলেন। ১কণে

শাপাবসানে তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে অক্লিষ্ট হইলেন। তখন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ আনন্দ সহকারে তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করিলেন এবং অহল্যাও গৌতমের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের উত্তর ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া সুসমাহিত চিত্তে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের আতিথ্য করিলেন।

এস্থলেও শাপাণের মানবীকরণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। অহল্যা গৌতম শাপে সর্বভূতের দুর্নিরীক্ষ্য অথচ তপস্তা দ্বারা দ্ব্যোতিত প্রভা হইয়া ধূমাক্ত প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা, তুষারাবৃত পূর্ণচন্দ্র প্রভা ও সলিল মধ্যস্থ প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মির ভাষা বিবাহ করিতেছিলেন; স্মরণ্য তিনি যে পাখীগী হইয়া নিজীবভাবে তথায় পতিত ছিলেন, একথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। মহর্ষি বাম্বীকির এই কয়েকটি কথার তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, অহল্যা-উদ্ধার ব্যাপারে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দেব-ভাবে কল্পিত উল্লেখ করেন নাই। অহল্যা গৌতমের বাক্যে সর্বভূতের অদ্ভুত হইয়া ছিলেন, শ্রীরামকে দেখিয়া সকলের সম্মুখে দেখা দিলেন। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার পাদযুগল স্পর্শ করিলেন। শ্রীরামের আগমনে তাঁহার শাপকালের অবসান হইল জানিয়া তিনি সকলকে দেখা দিলেন। স্মরণ্য তিনি যে এতদিন পাদপীব

ভাষা নিজীব ভাবে ছিলেন এবং রামের পাদ-স্পর্শে মানবী হইলেন, ইহার কোন স্থলেও সেরূপ কোন বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল বিষয়ের আগেচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, কবিগুরু বাম্বীকি অহল্যা-উদ্ধারকে শ্রীরামের অতি প্রাকৃত কার্য বলিয়া নির্দেশ করেন নাই; অর্থাৎ এ কার্যে যে শ্রীরামচন্দ্রের দেবভাবও আরোপিত হয় নাই, তাহা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি। অতএব অহল্যা-উদ্ধার বাম্বীকির মতে শ্রীরামের অতি প্রাকৃত কার্য নহে এবং এ কার্যে শ্রীরামের উপর দেবত্ব আরোপিত হয় নাই; বরং এক-স্থলে নির্দিষ্টপন্থা শুদ্ধ দশরথায়াজ শব্দ দ্বারা শ্রীরামের মানবত্ব প্রতিপাদিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

অধ্যায় রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বব্রত প্রতিপাদন করিবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। গৌতম অহল্যাকে শাপ দিয়া বলিলেন “হুটে। তুই পরমেশ্বর শ্রীরামকে হৃদয়ে ধাম্য করিয়া আমার এই আশ্রমস্থ শিলাতলে থাকিবি *।” তাহার পর তাঁহার উদ্ধারের উপায় উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, “এইরূপে বহু সময় বৎসর অতীত হইলে যখন দশরথায়াজ শ্রীমান্

* অধ্যায় রামায়ণ, আদিকাণ্ড পঞ্চম অধ্যায় = ৭।২৮ শ্লোক।

স্বাক্ষর করিয়া লক্ষ্যের সহিত আগমন করিয়া
চক্ৰ দ্বারা তোর আশ্রয়শীলা স্পর্শ করিবেন,
তখনই তুই শাপ হইতে বিমুক্ত হইবি * ।
তবু ইহাই নহে, শাপ হইতে মুক্তিলাভ
করিয়া অহল্যা যে কয়েকটা স্তোত্র দ্বারা
শ্রীরামের পূজা করিয়াছিলেন, তাহার
প্রত্যেকটিতেই তাহার পূর্ণব্রহ্ম প্রতিপাদিত
হইয়াছে । বাহ্যিক ভাবে তদ্ব্যপ্ত হইতে কেবল
একটি স্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল :—

“অয়ং হি বিখ্যাতবসংযমীনা

মেকঃ স্মার্য্যাপ্তপরিব্রিতো যঃ ।

বিরিকিবিবীকীর নাম তেদান্

যন্তে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণ আত্মা ।” †

ইনিই একাকী বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও
সংহারের কর্তা ; স্বীয় মাস্তাজনিত সম্বরণভ্রম
প্রভৃতি গুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিরিকি,
বিষ্ণু ও শিব এইরূপ তিন তিন নাম ধারণ
করিয়া থাকেন ; পরন্তু ইনি স্বতন্ত্র, অব্যয়,
পরিপূর্ণ পরাত্মা ।

অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামের পূর্ণব্রহ্মত্ব
স্বীকৃত হইলেও, কিরূপ অতিপ্রাকৃত কার্য
দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এখানে

* । আধ্যাত্ম রামায়ণ, আদিকাণ্ড,
পঞ্চম অধ্যায় ৩০।৩১ স্লোক ।

† । আধ্যাত্ম রামায়ণ, আদিকাণ্ড,
পঞ্চম অধ্যায় ৫৪ স্লোক ।

তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে ; সেই
সঙ্গে, অহল্যা উদ্ধার উপাধ্যায়টী ঐতিহাসিক
কি না তাহারও যথাযথ সমালোচনা করা
আবশ্যক । প্রথমতঃ বান্দ্রীকীর রামায়ণে
লিখিত আছে শ্রীরামকে দর্শন করিয়া মাত্র
অহল্যা পতিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন ।
এস্থলে অধ্যাত্ম রামায়ণকার বলিতেছেন যে,
শ্রীরাম স্বীয় চরণ দ্বারা অহল্যার সেই আশ্রয়
শীলা-স্পর্শ করিয়াই সেই তপস্বিনীকে দেখিতে
পাইলেন ; অর্থাৎ শ্রীরামের চরণস্পর্শে
অহল্যার পাপ বিমুক্ত হইবা মাত্র তিনি
সকলকে দেখা দিলেন । (বলা বাহুল্য এত-
দিন তিনি সর্ব্বজীবের অদৃষ্টা হইয়াছিলেন ।)
অহল্যা উদ্ধার সম্বন্ধে বান্দ্রীকি ও অধ্যাত্ম
রামায়ণকারের যে, ঐকমত্য নাই, এস্থলে
তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে । অহল্যার শাপ
ও উদ্ধার প্রসঙ্গে স্বয়ং বান্দ্রীকি, পৌতম,
অহল্যা বা বিবামিজ কেহই এস্থলে শ্রীরামকে
পূর্ণব্রহ্ম অথবা তাহার অন্ততম গুণাত্মক বিষ্ণু
বলেন নাই * । কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণকার

* রামায়ণ উত্তরকাণ্ড, ৩৫ সর্গে এ
সম্বন্ধে আর একটি উপাখ্যান আছে । তাহার
একস্থলে শ্রীরাম নরেন্দ্রধারী বিষ্ণু বলিয়া
বর্ণিত হইয়াছেন । তদাখ্য,—

উৎপত্ততি মহাতেজা ইক্ষাকুণ্ঠং মহারথঃ ।

রামো নাম ঋতো লোকে বনং চাপ্যুপযাতি

তাহাকে একেবারেই পরাংপর পরিত্যক্ত নারায়ণ রূপে অবতারিত করিয়াছেন। অবশ্য বান্দীকি রামায়ণ যে, অধ্যাত্ম রামায়ণের বহু-পূর্বে রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং বান্দীকীর রামায়ণের দ্বারা অবলম্বনে যে, অধ্যাত্ম রামায়ণ রচিত হইয়াছে, একথাও বলা অসম্ভব নহে। মূল গ্রন্থে বাহা নাই, অল্পকরণে তাহা দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন; কিন্তু তাহারা দেখিলে ইহাতে বিশ্বাসের কোন কারণই নাই; কেন না অধ্যাত্ম রামায়ণকার ঐরামের পূর্বব্রহ্ম প্রতীপাদন করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যার্থে মহাবাহুবিকৃৎস্নাশ্ববিগ্রহঃ ॥

তং জ্ঞানসি বদা ভজে ততঃ পূতা ভবিসাসি।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যে কতকগুলি অদ্ভুত উপভাস বর্ণিত আছে, অনেকে সেগুলিকে বান্দীকি-রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে এই সর্গটিকেও প্রকৃষ্ট বলিতে হইবে। যদিও বান্দীকি ঐরামের পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ সংক্রান্ত বিবরণ বর্ণন করিবার সময় তাহাকে নরদেহধারী বিষ্ণু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি অহল্যা-উদ্ধারের মৌলিক উপাখ্যানে ঐরামচন্দ্রের বিষ্ণুত্বের অণুমাত্রও উল্লেখ না থাকাতঃ একটা বিশ্বাস সন্দেহ রহিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ অহল্যা-হরণ বৃত্তান্ত বাস্তবিক ঐতিহাসিক কি না এখানে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। রামায়ণের পূর্বে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে অহল্যা ও গৌতমের এরূপ কোন বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রামায়ণের পরবর্তী সকল গ্রন্থেই বিশেষতঃ মহাভারতের স্থানে স্থানে ইন্দ্রকর্তৃক অহল্যা-হরণের সংকিষ্ট বিবরণ দেখা যায় *। উত্তরাকাণ্ডে অহল্যার জন্ম, বিবাহ, হরণ ও উদ্ধার সম্বন্ধে একটা উপাখ্যান আছে। তাহাতে অহল্যা সৃষ্টির প্রথম রমণী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং পিতামহ, অমরেন্দ্রের নিকট অহল্যার সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিতেছেন, “পূর্বে আমি যে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহাদিগের এক বর্গ, সমান ভাষা, ও একই প্রকার রূপ ছিল; তাহাদিগের দর্শনে বা লক্ষণে কিছুই প্রভেদ ছিল না। সেই প্রজাকুলের সেইরূপ ভাব দর্শনে আমি তিন্তা করিতে লাগিলাম এবং তাহাদিগের পার্থক্য

*। “অহল্যা ধর্মিতা পূর্বমুখিপত্নী বশকিনী।
জীবতো ভর্ত্তি রিক্রেণ স বঃ কিম্ নিবাসিতঃ ॥”

অপিচ, মহাভারতের অন্তঃ,—

মহাভারত, উদ্যোগপর্ব।

“অথ শশুচ ভগবান গৌতমেন পুরন্দরঃ।

অহল্যাঃ কামদানোবৈ দম্পত্যর্থক নং হিমিতঃ ॥”

সাধন করিবার নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেকের
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎকৃষ্টাংশ লইয়া একটা রমণী
সৃষ্টি করিলাম। তাহারই নাম অহল্যা।”
অনন্তর ব্রহ্মা অহল্যা শব্দের ব্যুৎপত্তি নিম্ন
করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্রকে বলিতেছেন,
“হল অর্থে বৈরূপা ; সেই হলে অর্থাৎ বৈরূপো
বাহার অর্থ, তাহাকে হল্যা বলা যায়। বাহার
হল্যা নাই, অর্থাৎ যে রূপবতী ; সেই রমণীই
অহল্যা। সেই অস্ত্রই আমার সেই সৃষ্টা বাম-
লোচনা অহল্যা নামে প্রসিদ্ধ।” ইহার পর
মহর্ষি গৌতমের সহিত অহল্যার বিবাহ ;
ইন্দ্রকর্জুক অহল্যা-হরণ, গৌতমের শাপ এবং
পরিশেষে অহল্যার শাপ-মোচন প্রভৃতি বিব-
রণ পূর্বের ভাষা একরূপই দেখা যায়। কেবল
একটা স্থানে অন্ন মাত্র প্রভেদ লক্ষিত
হয় ;—আদি কাণ্ডে অহল্যার শাপমোচন
সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে, তাহার কোন
স্থানেই ঐরাম বিষ্ণু বলিয়া নির্দিষ্ট হয়েন
নাই ; কিন্তু এই উত্তরকাণ্ডে তাহার বিষ্ণুত্বের
উল্লেখ দেখা যায় *। সে যাহা হউক,
অহল্যা যে সৃষ্টির আদ্যা স্ত্রী নহেন, হিন্দু-
শাস্ত্রের ব্যক্তি মাত্রই তাহা অবগত আছেন।
তবে এ অহল্যা কে ? সেই গৌতম, সেই
ইন্দ্র, সেই ঐরাম,—সকলেরই উল্লেখ এবং
সেই একই রূপ সমাবেশ দেখা যাইতেছে,

*। পূর্ববর্তী টীকা সত্বে।

অথচ আদৌ অহল্যাকে লইয়া বিষয় সমস্ত।
গৌতম-পত্নী অহল্যাকেই আদ্যা মানবী বলিয়া
স্বীকার করিতে হইলে অস্ত্রান্ত শাস্ত্রবচনের
সহিত বিষয় বিরোধ ঘটিবে। ঐতিহ্যের
সহিত এস্থলে মহাকাব্যের বিরোধ উপস্থিত ;
সুতরাং এস্থলে ঐতিহ্যের বচনই গ্রাহ্য ;
অতএব এ উপাখ্যানটা কতদূর মৌলিক,
তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। অনেকেই
ইন্দ্র ও অহল্যার উপাখ্যানকে রূপক বলিয়া
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ব-
বিদগণ তা বলিবেনই ; ভারতীয় প্রসিদ্ধ
প্রাচীন আচার্য্য ভট্ট কুমারিল স্বামীও ইহাকে
রূপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,
এস্থলে অহল্যা রজনী এবং ইন্দ্র সূর্য্যের অর্থে
রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্য রজনীকে
জীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় করেন বলিয়া রজনীর অর্থাৎ
অহল্যার জাররূপে আখ্যাত হইয়াছেন *।

*। (ক) “সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন-
শব্দবাচ্যঃ
সবিতৈবাহনি লীযমানতঃ। রাজেরহল্যাশব্দ
বাচ্যঃ।
ক্ষয়ান্নকল্পরণহেতুত্বাজীর্ণাত্যাদিনেন
বোধিতেন
বেতাহল্যাজার ইত্যাচ্যতে ন পরজীব্যন্তি-
চারাৎ।”

(খ) প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ম্যাক্‌দগ্‌লার

ইন্দ্রের অহল্যা হরণ বৃত্তান্তের ভাষ্য প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মাকর্ষক সাবিত্রী, গায়ত্রী বা শত-রূপার হরণ বিবরণও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল গ্রন্থ পবিত্র শাস্ত্র বলিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে আদৃত

সাহেবও এসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাহারাই তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তৎপ্রণীত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ৫২৯ পৃষ্ঠা দেখিবেন।

(গ) কিছুকাল পূর্বে “প্রচার” নামক মাসিক পত্রিকার ইন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে একটা নূতন মত প্রকটিত হইয়াছিল। প্রয়োজন বোধে এখানে তাহারও কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। সেই প্রবন্ধের লেখক অহল্যাকে ভূমি এবং ইন্দ্রকে আকাশ অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিতেছেন :—

“সকলেই জানেন হল বলে লাজলকে। অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা কর্ষিত হয় না,—কঠিন অশুষ্কর। ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া গেই কঠিন ভূমিকে কোমল করেন,—জীর্ণ করেন, এইজন্ত ইন্দ্র অহল্যাকার। জু ধাতু হইতে কার শব্দ নিস্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন; এইজন্ত তিনি অহল্যাতে অভিগমন করেন।”

“প্রচার” ১ম বর্ষ, এবং “বঙ্গ-দর্শন”

১২৮১ সাল ৪৬৮ পৃষ্ঠা।

হইয়া আসিতেছে, তাহাতে যে, একরূপ রুচি-বিগহিত ভ্রাকারজনক অশ্রুত ব্যাপারের উল্লেখ থাকিবে, এবং যে সকল দেবতা হিন্দুর পরম আরাধ্য বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা যে, আপনাদের দেবত্ব জুলিয়া নিকৃষ্ট কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত একরূপ পৈশাচিক বা পাশব-ব্যবহার করিবেন, এ চিন্তা ক্রমদেহে স্থান দিতেও ক্ষমত উন্নত হইয়া উঠে। যদি ইন্দ্রের গুরুপত্নী-হরণ এবং ব্রহ্মার কল্যাভিগমন বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের দেবতার আসন পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট পশুর মনসিষ্ঠ মহাতলে অথবা পিশাচের প্রেতভূমে বাস করা উচিত ছিল। শাস্ত্র-কারগণ যে শাস্ত্রের ও যে সকল দেবতার প্রকৃষ্টতা সাধন করিবার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ ধর্মের ও ধর্মতত্ত্বের সারভূত অংশ সমুদায়ের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা, জানিয়া শুনিয়া একরূপ নিকৃষ্ট, চেয় ও স্থগ্য ব্যাপারের উল্লেখ করিবেন, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

আর একটা বিষয় এখানে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। ঋগ্বেদাদি অতি প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে “ইন্দ্র” শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,—কোথাও সবিতা, কোথাও সূর্য্য, কোনও স্থানে বা আকাশের অর্থে ইন্দ্র শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পৌরাণিক শতী

পণ্ডি ইন্দ্র বৈদিক ইন্দ্র নহেন। পুরাণকারেরা ইন্দ্রের সেরূপ নির্দিষ্ট স্বভাব সত্ত্বগুণ সৃষ্টি করিয়াছেন, যেদে সেরূপ কিছুই নাই। বৈদিক ইন্দ্রের এইরূপ নানারূপ স্বপৌরাণিক উপাখ্যান রচয়িতৃগণের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে নানা আকারে কল্পিত হইয়াছে; এমন কি ব্রহ্ম, সূর্য্য বা আকাশ বাচক এক একটা শব্দ অথবা বিশেষণ পর লইয়া পৌরাণিকেরা এক একটা উপাখ্যান রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল উপাখ্যানের অধিকাংশ আধৌ কালিনিক হইলেও প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ বলিয়া প্রায়ই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ইন্দ্রের অহল্যা-হরণ বৃত্তান্ত যে, ইন্দ্রের সেই রূপ রূপক অথবা গুণবাচক বাক্য অবলম্বনে উপাখ্যানকারে রচিত হয় নাই, তাহা সহজে বলা বাইতে পারে না। বেদে যে পদ বৈদিক ইন্দ্রের সামান্য গুণ-বাচক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, পুরাণে ও মহাকাব্যে হয়ত তাহা শ্রীরামচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব ও অতিপ্রাকৃত কার্যের প্রমাণ রূপে একটা উপাখ্যানের আকারে বিস্তৃত হইয়া থাকিবে। পরন্তু এক্ষণ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

অহল্যা-হরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লেখকের রচিত “বীরমালা” নামক বিশাল গ্রন্থে দ্বাদশ বৎসর পূর্বে প্রকটিত হইয়াছে।

আং সং।

গৃহীত কৰ্ত্তব্য ।

হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহশ্রমই সকলের শ্রেষ্ঠ। এখানকার বাবতীর মিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া জীবনবাণী নির্বাহ করিতে পারিলে মানব অনারোগ্যেই ভোগ মোক্ষ করতলগত করিতে সমর্থ হয়। এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া গৃহীগণকে পদে পদে পরীক্ষা প্রদান করিয়া আত্মোন্নতি করিতে হয়। ধর্মের সহায় ব্যতীত এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আর কোন উপায় নাই। ধর্মই গৃহশ্রমের প্রধান বল, এই বলে বলীমান হইতে না পারিলে কেহই সংসারে থাকিয়া উন্নতি করিতে পারিবে না। গৃহ ধর্মঘর না হইলে গৃহী ধার্মিক ও ঈশ্বর বিশ্বাসী না হইলে সংসারে তাহার ভ্রম নাই। গৃহী মিথ্যাকথা কহিতে মত্তত যুগা করিবেন, বাহাতে সদা-সর্বদা সত্যবাদী হইতে পারেন সে বিষয় সচেষ্ট হইবেন। তবে সত্য কথা বলিয়া কাহার ক্ষমের যদি আঘাত লাগে কিবা কাহার অনিষ্ট হইবার সত্যবনা থাকে, তাহা হইলে সেরূপ হলে কোনও কথা বলা উচিত নয়। এই অল্প শাস্ত্র বলিয়াছেন “সত্যং ক্রমাৎ গম্য ক্রমাৎ, ন ক্রমাৎ সত্যমগ্রিম্।”

গৃহী ব্যক্তি স্ব স্ব ধর্মোচ্চসারে ঈশ্বর সেবা করিবেন কখনও ধর্মোচ্চর গ্রহণ করিবেন না।

অগত কোনও ধর্মের নিন্দা করা কদাচ উচিত
নহে, কারণ সকল ধর্মের মূল এক ঈশ্বর
ব্যতীত আর কিছুই নহে। যিনি যেকোন
ভাবেই ধর্মচর্চা করুন না কেন ; সকলেই যে
সেই পরম-কারণ, বিশ্বজীবন পরমেশ্বরকে
পাঠবার জন্য লাগান্নিত তাহা কেনা স্বীকার
করিবে। প্রথমতঃ নানাবিধ শিক্ষার দ্বারা
ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া আপনার
চরিত্র মার্জিত করিতে হইবে। অমার্জিত
চরিত্র ব্যক্তি কখনও গৃহীনােমের যোগ্য হইতে
পারে না। চরিত্র মার্জিত না হইলে কখন
ধর্মে মতি স্থির থাকিতে পারে না। যে
গৃহের গৃহীধর্মে অচলা ভক্তি স্থাপন করিতে
পারেন, সেই ব্যক্তিই সংসারে প্রকৃত যুগ
সন্তোষ করিতে সমর্থ। ধর্মই মানবজীবনের
একমাত্র সহায় এবং সেই ধর্মের ধন ভগবানই
আমাদের পিতামাতা এবং সর্ববিধ সুখ-দাতা।
সংসারে আমরা যখন যেকোন অবস্থার থাকি
না কেন ; সেই একমাত্র কৰ্ত্তা ভগবান সকল
অবস্থার ভিতর হইতেই আমাদের কল্যাণ
সাধন করিতেছেন ; এইরূপ বিশ্বাস করিলে
—তাহাকেই আমাদের একমাত্র মঙ্গলকর
নিরস্ত্র জানিলে আর আমাদের ভাবনা কি ?
এইরূপ বিশ্বাস মনোমধ্যে দৃঢ়তর হইলে
আমাদের পাশে দেহমন কলঙ্কিত হইবার
কোন আশঙ্কা থাকে না। গৃহীর ধর্ম বিনা
শক্তি নাই ; প্রত্যাগে শয্যা হইতে পাত্ৰোখান

করিয়াই ধর্ম-প্রাণ হিন্দু গৃহস্থের ধর্ম কার্য
আরম্ভ হয়, হিন্দু জীবনে এমন কাজ কিছুই
নাই, বাহা ধর্মের সহিত সংবদ্ধ নহে ?
প্রাতঃকাল হইতে সারাহ্ন পর্য্যন্ত এবং সারাহ্ন
হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত গৃহী বাহা
করে, তৎসমস্তই ঈশ্বর পূজা ভিন্ন আর
কিছুই নহে। এই জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—

প্রাতঃকথায় সারাহ্নাং, সারাহ্নাং প্রাতঃরক্তত।
যংকরোমি অগ্ন্যাত তদেব তব পূজনং।

প্রত্যহ বাহা করিবে সমস্তই ঈশ্বরোদ্দেশে,
—তাহার প্রীতি সম্পাদনের জন্য করিবে—
ইহাই শাস্ত্র জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। গৃহী
ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জানিয়া
সর্ব প্রথমে তাহাদের সেবা করিবেন।
দেবতার প্রতি যেকোন ভক্তি প্রজ্ঞা ও আন্ত-
রিক আত্মগত্যা প্রদান করিতে হয় ; আমাদের
প্রত্যেক দেবতা জনক জননী প্রভিও সেই-
রূপ ভক্তি প্রজ্ঞাদি প্রদর্শন করা উচিত, না
করিলে প্রত্যাব্যায়ভাগী হইতে হয়। তদ্ব্যবসায়
প্রতিনিধি স্বরূপ পিতামাতাই আমাদেরিকে
অন্নদান করিয়া লালন পালন করিয়াছেন, ইহ
জীবনে আমরা বাহা কিছু সন্তোষ করিতেছি
তৎ সমস্ত তাহাদেরই প্রীতরণ প্রদান
অতএব তাহাদের ভূটি সম্পাদন করা গৃহী
মাজেরই অবশ্য কৰ্ত্তব্য। পিতা মাতা ব্যতীত
অন্যান্য পুরুষজনগণকেও যথা সম্ভব ভক্তি
প্রজ্ঞা করিবে। তাই ভগ্নী এবং আত্মীয়

স্বজনকে স্নেহ চক্ষে দর্শন করিয়া তাহাদের সেবা করিবে; দাস দাসীপণকে কখনও কষ্ট কথ্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানলাভ না করিলে গৃহী কখনই সংসারে উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন না। নানা শিক্ষার পারদর্শী হইলে পর গৃহী ব্যক্তি ধর্ম্মশ্রী, সদাচারিণী, গৃহধর্ম্ম সুদক্ষা, সুশিক্ষিতা এবং সদগুণ সম্পন্ন, সম্বংশজা জারায় পাণিগ্রহণ করিবেন। গৃহীর পক্ষে বিবাহ একান্ত আবশ্যক; লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহিনীই গৃহের একমাত্র আলোক স্বরূপিণী, অবস্থান-সায়ে নির্বাচন করিয়া এই রত্ন গ্রহণ করা উচিত, অজহীনা কথ্য বা ব্যাধিগ্রস্তা জ্বর পাণিগ্রহণ করা কদাচ উচিত নহে। মাহুষ বতদিন অবিবাহিত থাকে ততদিন পূর্ণ বয়স হয় না।

নির্বাচন সময়ে কোনরূপ রিপু পরবশ বা নোভের বশবর্তী হইলে সে নির্বাচন কখনই মনোমত হইবে না—তাহাতে কখনই লোকের আশা করা যায় না। একের অধিক পত্নী গ্রহণ করা সংসারীর কোনক্রমে উচিত নহে। আমাদের আধ্যাত্মবিগণ প্রায় সকলেই গৃহী ছিলেন; সকলেই মনোমত ধর্ম্ম পত্নী গ্রহণ করিয়া সংসার ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

গৃহীর গৃহ একটা ক্ষুদ্র রাজ্য বিশেষ; গৃহী ও গৃহিণী এই রাজ্যের রাজা ও রানী;

এই রাজা ও রানী স্বরূপ গৃহী ও গৃহিণী গার্হস্থ্য ধর্ম্মে পাকা না হইলে, অপরিপক্ক নাবিক কর্তৃক তরণীর অবস্থার জ্ঞান সংসার-তরণী ও সর্বদা বানচাল হইয়া থাকে; এইজন্য অধীনস্থ জনগণের কষ্টেরও একশেষ হইয়া থাকে। সংসারী ব্যক্তি নিজ গৃহিনীকে লক্ষ্মী স্বরূপা জানিয়া তাঁহাকে সদা সম্বন্ধে প্রতিপালন করিবেন; অন্তরের সহিত ভাল বাসিবেন। অন্ন বস্ত্র এবং যদি অবস্থা অনুকূল হয় তাহাহইলে অলঙ্কারাদির দ্বারা তাহার মনস্তৃষ্টি করিতে অবহেলা করিবে না। সে সংসারে জীপুরুষে এক ঐক্য হইয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহাই স্বর্গের সমান এবং তথায় ধর্ম্মের স্রোত স্বতই প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। এইজন্য ভগবান যাজ্ঞবল্ক তদীয় সংহিতায় বলিয়াছেন;—

যত্রাকুলাং দম্পত্যোজ্জিবর্গস্তত্র বর্জতে”

স্বামী জীৱ প্রতি যেক্রপ অল্পরক্ত হইবেন, জীও তক্রপ পতিকে আপন দেবতা জানে তাঁহার সংদৃষ্টান্ত প্রতিপালন করিতে যত্নবতী হইবেন; পারিবারিক উন্নতির জন্ত তিনিও তত্তার সহিত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সহধর্ম্মিনী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। সদা সর্বদা দয়া মায়া ও দানে গৃহীপণ মুক্ত হইবেন। পুরুষের প্রধান ধর্ম্ম যেমন দান, স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম্ম তেমনি সত্য স্বরক্ষা করা—ইরূপে নিগূঢ় প্রেমস্বভে

আবদ্ব হইয়া তাঁহার ইহলোকেই স্বর্গ স্বখ-
দান করিবেন। পত্নীর সহায়তা ভিন্ন গৃহী
ব্যক্তির সংসারে কণ্যাণ প্রদত্ত অল্প কিছু নাই।

গৃহী ব্যক্তি কখন জীপবশ হইবে না,
অথবা জীপ সহিত কখন কুব্যবহার করিবে
না। জীপ গর্ভবতী হইলে তাহার যথোপযুক্ত
সেবা শুশ্রূষা করা গৃহীব্যক্তির একান্ত
কর্তব্য। সেই গর্ভে কন্তাই হউক কিম্বা
পুত্রই হউক তাহা জীপের দান বলিয়া কৃতজ্ঞ
হৃদয়ে তাহাদিগকে লালন পালন করিবে।
পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে যত্নের সতি
লালন পালন করিয়া, পরে বিদ্যা শিক্ষার জন্য
সতত প্রয়াস পাইবে, কারণ পিতা মাতার
উপরই পুত্র কন্তাগণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করি-
তেছে। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পুত্রগণ যাহাতে
চরিত্রবান ও ধর্মপরায়ণ হইতে পারে, সেবিষয়
পিতা মাতার তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা একান্ত উচিত।
গৃহীগণ সদাচার পরায়ণ না হইলে তাহারা
সংসারে লক্ষ্মীভী থাকে না। এই জন্য চানিত
কথার বলিয়া থাকে “আচারে লক্ষ্মী বিচারে
পত্নী”।

পুত্র কন্তাগণ বিবাহোপযুক্ত হইলে;
যথার্থ পাত্র ও পাত্রী নির্বাচন করিয়া তাহা-
দের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিবে। কেবল
অর্থের গোতে নিশ্চয় পাত্র কিম্বা কুশীলা
পাত্রী নির্বাচন করিয়া শাস্ত্রময় সংসারে
অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত করিবে না। অতি

লোভ পরিত্যাগ করিবে, সংপথে থাকিয়া
যাহা উপার্জন হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে।
লোভের বশবর্তী হইয়া কখন অসৎ উপায়ে
অর্থ উপার্জন করিবে না। প্রাপ্ত-বস্তু পরি-
ত্যাগ করা গৃহীর কর্তব্য নয়। এইজন্য শাস্ত্র
বলিতেছেন “অতি লোভঃ ন কর্তব্য, লব্ধং
নৈব পরিত্যজেৎ, অতিলোভাতীভূতঃ চক্রঃ
ভ্রমতি মন্তকে।” এতদ্ব্যতিরিক্ত সংসার না
করিয়া গৃহী ব্যক্তির জলগ্রহণ করা উচিত
নহে। সামান্য ইতর ব্যক্তি হইতে ধনী ব্যক্তির
প্রতি সমান সম্ব্যবহার করিবে। তিনি
আয়ের অধিক ব্যয় করিবেন না, সকল বিষয়ে
পরিমিত ব্যয়ী হওয়া উচিত। অল্পবয়সী
অপ্রবাসী হইয়া জীবনধারণ করাই গৃহীব্যক্তির
পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। সংসারী ব্যক্তি ঋণ গ্রহণই
করিতে বা ঋণ প্রদান করিতে বিশেষ সাব-
ধান হইবেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্তরে থাকিতে
পারিলেই ভাগ হয়। তবে যদি এফাত্তই
ঋণপ্রদান করিতে হয়; তাহা আর প্রতি
ঋণের প্রত্যাশা করিবেন না। ঋণদান
করিয়া পুনঃপ্রাপ্ত না হইলে ভ্রাতার অভাবে
সাহায্য করিয়াছেন তাবিয়া সন্তুষ্ট হইবেন।
কাহার নিকট ঋণগ্রহণ করিলে তাহা প্রতি-
জ্ঞামত যথাসময়ে প্রদান করা উচিত। গৃহী
ব্যক্তির মামলা মকদ্দমায় লিপ্ত থাকা কখনই
উচিত নয়। তবে যদি একান্ত বাধ্য হইয়া
লিপ্ত হইতে হয়; তবে নিশা বাক্য প্রয়োগ

করিয়েন না। গৃহীমাজেরই জৈববিধানী হওয়া কর্তব্য। পরিবারই কোনও ব্যক্তির বা নিজের শ্রীক্ষা হইলে অবহেলা না করিয়া অবগতহুসারে জৈবিক চিকিৎসক দ্বারা রোগের চিকিৎসা করান একান্ত কর্তব্য, নতুবা পাপভাগী হইতে হয়। শোক-দুঃখ ও অভাব জনিত দুঃখে অর্ধাধ্য ন্য হইয়া ভগবানে মতিস্থির রাখিলে তাহা অচিরেই বিনষ্ট হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্ত স্মৃতি বলিতেছেন “স জীবতি গুণা যন্ত যন্ত ধর্ম সী জীবতি, গুণধর্ম পরিভ্রষ্টে জীবয়পি ন জীবতি। অর্থাৎ সঙ্গুল সাংসার ব্যক্তি আর ধার্মিক ব্যক্তিরাই যথার্থ উদ্বীষিত; গুণহীণ অধার্মিক ব্যক্তিগণ সংসারে পুনীষিত থাকিয়াও মৃত। অতএব ধার্মিক ও কুরিএবান মানবই যথার্থ সংসারী হইবার যোগ্য; চরিত্রই মানবের প্রকৃত অর্থ; এই অর্থ বিতরণ করিবার জন্য ভগবান অমাদিগকে পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্মের নিয়ম প্রণালী শিক্ষা দিয়া মর্ত্যধামে প্রেরণ করিয়াছেন।

গৃহীর সকল বিষয়েই নিয়ম পরতন্ত্র হওয়া উচিত। নির্দিষ্ট সময়ে আহার দান ও ব্যায়স-বাহির দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষার যত্নবান হইবেন; অতি ভোজন, রাজিভাগরণ এবং আলস্ত পরিভ্যাগ করা সর্বতোভাবে বিধেয়। পরনিন্দা, পরকুৎসার রত থাকা গৃহীব্যক্তির কর্তব্য নহে, তাহাতে মানসিক বলের হ্রাস ও ধর্মের হানি হইয়া থাকে। গৃহী ব্যক্তির বাস গৃহ সুসজ্জিত

এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। গৃহটী দেখিলেই যেন লক্ষ্যীয় গৃহ বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক গৃহীর গৃহে দেবোপাসনার জন্য এক একটা পবিত্র গৃহ বা ঠাকুরদালান থাকা আবশ্যক। কিন্তু আজকাল অনেকই সে প্রথা পরিত্যাগ করিতেছেন। আজ কাল সকলেই ইংরাজী ধরণে গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকেন, দেবগৃহ বা ঠাকুরদালান পরিবর্জন করিয়া এখন অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের মতে হিন্দুর পবিত্র গৃহ গৃহদেবতার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বর্জিত হইলে তাহা যেন যবনের গৃহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

সংসারী ব্যক্তি সর্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। সংসারীরই পক্ষে সংসারই তাহার ধর্মশিক্ষার আদর্শ স্থান; বাস্তবিক ধর্মের সংসার করিয়া সংসার পাতিতে পারিলে, সে সংসারে ভয়ের কোনও কারণ নাই; মৃত্যু তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে না। পাপীই মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে, যে সংসারী পুণ্যাত্মা-ধর্মই যাহার একমাত্র সহায়-সম্বল, তাহার মৃত্যু ভয় কোণার? সেত সকল সময়েই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, সেত অগ্নান বদনে সাহস পূরক বলিবে—

“যে অগ্নান কুসুমের মধুপান তরে,
নিয়ত লোলুপ মম মন মধুকর,
যে নিভা উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত
হে মৃত্যু তুমি তাহার শরণি শিষ্টর।

কোন রূপে অতিক্রম করিলে তোমার
সকল হইবে আশা যাইব তথার ।”

গৃহী ব্যক্তি এইরূপ ভাবে নির্লিপ্ত হইয়া
সংসার যাত্রা নির্বাহ করিবেন। সংসারে
সকল কাজ করিবেন পুত্র কল্যাণাদি প্রতি-
পালন করিবেন। মাছ ধরিবেন কিন্তু গাছ
যেন কর্দমাধীন না হয়, এইরূপ ভাবে মতি
যেন সেই চিদানন্দ চিৎস্বর ভগবানের প্রতি
হিরা থাকে? কারণ ইহা যে তাহার চিরস্থায়ী
বাসস্থান নহে। ইহা যেন মনোমধ্যে সতত
জাগরুক থাকে। যখন জগতে আসিতে হই-
রাছে, তখন একদিন না একদিন যাইতে
হইবে—মৃত্যু আসিয়া একদিন তাহাকে ভা-
খাম হইতে অনন্তধামে লইয়া যাইবে। সে
দিন নিকটবর্তী ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে
হইবে, কারণ সে দিনমনি মৃতের আগমন
অবশ্যজ্ঞাবি। কখন যে তাহার আবির্ভাব
হইবে—তাঁহা কে বলিতে পারে? এষ্টজন্ত
পূর্ব হইতেই তাহার প্রতীক্ষায় প্রস্তুত থাকা
দেহী মাজেরই কর্তব্য। মৃত্যু কেবল দেহত্যাগ
মাত্র; গীতার শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

বাসাংগী ধীর্গানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণাতি নয়োহপরাদি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্গা-

ন্তানি সংবাতি নবানি দেহী ॥

আমরা ইহজীবনে যেমন ধর্মচর্চা করিয়া
ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে

পারি। পরজীবনেও সেইরূপ আমরা তাহাকে
প্রাণের দেবতা জানিয়া তাহার পদে লীন
হইতে পারি। কারণ তথার একমাত্র ভগবান
ভিন্ন আর কেহ সংসার নাই। এক ভগবানের
চরণ ভবণী তিন্ন মৃত্যুকালে এই দুস্তর ভব-
জলধি উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য উপায় নাই।
মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে গৃহী ব্যক্তি যেন
ঈশ্বরের আদিষ্ট সমস্ত কার্যা সমাধা করিয়া,
সকল আত্মীয় স্বজনদের নিকট বিদায় লইয়া,
ভগবদেচ্ছায় ইহ জীবন ধর্মভাবে সম্পূর্ণ হইল
ভাবিয়া, তাহারই জয় গান করিতে করিতে
মহানন্দে মহাপ্রস্থান করিতে পারিলে
তাঁহার গার্হস্থ্য ধর্ম পতিপালন করা সার্থক
হইল। তিনিই যথার্থ ধর্মবীর বলিয়া পরি-
গণিত হইলেন এবং অন্তকালে তিনি যে সেই
ত্রিলোকের কর্তা, ভক্তবৎসল ভগবানের
পদ্মপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিতে পারিবেন,
তাঁহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

সম্পাদক ।

অতীতের স্মৃতি ।

ডিহিরি অন শোন ।

ডিহিরি ও তন্নিকটস্থ মনোরম দৃশ্যাবলীর
বিষয় শুনিয়া অবধি ডিহিরি দর্শনাশা বহুদি-
নাবধি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম।

দৈবাহুগুলো ১৯০৪ জাহুয়ারী মাসে ঐ স্থান
সমূহের সার্ভে করিতে আমাদের প্রতি আদেশ
হয়। ওয়া জাহুয়ারী বাঁকিপুর হইতে আমরা
ডিহিরি যাত্রা করি। বাঁকিপুর দিয়া ডিহিরি
যাইতে হইলে গয়া দিয়া যাইতে হয়। আমরা
বেলা ৮টার মধ্যে দক্ষিণহস্তের ব্যাপার শেষ
করিয়া ট্রেনে উপস্থিত হইলাম। হরি!
হরি! এখনো ট্রেন ছাড়িবার একঘণ্টা বিলম্ব।
জিনিস পত্র সমস্ত গুছাইয়া লইয়া একখানি
ইন্টারমিডিয়েট গাড়ি দখল করিয়া, আমরা
ট্রেন ছাড়িবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

১০কমাস তাঁবুতে বাস করিতে হইবে; স্ত-
ত্রি শীতের সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে লইতে
হইয়াছিল। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়িল। বাম্পীয়
অব স্ট্রামলক্লেজের মধ্য দিয়া গন্তব্য পথে
ছুটিগ। দেখিতে দেখিতে পুনপুন আসিয়া
উপস্থিত হইলাম। পুনপুন বাঁকিপুর হইতে
৮ মাইল। গয়াধামে গদাধরের ঐপাদপদ্মে
শিঙখানের পূর্বে পুনপুন নদীতে স্নান ও
তর্পনাদি করিতে হয়। যাত্রীদিগের সুবিধার
জন্য রেলওয়ে কোম্পানি এখানে ২৪ ঘণ্টা
অপেক্ষা করিবার সময় দিয়াছেন। বেলা ১২
টার সময় গয়া ট্রেনে গাড়ি থামিল। গাড়ি
কিছু দেরিতে আসিয়াছিল, আমাদের জন্ত
ডিহিরির গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে দেখিতে
পাইলাম। গয়া ট্রেনটি বেশ বড়। মোগল
সরাসি গয়া ও লক্ষ্মীসরাসি গয়া লাইনের ইহাই

জংসন। আমরা মোগলসরাসি লাইনের
গাড়িতে উঠিলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

বেলা ৩টার সময় বারুণ বা ডিহিরি ইষ্ট-
বাংক (Dehri East Bank) ট্রেনে
গাড়ি থামিল। এখান হইতে প্যালামো
যাওয়া যায়। প্যালামো ও ডালটনগঞ্জে
অনেকগুলি কয়লার খনি আছে। দ্বিধি
যাইতে হইলে এই পথদ্বিয়া যাইতে হয়।
বারুণ শোণনদের তীরে অবস্থিত, ইহা একটি
ক্ষুদ্র পল্লী। অপর পারে ডিহিরি, মধ্যে
সুদীর্ঘা রেলওয়ে পোল। এখানে শোণ নদের
প্রস্থ ২২ মাইল।

অনেকে বলেন স্কটলণ্ডের অন্তর্গত ডব্লি
সহরের টে পোল (Tay Bridge) পৃথিবীর
মধ্যে সর্কোপেক্ষা বৃহৎ এবং ডিহিরির শোণ
পোল (Sonc Bridge) দ্বিতীয়। কিন্তু
১৯০৩ সালে Progress এ চীন দেশের অন্ত-
র্গত সাঙ্গংয়ের (Sangong) নিকট পীত
সাগরের (Yellow Sea) উপর সিংহ পোল
(Lion Bridge) সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশ
হইয়াছিল, তাহাতে সিংহ পোলকেই পৃথিবীর
মধ্যে সর্কোপেক্ষা বৃহৎ বলিতে হয়। পাঠক ও
পাঠিকা বর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তিনটি
পোলেরই দৈর্ঘ্যতা দেওয়া গেল।

সিংহপোল (Lion Bridge) ২৭, ৭২০ ফিট।
টে পোল (Tay Bridge) ১০, ৫২৭ ফিট।
শোণপোল (Sonc Bridge) ১০, ০৫২ ফিট।

ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা অপেক্ষা বড় পোল
অন্যাপি নির্মিত হয় নাই। এই পোলটি
২০টি প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্মিত খামের উপর
নির্মিত। ইহা নির্মাণ করিতে ৩ বৎসর
লাগিয়াছিল। ১৯০৩ সালে কেক্সারি মাংসে
ইহা খোলা হয়। পোলের দৈর্ঘ্যতা ভিন্ন
দেখিবার আর কিছুই নাই। ইহা অপেক্ষা
কইলবারে শোনের উপর যে পোল আছে
তাহা দেখিতে অতি সুন্দর।

পোলের উপর হইতে আমাদের তাঁবু
কেলা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। গাড়ি
হইতে নামিয়াই একা করিয়া তাঁবুতে চলি-
লাম। এখানকার একার চড়িয়া ডি, এল
রায়ের ‘বেথোরে বেহারে’ একা চড়ার কথা
মনে পড়িল। এ একার চড়িলে প্রাণ ‘ছকা
পড়া’ করেই বটে!

তাঁবুতে আসিতে প্রায় অর্ধঘণ্টা অতি-
বাহিত হইল। শীতকালের বেলা, ধরনী দেবী
ধীরে ধীরে তিমিরাত্ম হইতে লাগিলেন।
কুখার পেটে ‘দাবানল’ জলিতেছিল। কুমুদিনি
প্রিয়তমের অভ্যর্থনার জন্য ক্লিপ বেষভূষায়
সজ্জিত হইতেছিলেন—তাহা দেখিবার অবকাশ
ছিল না। তৈজসপত্র কেনিরা বামনকে ‘চা’
তৈয়ার করিতে বলিলাম। চা পানান্তর সর্ব-
প্রথম সংহারিণি তামাকু দেবীর অর্চনায় মনো-
বোগ দিলাম। রাজ্যে আহারাদির কোনই কষ্ট
হইলনা, ‘চাল চিড়ে’ বাধিয়াই আনিয়াছিলাম।

প্রাতে উঠিয়াই পোল ও এনিকাট
(Annicut) দেখিতে বাহির হইলাম।
ইংরাজের বাহাহুরিতে শোননদের ছরাবহার
পরাকাষ্ঠা। এখানে শোনের প্রায় ২৫ মাইল
হইলেও নদের এপার হইতে অপর পার
অবধি প্রকাণ্ড বাধ বা এনিকাট দিয়া জল
বাধিয়া রাখা হইয়াছে। একদিকে কেবল
ধু ধু করিতেছে বালুকাময় প্রান্তর। গেটের
ছিদ্র দিয়া সামান্য জল যাহা নির্গত হইতেছে
তাহাই ক্ষুদ্র তটিনীর জায় বহিয়া যাইতেছে।
এনিকাটের অপর পার্শ্বে বেশ জল আছে।
এই স্থান হইতে নদের উত্তর পার্শ্ব দিয়া ২টি
কেনাল (Canal) দীর্ঘাঘাট ও আরো অতি-
মুখে চলিয়াছে। এই এনিকাটের যে সমস্ত
গেট আছে, তাহা খোলা ও বন্ধ করিবার অতি
সুন্দর বন্দবস্ত আছে। এত বৃহৎ বৃহৎ গেট
একটি কল টিপিলেই সশব্দে খুলিয়া যায় ও
বন্ধ হয়। ইহা ১৮৭৪ সালে নির্মিত হয়।

এখানকার সরকারি কারখানা দেখিবার
উপযোগী। কলে গোহা কাটা হইতেছে,
কাট চেরা হইতেছে, চালাই হইতেছে, সম-
স্তই কলে কাজ হইতেছে।

ডিহিরি হইতে ৬ মাইল দূরে খাড্ডার
পাহাড়ে Stone quarry দেখিতে একদিন
গিয়াছিলাম। ডিহিরি workshop হইতে
quarry অবধি ট্রলির (Trolley) গাইন
আছে। স্থানীয় ওতারশিয়ার বাবু আমাদের

২ খানি ট্রাক্স বন্দবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। Quarry হইতে ২ মাইল দূরে একটি জল প্রপাত (water fall) আছে। জুগারে সুউচ্চ পাহাড় মধ্যে জল প্রপাত। বর্ষার সময় এখানকার দৃশ্য বড়ই মনোরম। অল্প সময়ে সামান্য করনায় জায় জল উপর হইতে পড়িতে দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য এই জলে খেলা করিতেছে দেখিতে পাইলাম।

পাহাড়ে পাহাড়ে ২ মাইল আসিয়া বড়ই প্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পরিষ্কার স্থান পাইয়া এখানে বিশ্রাম করিতে বসিলাম। আমাদের মধ্যে একজন নিশ্চরতা ভঙ্গ করিয়া গান ধরিলেন।

“নীলাম্বর নীলানাথ সকলি তোমারি।

ভবলীলা বশে, উদাসীন বেশে,

অমি নাথ বনে বনে হয়ে ব্রহ্মচারী ॥

তুমি খাতা, তুমি পাতা, তুমিহে জগত পিতা,

তুমি বিশ্ব তরু আতা গর্ষ খর্ব্ব কারি ॥”

বন্ধুবরের গানে তন্ময় হইয়া নীলামবের বিচিত্র নীলা কাহিনীর কথা ভাবিতেছিলাম। এমন সময়ে কে বলিল ‘গা বেটা গা’ চাহিয়া দেখি এক সরাসী অদূরে এক শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া আছেন। সরাসীর প্রোঙ্গত মূর্তি দেখিয়া ভক্তিতে সকলে প্রণাম করিলাম। সরাসী আবার বলিলেন ‘গা বেটা গা’। বন্ধুবর আবার গান ধরিলেন।

“সুন্দর যদি রঞ্জম তুমি নন্দন কুলহার।

তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।

নীল অধর চুপনে নত চরণে ধরনী মুখ নিরত;

অকল ঘেরি সম্মুখিত যত গুঞ্জে শতবার।

কলকিছে শত ইন্দুকিরণ, পুঙ্কিছে কুলগন্ধ,

চরণ ভঞ্জে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ,

ছিঁড়ি মর্শ্বের শত বন্ধন ধায় তোমা পানে

যত কন্দন,

লও হৃদয়ের কুল চন্দন বন্দন উপহার।”

সরাসী আমাদের গকে তাঁহার কুটীরে অতিথী হইতে অনুমোদন করিলেন। কিন্তু আমাদের সেই দিনই না ফিরিলে নয় সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তাঁবুতে ফিরিলাম। তাঁবুতে আসিতে রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল।

ডিহিরি হইতে ১৩ মাইল পশ্চিমে সরাসী Sasaram এ হুমায়ন বিজয়ী দিল্লির বাদশাহ সের সাহের সমাধি মন্দির আছে। এই সমাধি মন্দির বাদশাহ তাঁহার জীবিত কালে নির্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরটি একটি পুষ্করীর মধ্যস্থানে প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। ইহার মধ্যে একটি বৃক্সা ফুলান আছে। ইহার নির্মাণ কৌশল এত সুন্দর যে প্রত্যেক দ্বার হইতে বিভিন্ন রকম দেখা যায়। মধ্য স্থানে সের সাহের সমাধি ও পার্শ্বে তাঁহার বেগম দিগের সমাধি। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার সমাধি হয়। ১৮৮২ খৃঃ

অৰ্ধে বঙ্গের লাটু রিপন সাহেব ইহার মেরামত করাইয়া দিয়া তাঁহার মন্দিরের সন্মান রক্ষা করিয়াছেন। সমাধি মন্দিরের অনতিদূরে তাঁহার প্রাসাদ অতীতের স্মৃতি স্বরূপ বিদ্যমান আছে। এই প্রাসাদ হইতে পুষ্করী অবধি একটি সড়ক ছিল। বেগম সাহেবরা এই পথে স্নান করিতে আসিতেন। সের সাহের অক্ষয় কীর্ত্তি গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড (Grand Trank Road) ডিহিরির মধ্য দিয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে।

ডিহিরি হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণে সূর্য্য-বংশ কুলতিলক মহাবীর কুশের নির্মিত রোহিতাসগড়। (Rohtas) অনেকে বলেন মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাস হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। ডিহিরি হইতে গো শকটে যাইতে হয়, তাড়া ৩ টাকা। আমরা একদিন সন্ধ্যা ৬টার সময় আহালাদি করিয়া গো শকটে রোহিতাসগড় গিয়া ছিলাম। পথ বড়ই দুর্গম। দু-ধারে কেবল দু-দু-করিতেছে মাঠ, মধ্যে মধ্যে জঙ্গল। এই সব স্থানে ব্যাঘ্রের বড়ই উপদ্রব। শুনিয়াছিলাম গাড়ির পশ্চাতে পশ্চাতে লাফাইতে লাফাইতে বাঘ আসে। জ্যোৎস্না রাত্রি, গাড়িতে বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। মনে ভয় আছে, ব্যাঘ্রের সাম্নে না পড়ি। অতি প্রত্যায়ে আকবরপুরে আসিয়া আমরা গাড়ি হইতে নামিলাম। এখান হইতে আমরা

দিগকে পাহাড়ে উঠিতে হইবে। উপরে খাবার পাওয়া যায় না, স্তব্রাং খাবার সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। স্ন-উচ্চ পাহাড় খাড়াই উঠিতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। পৌষ মাস তথাপি দর দর ধায়ে ঘাম পড়িয়া জামা ভিজিয়া গেল। একটুদূর উঠিয়াই বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলাম। এইরূপ ২৩ বার পথে বিশ্রাম করিয়া উপরে উঠিলাম। এইখানেই গড়ের সীমা আরম্ভ। প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। কালের করাল কবলে দুর্গ-প্রাচীর লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রায় একমাইল সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া সৈন্ত নিবাস দেখিতে পাইলাম। সৈন্ত নিবাসের অদূরেই সের সাহের প্রাসাদ। এত দিনের প্রাসাদ কিন্তু এখনও বেশ রহিয়াছে। সমস্তই পাথরের তৈয়ারী। এখানকার পাথরের খিলান দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এখান হইতে সানারাম অবধি এক সড়ক ছিল। সেরসাহ এই সড়ক খনন করাইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। সড়কের ভগ্নাবশেষ অস্ত্রাঙ্গি বিস্তারিত আছে।

পাহাড়ের উপর এক স্তূপহং পুষ্করী দেখিলাম। সংস্কারাভাবে ইহাতে সকল সময় জল থাকে না। যে সামান্য জল আছে, তাহা শৈবালে পরিপূর্ণ। পাহাড়িয়ারা ইহার নিকটে মহিষ চরাইতেছে। প্রত্যেক মহিষের গণ্ডায় এক এক প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাধা। ইহার কারণ

অল্পসঙ্কানে ও নিলাম, পাছে সকলে হারাইয়া যায়, এই অল্প বস্তু বাঁধা আছে। এখানে বাঘের উপজীব খুব আছে। দিবাভাগেও বাঘ দেখা যায়। এখানে বাসীরা সকল সময় এক-খানি ক্ষুদ্র কুড়ালি সঙ্গে রাখে। কুড়ালি লইয়া বাঘ ভাড়াইয়া থাকে। গড়ের সীমা প্রায় ১২ মাইল, ক্ষুদ্র শোননদ সর্পের দ্বারা বক্রভাবে তারিরাখীর উদ্দেশে চলিয়াছে। এখান হইতে নিম্নের শোভা বড়ই মনোহর।

রোহিৎসাগড় আসিবার পথে শিলোটিয়া গ্রামে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের দেওয়ানের শিখা-লয় আছে। সমস্ত দিন গড়ে অবস্থান করিয়া সন্ধ্যার সময় নীচে নামিয়া। আহা রুদি করিয়া গাতি ছাড়া হইল। অতি প্রত্যয়ে ডিহিরি করিয়া আসিলাম।

ডিহিরির জল বায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। অনেক এখানে বায়ু পরিবর্তনের, অল্প আসিয়া থাকেন। শোননদের তীরেই ৫৬ খানি বাজালা আছে। ভাড়া পাওয়া যায়। এখানে বাজালির সংখ্যা বড় বেশী নয়। টেশনের নিকট পলিতে জনকয়েক বাজালি বাস করেন। ডিহিরি বাজারেও জনকয়েক আছেন। রেলওয়ে ও কারখানার ইহার কল্ল করেন। ডিহিরি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইলেও এখানকার বাজারে মাছ, মাংস, তরিতরকারি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে হরিণ শাবক ১৫, ২০ টাকার পাওয়া যায়।

অনেক সাহেব এখানে শিকার করিতে আসেন। শোননদে প্রচুর চক্রবাক দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে দীঘারে আরা বাওয়া যায়। কেনাল দিয়া বাইতে হয়। এখানে একটি রেলওয়ে ও একটি সরকারি হাসপাতাল (Hospital) আছে। এখানকার রেলওয়ে রুবের সহিত আমরা মধ্যে মধ্যে ফুটবল ম্যাচ খেলিতাম। এখানকার প্রধান অভাব স্থূল। স্থানীয় বাবুয়া মনোবোগ করিয়া একটি স্থূল স্থাপিত করিলে সাধারণের সুবিধা হয়।

শ্রীমুখেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

উবা। মাসিকপত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। ইহা দেখিয়া জানা গেল যে পত্রিকা-খানি দুই বৎসর চলিতেছে এবং নড়ালের জমীদার বংশের তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত হইতেছে। কাগজ ও ছাপা ভাল। প্রবন্ধগুলি আরও একটু ভাল হইলে হইত ভাল।

বহুনা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পত্রিকাখানি বেশ চলিতেছে, জ্যৈষ্ঠের বহুনার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বহুনা “নটবর” নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৪ দিন হইল আমরা এরূপ কবিতা পাঠ করি নাই। ইহাতে পূর্ণবাহুর পূর্ণজতির প্রকাশ পাইয়াছে। অল্প কবিতার অংশ কিছু বাচ দিলে ভাল হয়। বৈশাখের বহুনা মোটের উপর মন্দ হয় নাই। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার এক পূর্ণ-বাহুর কবিতা ভিন্ন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ দেখিলাম না।

আলোচনা।

“মস্তকের সাধন কিম্বা শরীর পতন।”

নবম বর্ষ। } জীবন, সন ১৩১২। } চতুর্থ সংখ্যা।

সম্রাট হুমায়ুন

(১)

সম্রাট হুমায়ুনের এক ভ্রাতার নাম ছিল—জোহর। সম্রাটের পানীর ও স্নানীর সর্ব-প্রকার প্রয়োজনের জল তাহাকে যোগাইতে হইত। এই কার্য-বাগদেশে জোহর সর্বদাই সম্রাটের সঙ্গে থাকিত এবং সম্রাটের মৃত্যুর পরও অনেকদিন জীবিত ছিল।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুন পরলোক গমন করেন, ইহার ত্রিশ বৎসর পর জোহর ‘ভেজকিরাত উল-ভকিরাত’ নাম দিয়া পারস্ত ভাষায় সম্রাটের রাজত্বকালের এক ইতিহাস প্রকাশিত করেন। অনেকানেক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক এই গ্রন্থের ভুলসমী প্রমাণ করিয়াছেন। প্রায় ৬০ বৎসর হইল, ঐতিহাসিক হুর্টার্ট এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রচার করেন। উক্ত পুস্তক অবলম্বনেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

হিন্দুস্থানের সম্রাট হুমায়ুনের পিতার নাম বাবর, পিতামহের নাম ওমার সেফ, প্রপিতা-

মহের নাম আবু সৈয়দ, বৃদ্ধ পুত্রপিতামহের নাম মহম্মদ মীর্জা, তত্ত পিতার নাম মিরণ হোসেন এবং তাঁহার পিতার নাম তাইমুর।

হুমায়ুনের পুত্রের নাম সম্রাট আকবর এবং আকবরের পুত্র ও ওয়ারিশগণের নাম বর্ণনাক্রমে—জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আলম-গীর আরজঙ্গীব, বাহাদুর শাহ, শেরশাহ, মোহম্মদ, আহম্মদ, আলমগীর দ্বিতীয়, শাহ আলম, আকবর দ্বিতীয়।

১১৩ হিজরীতে (১৫০৮ খৃষ্টাব্দ) হুমায়ুন কবুলে ভূমিষ্ঠ হন। ঐ বৎসরেই তাঁহার পিতা বাৎশাহা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা কামরান, তৃতীয় ভ্রাতা হিজল এবং চতুর্থ ভ্রাতার নাম আসকারি। ইহার সকলেই মীর্জা (গুবারাজ) উপাধি স্ব স্ব নামের সহিত ব্যবহার করিতেন। *

* মুসলমানদিগের প্রত্যেক নামের অর্থ আছে। হুমায়ুন অর্থ স্তম্ভ, কামরান অর্থ ভয়ঙ্কর, হিজল—ভারতীয়, আসকারি—শিবিরে সম্ভ্রান্ত। অনেকে আসকারিকে আরজ সন্তান বলিয়া মনে করেন।

১৩২ হিজরীতে (১৫২৫ খৃঃ অব্দঃ) বাবর যখন হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার সৈন্ত-বাহুর দক্ষিণ ভাগ পরিচালনের ভার হমায়নের প্রতি অর্পিত হয়। হমায়ন সর্ব প্রথম আফগানদিগের বিরুদ্ধে সমর-যাত্রা করেন। পাণিপাতের যুদ্ধের পর তিনি আগরানগরী দখল ও জুলতান ইব্রাহিমের ধন-ভাণ্ডার হস্তগত করিতে প্রেরিত হন। ভাগীরথীর পূর্ব-প্রদেশস্থিত ভূস্বামীপণের সম্মিলিত সৈন্তের গতিরোধার্থে যে সম্রাটসেনা নিযুক্ত হয়, হমায়ন তাহার অধিনায়ক ছিলেন। এই সকল যুদ্ধেই তিনি সিদ্ধকাম হওয়ার পিতা কর্তৃক ১ কোটি ৭০ লক্ষ দাম (১) পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি আগরার আসবাব সহ একটি প্রাসাদও পাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি জোয়ানপুর নগর অধিকার করতঃ বিমানার সন্নিকট হিন্দু রাজাদিগের সহিত যে লোনহর্ষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই আহবে ও হমায়ন মোগল-সৈন্তের সহিত যোগদান করেন। এই যুদ্ধেও তিনি প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন।

যদিও ভারতবর্ষে তাইমুরের সাম্রাজ্যকে মোগল সাম্রাজ্য বলে, কিন্তু তৎপরিবারের ব্যক্তিগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাহার প্রথামতঃ 'জাগ্তারী তুর্কি' ইহারা মোগল

অথবা তাতার অপেক্ষা উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু তাহাদিগকে কন্ঠান্টিনেপোলের তুর্কী হইতে বিভিন্ন রাথবার জন্ত এই প্রস্তাবে তাহাদিগকে মোগল আখ্যাত্যেই অভিহিত করা হইবে।

পূর্বোক্ত বিবরণটুকু জোহর লিপিবদ্ধ করেন নাই, তিনি হমায়নের সিংহাসন আরোহণের সময় হইতে ঘটনাবলী বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণের বোধ সৌকার্য্যার্থে আমরা অতি সংক্ষেপে এই পূর্ব কথাগুলি বলিয়া লইলাম।

সম্রাট হমায়নের সিংহাসন আরোহণের পর প্রথম ঘটনা,—সাম্রাজ্যের পূর্ববিভাগে বিন্ ও বইজিদ, আফগান ও মোহম্মদ গোদীর বিদ্রোহ। এই সকল বিদ্রোহ-বন্ধি নির্মাণ করিতে সম্রাট কালিঙ্গার হইতে জোয়ানপুর অভিমুখে সৈন্ত পরিচালন করিলেন। গুন্ডীনদীর তীরে তাঁহার শিবির স্থাপিত হয়, তথায় ১৩৮ হিজরীতে বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। বিজয়লাভের পর সম্রাট, প্রসিদ্ধ শের খাঁর পুত্র জেলাল খাঁর অধিকৃত চুগার দুর্গাভিমুখে সটৈসন্ত অগ্রসর হইলেন। চারিমাস অবরোধের পর জেলালখাঁ আত্ম সমর্পণ করিলে উত্তরের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এই সন্ধিমূলে শেরের দ্বিতীয় পুত্র আবদুল রশিদ তাঁহার অধীন আফগান সৈন্ত সহ সম্রাটসেনার সহিত

যোগদান করেন। অতঃপর তাঁহারা মোগল রাজধানী আগরা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।*

(২)

মোগল সেনা গুজরাট যাইবার পথে চেতুর (Chetur) দুর্গের নিকট পৌছিলে, সম্রাট গুজাটের সুলতান বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি পত্র পান। সুলতান তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, তিনিই কাকেরদিগকে (Infidels) পরাভূত করতঃ মুসলমান ধর্মের কিরণ-রশ্মি উজ্জ্বল করিবার আশায় চেতুর অবরোধ করিয়াছেন। সুতরাং সম্রাট যেন ইহাতে এখন হস্তক্ষেপ না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

সম্রাট স্বধর্মের অমুরাগ বশতঃ উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন, এবং দুর্গ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত সৈন্য তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর সুলতান বাহাদুর স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে, বাহাদুর জেলার অধীন মারে নামক একটা ক্ষুদ্র পল্লীর অভিমুখে সম্রাট অগ্রসর হইলেন।

* See History of Bengal, Page 138.

‘নেসার-উদ্দীন’ হুমায়ুনের উপাধি।
মেরের উদ্দীন ও নেসার উদ্দীন প্রকাশ-
বাচক,—ধর্মের রক্ষক। প্রত্যেক মুসলমানই
মোহম্মদ উপনাম গ্রহণ করিতে পারে।

এখানে সুলতান বাহাদুরের সেনা তাঁহার গতিরোধ করে। সম্রাট কি ভাবে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাহা সর্দারগণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা প্রত্যেকেই সাধ্যানুসারে লড়িবেন, এমন অভিমত প্রকাশ করিলেন। অতঃপর সম্রাট শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিতে ও তাহাদের রসদ প্রত্যা-
সংগ্রহের পন্থা বোধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই আদেশানুসারে কতিপয় মোগল-সরদার কার্যক্ষেত্রে অকর্তীর্ণ হইলেন এবং শত্রু-শিবিরে যাহাতে কোনপ্রকার খাদ্য-শস্ত্র প্রবেশ না করে, তাহার প্রতিবিধান কল্পে ‘কদাক’ স্বরূপ কার্য করিতে আদিষ্ট হই-
লেন। এইভাবে প্রায় তিন মাস যুদ্ধ চলিলে, শত্রুদিগের খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষ হইল, তাহারা উননের আগার অখ-মাংস খাইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের এই দুঃসময়েও সম্রাট-সৈন্য প্রতাহ খণ্ডযুদ্ধে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিত।

একদা রজনীতে শত্রু শিবির হইতে ভয়ানক গোলযোগ কোলাহল উখিত হইল। ইহার অন্তরকাল পরেই প্রধান ইঞ্জিনিয়ার আলা কুলী-সম্রাটের তাহুর ঘারে উপস্থিত হইল, সম্রাট তাহাকে গোলযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুলী বলিলেন যে, তিনি অসুস্থ হইলেন, শত্রু-সৈন্য পলায়ন করি-
তেছে, তাহাদের অস্ত্রাগারের ‘অধিনায়ক

রুমী খাঁ 'জিলি' এবং 'মুজেনান' নামক দুইটি বৃহৎ কামান কাটাইয়া কেলিয়াছেন। এই কথোপকথনের সময় শত্রু-শিবির হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল যে, সুলতান বাহাদুর তাহার সেনা লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। সম্রাট সর্বশক্তিমানকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন। পরে সম্রাট অস্বারোহণে সুলতানের অহুসরণ করিলেন, পশ্চিমধ্যে রুমী খাঁ তাঁহার সহিত যোগ দিয়া বলেন যে, তিনি বিপক্ষ পক্ষ ত্যাগ করিয়া সম্রাটের অধীনে কার্য্য করিতে আসিয়াছে।

সংবাদ আসিল সুলতান মালোয়া প্রদেশের মাল্ডু দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন। বিজয়-কৃপা যোগল সেনা তথায় আগ্রসর হইয়া দুর্গ অবরোধ করিল। কিয়দ্বিগু অন্তর সুলতান মাল্ডু দুর্গ হইতে পুনরায় পলায়ন করিয়া চাম্পানীয়ারের অরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে যোগল-সেনা মাল্ডু দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় বহুতর ধন রত্নাদি পাইল। সম্রাট তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বিপুল আগ্রহের সহিত সুলতানের অহুসরণ করিয়া গুজরাটের রাজধানী চাম্পানীয়ে উপস্থিত হইলেন এবং অচিরেই দুর্গ অবরোধ করিয়া বলিলেন। * এই অবরোধ

সময়ে একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া গোপনে সম্রাটকে জানাইল যে, সে একটা পর্ব্বতের শিখর দিয়া একটা সহজ পথ দেখাইয়া দিতে পারে। আগন্তকের কথার বিশ্বাস করিয়া সম্রাট গোপনে কেবলমাত্র দুইজন রণবাদ্য-কর, কয়েকজন তুরী নিনাদকারী ও একদল সাহসী বোঝা লইয়া শিবির ত্যাগ করিলেন এবং অতি কষ্টে একটা পার্ব্বতীর বজুর পথ অতিক্রম করিয়া দুর্গে প্রবেশলাভে সক্ষম হইলেন। সম্রাট অতঃপর রণবাদ্য বাজাইতে ও তুরী-নিনাদ করিতে আদেশ করিলেন এবং সরদারগণ একত্রে চারিধার হইতে বিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। অসতর্কিত বিপক্ষ সৈন্য এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া, পরিত্রাণের উপায় দেখিতে লাগিল, কয়েকটি বিপক্ষদল দুর্গ হইতে পলায়ন করিল, সুলতান বাহাদুরও ক্যাম্বের অভিযুখে ধাবিত হইলেন। এব-শ্রকারে সম্রাট এই প্রসিদ্ধ নগর উহার সমুদয় রসদাদি সহ বাধিকারে আনয়ন করিলেন কিন্তু বহু অহুসকালেও কোন ধনরত্ন পাইলেন না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পর ষাণ্মখী নামক সুলতান বাহাদুরের একজন প্রধান কর্মচারী সম্রাট সদনে আসিয়া কুশি করিলেন। ঐ নগরের ধনরত্নাদি কোথায় লুকাইত আছে তাহা বাহর করিয়া দিবার জন্য, সম্রাটাহুচঃগণ আগন্তককে বন্দী ও বাতনা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল কিন্তু

* See dow's History of Hindustan, Vol II, Page 144, and also Edinburgh Gazetteer,

সম্রাট বলিলেন,—“এই ব্যক্তি স্বইচ্ছায় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, এখন তাহার উপর বল প্রয়োগ করা অসাধুতার পরিচায়ক । যদি নব্র ব্যবহারে কার্য্য উদ্ধার হয় তবে রুঢ় ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি ? তোমরা একটি প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন কর এবং তাহাকে মদ্য দ্বারা একবারে সংজ্ঞাহীন কর । তৎপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও এনগরের ধনরত্ন কোথায় আছে ?”

সম্রাটের আদেশানুযায়ী একটি ভোজের আয়োজন হইল, সেই দিবস আলমর্গাকে অতিরিক্ত মদ্য পান করাইয়া মত্ত করিয়া অতুলচরিত্র ধনরত্নের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল । আলমর্গা মোগলের এই সাদর সমাদরে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিল, উক্ত প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসিত হইবার মাত্র তিনি বলিলেন, সম্রাট যদি স্থলতানের ধনরত্ন লইতে ইচ্ছা করেন, তবে গোসলখানার জলরাশি অপভারিত করা হোক । এই সংবাদ সম্রাটকে জ্ঞাপন করা হইলে, তিনি তদনুযায়ী কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন । অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালিত হইতে চলিল, যখন মোগল ভৃত্য সকল ঐ কার্য্যে নিযুক্ত, আলমর্গা তৎকালে তথায় বাইরা বলিল যে, এভাবে কার্য্য করিলে পাওয়া বাইবে না । তিনি ভৃত্যদিগকে দ্বানের দ্বানের দ্বিগুন খনন করিতে উপদেশ

দিলেন, তাহাতে একটি পরঃপ্রাণী ও একটি মুখ আচ্ছাদিত গর্ভ প্রকাশিত হইল । গর্ভের আচ্ছাদন উন্মোচন করতঃ জলরাশি নির্গত করিলে প্রচুর পরিমাণে ধনরাশি বাহির হইল । ঐ ধনরত্ন তৎক্ষণাৎ মোগল সেনাগণের মধ্যে বিতরিত হইল, এতদ্ব্যতীত বহু পদ মর্যাদা অতুলক ধন প্রাপ্ত হইল । তাহার তৎপর স্বর্ণ ও রৌপ্য পূর্ণ একটি কুপ আবিষ্কার করিল । ঐ খাজুর গলাইরা Ignorant হইয়াছিল, স্মৃতিশূন্য তাহা সৈন্তগণ স্পষ্ট করিলেন ।

সম্রাট তৎপর তাড়িবেগকে চাম্পানীরেস্ত্র অধিনায়ক করিয়া স্থলতান বাহাদুরের অঙ্গুলরণে ক্যাথে অভিমুখে যাত্রা করিলেন । কিন্তু তাহার মন্ত্রীগণ ছিল না করিয়া তাহাকে বলিলেন যে, এই অভিযোগের বাহা উদ্দেশ্য অর্থাৎ স্থলতান বাহাদুরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করা, তাহা ভগবানের কৃপায় সম্রাটের সিদ্ধ হইয়াছে এবং প্রভূত ধনরত্নও হস্তগত হইয়াছে । এখন সৈন্তগণকে দুই এক বৎসরের অগ্রিম মাহিমানা দিয়া অবশিষ্ট টাকা ভবিষ্যতের প্রয়োজনের নিমিত্ত আয়ত্ত মত রাখা এবং স্থলতান বাহাদুরকে আপনার এতিনিধি স্বরূপ গুজরাট প্রদেশের শাসন কর্ত্তা পদে নিযুক্ত করা যুক্তি সম্মত বিবেচনা করি । ইহাতে সম্রাটের সন্মানরতা প্রকাশিত হইবে ও বশঃ সৌরভের পোষক বর্ধিত

হইবে। এতদ্ব্যতীত সম্রাটের নিজের রাজ্যের অপর অংশের প্রতি বিশেষতঃ রাজধানী আগরার সুবাবহা করার অবসর হইবে। কারণ তথা হইতে অন্তত সংবাদ আসিয়াছে যে, মোহাম্মদ জেমান সুলতান এবং আরো কতিপয় প্রধান প্রধান সরদার বিদ্রোহভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ অবাচিত উপদেশ প্রবণে সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—“তরবারীর সাহায্যে এই সুলাবান প্রদেশ পদানত করিয়া কি খালি খালি ছাড়িয়া দিব? না, আমি ইহা রক্ষা করিব এবং দিল্লী সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিব।”

মন্ত্রীগণ যখন দেখিলেন যে, সম্রাট অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদের পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না, তখন তাঁহারা সুবরাজ আসকারীকে (হমারনের ভ্রাতা) তাঁহার অধীনস্থ সৈন্ত লইয়া চলিয়া যাইতে এবং দিল্লী প্রদেশ আক্রমণ করিবার অভিসন্ধি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। আসকারী তাঁহাদের পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন। এই সময়ে সুবরাজ যোজগার নাসির গোপনে চম্পানীরের শাসনকর্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যক্ত করিলেন যে, সম্রাট তাঁহাকে দুর্গের ও রাজ-কোষের ভার লইতে প্রেরণ করিয়াছেন। তাড়িবেগ তাঁহার প্রত্যবে সম্মত না হইয়া, সম্রাটের নিকট খটনা লিখিয়া পাঠাইয়া আদেশ প্রার্থনা করেন। সম্রাট তৎ-

ক্ষণাৎ আদেশ করেন যে, দুর্গ ও ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ তুমিই করিবে। কিন্তু সম্রাট যখন বুঝিতে পারিলেন যে, মন্ত্রীগণই সুবরাজ ও সরদার গণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে, এবং নানাহানে সৈন্ত পাঠাইয়া তাঁহার বলক্ষয় করিতেছে, তখন তিনি সৈন্ত-গণকে একত্রিত হইবার আদেশ দিয়া আহান্দাবাদ (১) অভিযুক্ত অগ্রসর হইলেন। পশ্চিমধ্যে তিনি নানারকম বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি স্বস্থ শরীরে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সম্রাট আগরার প্রত্যাগমন করিলে সুলতান বাহাদুর সুরাটের পর্তুগীজদিগের সহিত এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, এবং তাহাদেরই সাহায্যে ৬০০০ হাজার আবিসিনিয়ান ও নিগ্রো সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া আহান্দাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

হমারনের গুজরাজ অভিযানের মধ্যে যে বিদ্রোহীতা প্রকাশ পায়, তাহারই বিবরণ এখন লিপিবদ্ধ করিতেছি। সম্রাট যে সময় গুজরাট পদানত করিতে ব্যস্ত, মোহাম্মদ জেমান সুলতান (তাইমুরের বংশধর (২))

(১) এখন গুজরাটের রাজধানী; ১৭৮০ ইংরাজ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

(২) সুরাটের প্রসিদ্ধ সুলতান হোসেনের পুত্র। See Catalogue of Tipoo's Library.

ও ভূতপূর্ব সম্রাটের প্রিয় পাত্র) সম্রাটের অবর্তমানে সুযোগ বুঝিয়া, ভাগীরথীর উত্তর পূর্বের প্রদেশ সমূহ অধিকার এবং বেলগ্রানে নিজ আবাস নির্দিষ্ট করেন। তাঁহার পুত্র আলেকসান্দ্রী একদল শক্তিশালী সৈন্ত লইয়া জোয়ানপুর কুরা এবং মানিকপুর প্রদেশ আক্রমণ করিতে প্রেরিত হন। আগরার প্রতিনিধি শাসনকর্তা সম্রাটের কনিষ্ঠ সহোদর যুবরাজ হিজর এই সংবাদ জ্ঞাত হইবা মাত্র সৈন্ত কনোজ (Canowge) অভিযুগে যাত্রা করিলেন। সুলতান মোহম্মদও তাঁহার সেনাদল একত্রিত করিল, গঙ্গার উত্তর তীরে মোগল সেনার প্রতিধ্বনীতা করিবার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। উভয় পক্ষের সেনা দল এই স্থানে অনেকদিন অবতান করে। হিন্দলের চর কনোজের দশ মাইল উপরে গঙ্গার এক স্থানে অন্ন জল দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলে যুবরাজ বিপক্ষের অলক্ষ্যে রজনীযোগে সৈন্ত সামন্ত লইয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইলেন।

রজনী প্রভাত হইলে উভয়পক্ষ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল : কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে উত্তর পশ্চিম হইতে ভয়ানক ঝটিকা উত্থিত হইয়া ধূলিপটলে আকাশ মার্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, দিবাভাগে এমনি অন্ধকার হইল যে বিদ্রোহীগণ শত্রু ও মিত্র সহসা চিনিতে অক্ষম হইল। এমতাবস্থায়

তাহারা জোয়ানপুর অভিযুগে পলায়ন করাইল। যুবরাজ হিন্দল বেগজাম দখল করিয়া, বিপক্ষের অমুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া অবোধার সন্নিকট আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু উভয় পক্ষই প্রবল হওয়ার, খণ্ড যুদ্ধ অনেকদিন অতিবাহিত হয়। অবশেষে মোহম্মদ সুলতান যখন শুনিলেন যে, সম্রাট সুস্থ শরীরে এবং নিরাপদে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি আর বেশীদিন যুদ্ধ করিতে আশঙ্কা করিয়া, সপরিবারে বঙ্গদেশের নিকটবর্তী কুচবিহার প্রদেশে পলায়ন করিলেন। যুবরাজ হিন্দল জোয়ানপুরে অগ্রসর হইয়া তৎপ্রদেশ অধিকার করিলেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীব্রহ্মসুন্দর মায়ালাল।

• আসিবে বলিয়া।

তুমি আসিবে বলিয়া ছে।

আমি তারকা কুড়ারে মাগিকা গেঁথেছি,
নবীন নীরদ ধরে শূভতা স্বেচ্ছাছি ;

আমি কুড়ারে রেখেছি ছে।

চাঁদিমা হরিরে দাঁদি চাঁদেরে গেঁথেছি,
মারুত কণর কত নিশাস ফেলেছি ;

তুমি আসিবে বলিয়া ছে।

বেথানেতে যত বা কিছু স্নানর হেরি,
লাল নীল আভা কিবা মনোহর মরি ;

সব কুড়ারে রেখেছি ছে।

তুমি আঙ্গিকে আসিবে আগে বলেছিলে,
 ভাই ধরিরে-রেখেছি বসন্ত অনিলে ;
 তুমি আসিবে বলিয়া হে ।
 লীলাধর করে নিজ অধর রচেছি,
 বিহগের গীত শুনে আপনি গেরেছি ;
 শুধু তোমার তরেতে হে ।
 কুসুম সুবাস করে সুবাস মেখেছি,
 শশধর হাসি করে অধরে রেখেছি ;
 তুমি দেখিবে বলিয়া হে ।
 ঐজিতেজনাথ বিনোদ্যাপাধ্যায় ।

বর্ষায় ।

(কবি ও কবি-প্রিয়)

কবি । প্রিয়ে, হের কি সুন্দর, নব-জলধরে
 বিজলী-তরঙ্গ ভঙ্গ ।
 ক-প্রি । ওমা ! যেঘ দেখে বেগো,
 ভরেতে আমার
 শিহরি উঠিছে অঙ্গ !
 কবি । হের, খেলিছে ছ'জনে,
 সোহাগে কেমন
 পবিত্র প্রেমের তরে ;
 ক-প্রি । ওই আসিতেছে বৃষ্টি,
 তিজিয়া মরিব,
 এই বেলা চল ঘরে ।
 কবি । হায়, পিপাসীতাক,
 আসি বে তোমার,
 তুমি বন কাদম্বিনী,

ক-প্রি । কেন, মাস তারা জল,
 ছিল বে শিররে,
 ঘুম হ'তে উঠে খাওনি ?
 কবি । হায়, আকস্ম-ভূষিত হৃদয় আমার,
 কর প্রেম সুখ দান,
 ক-প্রি । ওই পিঁড়ি দিয়ে ঢাকা,
 রয়েছে ওখানে,—
 করে এস জলপান !
 কবি । এস, হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রেম-আলিঙ্গনে,
 জুড়াই হৃদয় খানি,
 (হস্ত ধারণ)
 ক-প্রি । র'রো, জলপ'ড়ে বুঝি,
 ভিজিতেছে খোকা,—
 বিছানা সুরারে আনি ।
 কবি । যাক্ দূর হক্ মেনে,
 হতভাগ্য খোকা,
 ব'ধা দিতে চাহে প্রেমে,
 ক-প্রি । ছাড়, খোকা যে আমার,
 তিজিে সারা হ'ল,—
 কেঁদে কেঁদে গেছে যেমে !
 কবি । হায়, দিক্ বঙ্গনারী,—
 আব অশিক্ষিতা,—
 ধারেনা প্রেমের ধার,
 (হস্ত ত্যাগ ।)
 ক-প্রি । ওগো, তোমাদের মত,
 কেশিতাম যদি,
 সবি হত ছারখার ।
 ঐ অটলবিহারী দাস ।

গুরু ও গুরু-বাক্য ।

“গুরু” শব্দের প্রাণী বাচক ব্যুৎপত্ত্যর্থ;—
 জৈশ্বর বা শ্রেষ্ঠবাচক। অল্পজ;—ভারি বা
 কঠিন পদার্থকে “গুরু” বলে। যিনি;—
 স্থিতি-স্থিতি বিন্যাসের কর্তা (পরমেশ্বর);
 তিনি সকলেরই গুরু। তিনি ব্যতীত;—
 নিজাপেক্ষা বলবান, জ্ঞানবান, ধনবান ও
 সম্পত্তিশালী অথবা সে কোন বিষয়ে অধিক
 ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে এবং কঠিন, কোমল,
 স্থলর, ভারি, মূল্যবান ও আয়তন বিশিষ্ট
 পদার্থকে “গুরু” শব্দে অভিহিত করা যায়।
 স্তরাত মজুর হইতে রাজরাজেশ্বর পর্যন্ত
 এবং কীট পতঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠতম প্রাণি-সমাজ
 পর্যন্ত অথবা সামান্য তৃণ-শুষ্ক হইতে বৃক্ষ
 পর্বত-দেহ ও বনস্পতি পর্যন্ত এবং ক্ষুদ্রাদপি
 ক্ষুদ্র বালুকা-রেণু হইতে বিরাট আয়তন
 বিশিষ্ট অগ্ন্যগ্নহ-নক্ষত্র সমন্বিত, মানবীর
 ধারণার অতীত অসীম সৌর-জগৎ পর্যন্ত;
 কাহারও কোথারও গুরুর অভাব থাকিতেছে
 না। গুরু, সর্বত্র সর্বদেহে অবস্থিত। তিনি;
 —বিপদে সকলের সাহায্যকারী; সম্পদে—
 সহায়ভূতিকাঁরক। তাই প্রাচীন আৰ্য্য ধর্মিগণ
 অবনমিত মস্তকে গাহিয়াছেন;—

“অথগু মন্তুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ।

ভৎপদং দর্শিতং যেন, তন্মৈ ত্রীশ্বরবেনমঃ ॥”

আবার গাহিয়াছেন;—

“অজান ভিমিরাক্ত জ্ঞানাজন শগাকরা ।

চক্ষুরুদ্রীলিতং যেন তন্মৈ ত্রীশ্বরবেনমঃ ॥”

শাস্ত্রে লিখিত আছে; মহাশা-সমাজে পাঁচ
 ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। যথা;—

“অন্নদাতা ভরদাতা যন্ত কত্তা বিবাহিতা ।

জনিতাচোপণেতাচ পঠেতে পিতরু স্বতাঃ ॥”

অর্থাৎ; যিনি প্রতিপালক (প্রভু);
 যিনি ভরে বা বিপদে মুক্ত করেন (রাজা বা
 সমাজ পতি); কাহার কত্তাকে বিবাহ করা
 গিয়াছে (স্বস্তর); পিতা এবং উপদেষ্টা (মহা
 দাতা বা শিক্ষক); এই পাঁচ জনেই পিতৃ-
 পদে বরিত হন। অর্থাৎ;—তুল্যরূপে সকলে-
 রই গুরু হন।

সামান্য জলাশয়কে লব্ধর “গোম্বদ”
 এবং বৃহৎ জলাশয়কে “গুরু” বলাবার।
 ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বৃক্ষ “লবু”;—বৃহৎ বৃক্ষ
 “গুরু”। ইতরপ্রাণী হইতে ইতরেতর প্রাণী
 “লবু”;—শ্রেষ্ঠপ্রাণী “গুরু”। রাজা অর্থাৎ
 জন—সাধারণের প্রতিনিধি হইতে, প্রজা
 অর্থাৎ জনসাধারণ—“লবু”; প্রজা হইতে
 রাজা “গুরু”। ভারবহনে অর্থাৎ মোট বা
 বোঝা হইতে এবং রৌদ্র-বৃষ্টি সহ করিতে,
 আমোদে আবার কুলি-মজুর “গুরু”;—
 বিদগ্ধিতার আবার তাহাদের অপেক্ষায়
 আমিহ “গুরু”। এইরূপ; পরস্পরের কুল-
 নায় পরস্পরের “লবুহ—গুরুহ” অন্তর্নিহিত

হইয়া থাকে। পাঠক! লক্ষ্য-গুরু কিয়া গুরু শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন? এখন গুরু মহত্ব এবং গুরু-বাক্য যে বেদভূম্য অলঙ্ঘনীয় তাহাই বিবৃত হইতেছে।

বিনি জন্মদাতা (পিতা); সকলের তিনি মহাগুরু। কারণ যে; তাঁহারই প্রসাদে—অহি, বাসু, বসু, শোণিতও সুখ-দুঃখ বিজ্ঞিত, দিব্যজ্ঞান বিশিষ্ট মনুষ্য-জীবন লাভকরা গিয়াছে। এবং সন্তান কিরূপে স্ত্রীল, সুবিধানও অতি সুখী হইবে; এতিয়া তাঁহারই মনে সত্যত উদিত হইয়া থাকে। স্মৃত্যু; জগতে তাঁহার তুল্য গুরু আর কেহই নহেন। তাঁহার আদেশ অস্তিত্ব সর্বথা রূপেই গালনীয়। কিন্তু;—শৈশবে আবার তাঁহারই শাসন নিত্যত অসহনীয় হয়। কারণ যে; সমবয়স্কদিগের সহিত যেচ্ছামত অধিকরূপ খেলা করিতে কিয়া বেড়াইতে দেখিলে—তখনই কষ্ট হইয়া থাকেন। অশনে, বসনে আমোদে, আশ্লাদেও তাঁহার সত্যকর্তা লইতে কোনও দিন ফ্রটি দেখা যায় না। বলিতে কি? তাঁহারই ভরে শৈশবে আমার কোনরূপ কুইচ্ছাই সাধিত হইতে পারে নাই। তাঁহার এইরূপ দূরপনের কঠিন শাসনাধীনে থাকিয়া;—আমার শৈশব কালটি গত হইতে না হইতেই বিদ্যা শিক্ষার সিদ্ধি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের হস্তে সমর্পিত হইলাম। সেখানে গিয়া, আরও

অধিক বিপদ গণিতে হইল। খেলা করিয়া, বেড়াইয়া কিয়া আমোদ—আশ্লাদ করিয়া যদি সময় নষ্ট করি; সেই জন্ত, সচা আনীত চোরের দ্বার আমার হাত, পা বাঁকা না থাকিলেও; শিক্ষক মহাশয়ের আদেশ ব্যতীত, সূর্যকালের অন্তঃ গৃহের বাহিরে যাইতে কিয়া বসিবার আসন খানিও কোন দিন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। দিবসের অর্দ্ধভাগ কেবল একস্থানে বসিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ব্যতীত, একটা কথা কহিবার বো ছিলাম না। অতঃপর উত্তমরূপে শিক্ষা পাইতে, তাহার প্রত্যেক কথায় মনোযোগ না রাখিলে; আমার নিস্তার ছিল কি? এইরূপ অতিকষ্টে প্রথমে পিতার, পরে শিক্ষকের মনরক্ষা ও আদেশ প্রতি গালন করিয়া; বিষয়-কার্য শিক্ষা করিতেই জীবনের অর্দ্ধভাগ গত হইল।

যখন নির্দেহ শারদ-গগন-পটে নক্ষত্র বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের দ্বার রমণীয় শোভায়, - সুখময় যৌবনকালটি ইন্দির সকল লইয়া, আমার এই ক্ষুদ্র দেহখানি সুন্দর হইতেও সুন্দরতররূপে প্রতিভাসিত করিল;—তখন পরম নৌভাগ্যবতী, অতি সৌকর্য্যময়ী, কোমল প্রাণা (সুশীলা বা দয়াবতী), পতি পরায়ণা, উপযুক্ত (বয়ঃপ্রাপ্তা ও শিক্ষিতা) পত্নীর সহিত সংসার-ধর্ম প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাবিলায়;—এখন হইতে আমার

অধীনতা-পাশ পূর্ণচ্ছেদিত হইল। পিতা, যদিও জীবিত ; তিনি এখন বৃদ্ধ—অতিজরা গ্রস্ত। লোক বলিলে ;—“বুড়ো হ’লে বাহাত্তরে (নির্ভুজি বা মন্দ বৃদ্ধতার পায়। ” সুতরাং ; তাঁহার কথা এখন না শুনিলেও হয়। অধিকন্তু আমি এখন বয়ঃপ্রাপ্ত ;—সংসারের তাবত বিষয়-আশয় দেখিয়া শুনিয়া ; শিক্ষা করিয়া সর্বাংশে একজন অস্থিতীয় বলিয়া গণ্য হই-রাছি ;—সাধারণের নিকট এখন আমার এই-রূপই প্রতিপত্তি হইয়াছে। সুতরাং আমার কার্য্যে এখন দোষ দেখিতে বা বাধা দিতে তাঁহার অধিকার আছে কি ?

বিদ্যালয়ে শেষ পরীক্ষা দিয়া প্রশংসাপত্র সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছি, পরে শিক্ষকদিগের সহিত সে সম্বন্ধে গিয়াছে। এখন তাঁহারাও আমার দোষ দেখিতে সমর্থ নহেন। বিশেষতঃ পরীক্ষা দেওয়া আমার মতে শুণ্ডি গণ্য ; লাভের (নামকিনিবার) অস্ত। কারণ যে ; জ্ঞান কাহারও নিজস্ব নয়। পরীক্ষা দিবার পূর্বে অনেক কৃতবিদ্যা (পাশকরা) ছেলে কেও বুদ্ধিতে আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ—এখন তাঁহারা জীবিত আছেন। তা বা হউক ; জগতে আমি এখন একাই এক মহত্ ; আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কাহাকেও দেখিতে পাইনা ; সুতরাং আমি এখন সম্পূর্ণরূপেই স্বাধীন ; আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পরিজন

বর্গ সকলেই বাস্তব ;—এইত উপযুক্ত সুযোগ,—জীবনের ইহাই মাহেজ্ঞকণ !

এইরূপ চিন্তা। সুখে বিস্তার আভি ; সহসা এমন সময় আবার ও কি শুনি ? শুনিলাম ;—“পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, বাগক, বৃক, বানতা কাহারও প্রাতি কখনও অভ্যাস অত্যাচার বা কোন প্রকার অস্বাভাব-হার কিম্বা প্রচলিত রাজ-বিধির অন্তর্ভাচরণ করিলে আমাকেও নিশ্চিত দণ্ডনীয় হইতে হইবে। ” সমাজের নেতৃগণের এবং রাজা-দি-রাজের এইরূপ আদেশ ;—জলে, স্থলে, নগরে, পল্লীতে, অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্বতে সর্বত্রই বিধোষিত হইতেছে। অহো ! তাঁহাদের ঐরূপ অহুজ্ঞা শুধু প্রচারিত থাকি-লেও যা হয়—হইত। তা নয় ;—আমাকে আবার তাহাতেই নিয়ত বাধ্য রাখিবার জন্য, রাজ-অহুচরণ এবং সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ যত্নের সহিত সর্বত্র সকল সময়েই যথোপযুক্ত ভাবে নিযুক্ত আছেন। তৃণটি অবধি স্থানান্তরিত (অপহরণ বা অপ-চরিত) করিবার শক্তি আমার কোথায় ? সুতরাং যুগপৎ ভীত, দুঃখিত ও বিষয়া-বিষ্ট হইলাম—ভীত বক, উন্নত মস্তক এক-কালীন অবনামিত হইল।

শৈশবে পিতা, বাণেশিক্ষক, যৌবনে রাজা ; এইরূপ শাসক পরম্পরার আমার অন্তরায় থাকিয়া জীবনের অধিকাংশ সময়ই

পরোধীনতার গত হইতে চলিল। প্রমাণ প্রত্যক্ষের দ্বারা বিশ্বস্ত হুজ্জৎ অবগত হইলাম; বার্ককো আবার মৃত্যু-রাজ আমার উপর আধিপত্য বিস্তার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। হার! আমার ইচ্ছা, জীবনে আর কলবতী হইতে পারিলনা।

নৈসর্গিক নিয়মে দেখা যায়, নদী সকল প্রাবিভা হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়, অথবা শুষ্ক হইয়া গিয়াই প্রাবিভা হয়। তরঙ্গমালা উখিত হইয়া বিগীন হয়, অথবা বিগীন হইয়াই আবার উখিত হয়। বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া বিনাশ পায়, অথবা বিনাশ পাইয়াই পুনরায় অঙ্কুরিত হয়। উন্নতি-অবনতি, যদিও জগতের স্রাবাতিক ধর্ম হউক, এবং আমারও জন্ম মৃত্যু বা ইহ পরকাল না হয় সমস্তই স্বীকার করিলাম, তা হইলেও ত দেখা যায়, নদী সকলে কুল ভাঙ্গিলে, পুনরায় তাহা নিষ্প্রিত হইয়া বাইতেছে। তরঙ্গ মংলায়,—নদী গর্ভে জ্বা সাকল ডুবাইয়া দিয়া, আরবার জাগাইয়া দিতেছে। বৃক্ষ উত্তম ফল বা ফুল সকল দান করিতেছে। সকলেরই জীবনের একটি লক্ষ্যও স্বাধীনতা আছেই। আমার জ্ঞান পরোধীন জীবনে তাহার কি আছে? অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, পরোধীনতার কারা (কেল) স্বরূপ, নিরন্ত অতাব-পূর্ণ বিষময় সংসার পরিভ্রাণ করিয়া, মহাত্মা পরওয়ারদের জ্ঞান তীর্থ ভ্রমণ দ্বারা আমার

এই পাপ জীবনকে পরোধীনতার দ্বার হইতে মুক্ত করিব, কারণ যে একজ ছাংখও মৃত্যু রাজের (ধর্মের) অধীনতা স্বীকার করিতে কিম্বা মৃত্যুজ্ঞতা সহজ কোন উপায় অবলম্বন করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি আসিতেছে না। বিশেষতঃ মৃত্যু-রাজের শাসন এমনই অসহনীয় যে, পলিতকেশ, খলিত দন্ত, বিগত বেশ অশীতি-পর বৃদ্ধেরাও তাঁহাকে সর্বদা ভয় করিয়া থাকেন, আমাদের শাস্ত্র এইরূপ বিধি দিতেছেন;—“জীবনের শেষভাগে ব্রহ্মচর্যা (গভীর সেবা বা চাকুরী) অবলম্বন করিয়া, বনে গমন করাই সঙ্গর্ষ (অবশ্রু করণীয়)।” আরও বিধি আছে যে, “পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ।” সুতরাং তীর্থ-বাসে কিম্বা বনাশ্রমে গিয়া, জীবন গত করিতেই স্থির করিলাম, সেক্ষণ হুযোগও উপস্থিত কারণ যে, আমার বয়স এখনও পঞ্চ-বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করে নাই, এখন হইতে অর্থাৎ পূর্ক হইতে কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, পশ্চাৎ সফল ফলিত হইবার আশা করা যায়, একজন্মই আর সময় গত করা চলিতেছে না। আরও একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে, আমার বয়স শুনিয়া, “বন-গমন” কথাটি অনেকের হরত বিশ্বাসের অযোগ্যও ভাবিতে পারেন, কিন্তু “বন-শব্দের অর্থ এখানে স্বাপন্ন সমাকর্ষণ বিজনায়ণ মনে করিয়া কাহারও ব্যাকুলতা প্রকাশ বা উপেক্ষা করিবার কোন

কারণ নাই। সকলেই অবগত আছেন; এই যুগে অর্থাৎ বর্তমান সময়ে বা কলিকালে,— নববীপ, কান্দি, বৃন্দাবন প্রভৃতি পুণ্য-ধাম (জনাকীর্ণ অথবা ধনী-বহুল সুখাবাস) সকল; গ্রহীদিগের পক্ষে বৈরাগ্য ধর্ম প্রতিপালনের অবলম্বনস্বরূপ। অর্থাৎ কেহ সমাজের ভেত্রে, কেহ প্রতিবেশীদিগের গঞ্জনায় ভরে কিংবা তাহাদিগের প্রতি তচ্ছিন্নভাবে বশত এবং কেহ বা পরিবার প্রতিপালনের দ্বারা আপন সংসারে বিরাগ ভাবিয়া, স্বাধীনমতে নির্কিঞ্চে নগরে গিয়া বাস করিতে মনোনীত করেন। অনেকে আবার পর্কতবাসীও হইয়া থাকেন। বাহা হউক, তুমিরা আশ্রয় হইবেন;— আমরাও উল্লিখিত কোন একটি স্থানে গিয়া, স্বাধীনভাবে জীবিকাজনের ইচ্ছাই করি-
রাছি। সেখানে যদিও রাজ বিধিরই অধীন থাকিতে হইবে, তা হইলেও—সমাজ-ভরে এবং কোনও কোন স্থানে মৃত্যু ভয়েও অব্যাহতি আছে। শাস্ত্রই এ কথা স্বীকার করিতেছেন।

পাঠক! আপনারা এত শক্তিত বা লজ্জিত হন কেন? আহুন! আমার সঙ্গে অঙ্গুর বাটীতে চলুন। সেখানে গিয়া, আমার পরম রূপবতী সুবতী ভার্য্যাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন কি? তিনি অসুস্থ্যাপ্তা হইলেও আমার নিত্য পত্নী।

আবার আমারই স্মৃতি তিনি সুখিনী, হৃদয়ে দুঃখিনী, ভক্তিতে শিষ্যা, সেবার পরিচারিকা, প্রণয়ের সখি, মন্ত্রণার মন্ত্রিনী অর্থাৎ অতি বুদ্ধি মতি এবং আমার চিরসঙ্গিনী বটেন। বরসে ঘোড়নীর হইরাও তিনি প্রবীণা অর্থাৎ বহিঃ-সীর ভ্রাতৃ স্বভাব কঠিনা, আমার নবীন্য (সুবতী বা নববিবাহিতা) অন্তর্ভুক্ত কন-
নীর্য (সরলা বা আদরশীরা)? কোমল-কঠোর-অসুতে গরলে এত গুলিগুণ একা-
ধারে!! তাহারও আবার পরম্পর এত বৈষম্য ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন কি? কোম-
লতা না থাকিলে কঠোরতা কিংবা কঠোরতা না থাকিলে কোমলতা গুণের পরিচয় পাবেন
কিসে? প্রসিদ্ধ আছে; “পর্কতো বহিঃমানু
ভূম্যৎ” অর্থাৎ পর্কত গাত্র হইতে ধূমাস্পত
দেখিয়া অগ্নি অধুমিত হইয়া থাকে। ইহা ভ্রাতৃ
শাস্ত্রেরই আদ্য প্রমাণ, তত্ত্বের অঙ্গ মধুরাদি
বড়বিধ আশ্বাদন অনেক কলেই প্রাপ্ত হওয়া
যায়। তুমিতে পাই, তাহার (বিশেষতঃ
আমারও) অগোচরে অনেকেই না হয় সঙ্ক-
লেই তাহার গুণেরও সৌন্দর্যের নিষ্কাশন
থাকেন, তাহাদের সে কথার কিছুই আসে
যায়না। কারণ যে, পরের দোষ পরেই
অধিক দেখিয়া থাকে, অথবা তদ্বারা তাহা-
দের দৃষ্টি বৈচিত্র্যও প্রতিপন্ন করা বাইতে
পারে, কেননা, পরম্পর রসনেঞ্জিরের কাণ্ডে
বিভিন্নতা স্বীকার করার মনোবৃত্তির কাণ্ডেও

বিভিন্নভাবে আসিবে, তা বাহ্য হউক, এখন প্রত্যাখিত বিষয়ে তার্যার (বিশেষতঃ মস্তিষ্কীয়) অভিমত জানাইত উচিত? শাস্ত্রে বিধি আছে, “সত্যার্থা ধর্ম্মাচরণং” অর্থাৎ তার্যার সহিত একত্রে ধর্ম্মাচরণ করা বিধেয়। এই অস্ত্র তার্যাকে সচর্চাধর্ম্মী এবং দেহের অর্ধ অধীশ্বরী বুলি হইয়াছে।

বর্তমান শতাব্দীতে পাশ্চাত্য উচ্চতর শিক্ষা বিকাশের সঙ্গে সত্য (শিক্ষিত) সমাজ কেবল আপনাদের শৈশবিক বিষয়কর্ম্ম (সম্পত্তি ও চাকুরী) অধিকতর ভোগ বিলাসিতা বৃদ্ধি করিতেই নিজেরা ব্যস্ত থাকেন, তজ্জি, দেবতার ব্রাহ্মণে ভক্তি, দান ও ত্রুত নিরমাদি এবং অত্যাগত ও অতিথি চর্চাপ্রভৃতি ধর্ম্ম কার্য্য সমস্ত তাঁহাদের সরলপ্রাণ (সহজে বীর চিত্ত আর্জতা চর), ধর্ম্ম পরায়ণা পরিবারদিগের প্রতিই স্তম্ভ রাখিয়াছেন, এনিমিত্তই, সমাজে তাঁহারাই এখন আদর্শ ব্যক্তি নগিয়া গয়া হইতেছেন। অভিধানে, আদর্শ ব্যক্তিদিকে “মহাজন” শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। মহাজনরত এই পাঠে জানা যায়; মহাত্মা যুধিষ্ঠির উপদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, “মহাজনো যেন গুণঃ স পশ্যঃ।” এই অস্ত্র আবার কেহ কেহ আমার সহধর্ম্মিনীকে সুনী প্রবর ব্যক্তিকীর তপোবনে পাঠাইতে অহরোহ করেন, তাঁহাদের সেই অহরোহ রক্ষা করিতে পারি কৈ? কারণ যে আবার এই

মুহুর্ত্তেই তাঁহার স্বর্ণ প্রতিভূতি পড়িয়া রাখিতে হইতেছে, তা বাহ্য হউক, এখানে প্রবন্ধ বুদ্ধি করিয়া কাল মাই, মস্তিষ্কীয় অভিমতটিই শুদ্ধ।

বিবর কার্য্যাহুরোধে তার্য্য সহ বিদেশে (বিশেষতঃ সহরে) গিয়া, নানাদেশীয় নানা জাতীয় লোকের সহিত একত্রে বাস ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদের নিকট নূতন নূতন মত সকল শুনিয়া, আমাদের আচার ব্যবহারও মানসিক পতি, শেষে যদি ভিন্ন পথ অবলম্বন করে, এই তরে প্রথমতঃ ব্রহ্মপিতা মাতার মনে গুরুদেবের দ্বারা আমাদিগকে দীক্ষিত করিবার (মন্ত্র দিবার) ইচ্ছা বলবতী হয়। কিন্তু আমার তাহাতে ইচ্ছা না থাকিলে, অনীচ্ছিত কার্য্য অশুভকর জানিয়া অথবা আমাদের কর্ত্ত্বক নিজেদের পৌরব নষ্টের আশঙ্কাতেই হউক, আপনারা শিখণ্ডী সাজিয়া আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ অস্ত্র বধূকেই সা-রথী মনোনীত করিয়াছিলেন। পুত্র বধঃপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত হইলে এরূপ প্রথা অনেক পরিবারেই প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়! বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে (অর্থাৎ জী-স্বাধীনতার দিনে) এরূপ প্রথা প্রচলিত থাকা, কখনই অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইবে না।

যথাসাধ্য স্বধর্ম্মাচরণ (যথারীতি কর্ত্তব্যাহু-ষ্ঠান) করিতে আমাদের পূর্ণোদ্যোগী মেথিয়া এবং নিজেরও তাহাতে সেইরূপ প্রয়োজন

আছে বুঝিতে পারিরা, শাস্ত্রীর বচন প্রমাণ (নৈতিক চলন-চরিত্র) দ্বারা প্রথমের তিনি আপত্ত্য জানাইছেন যে, অদীক্ষিত (অপরিজ্ঞাত বা অনভ্যস্ত) থাকিতে ধর্মকাণ্ডে আমা-দের স্বতঃ কোনও অধিকার জন্মে নাই, এবং আরও বলিলেন যে,—“অদীক্ষিতদিগের পণ্ড-জীবন (১) কখনও অপনীত হয়না।” কন কথা, তিনি আরাধনিককে দীক্ষিত হইতেই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, জিজ্ঞাসা করি, অভিমানিনী জীজ্ঞাতির কথার আপত্ত্য উত্থাপন করা কি আপনাদের অভিপ্রেত? জানি,—তর্কের দ্বারা বিষয় (প্রস্তাবিত প্রশ্ন) সরল হয় বটে, কিন্তু বিষয় বুদ্ধি এবং পরস্পর মনোবাদের আশঙ্কা আসিবে না কি? বিশেষতঃ কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে দৃষ্ট হয়,—“শ্রীরাধা, অমূল্য বিষয়ের শ্রীকৃষ্ণেরই মন্ব দাত্রী (দীক্ষাগুরু) ছিলেন।” শক্তিমতেও তত্ত্ব শাস্ত্রে প্রকৃতিরই প্রেষ্টব্য বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং

(১) আহার, নিদ্রা, মৈথুণ্য, ভয় এসমস্ত গুণ, পণ্ডিতে এবং মনুষ্যে তুণ্য রূপেই আছে। এই জন্ত সাধারণতঃ মনুষ্য জীবনকেও “পণ্ড জীবন” বলা হইয়াছে, ইহার ধার্মিক এটরূপ, “পণ্ড বোধনে” অর্থাৎ বাচে বোধ বা ধর্ম জন্মায় অথবা ইঞ্জির গোচরীভূত সমস্তই “পণ্ড”। সেরূপ প্রাণীরই “পণ্ড জীবন” আখ্যা দেওয়া যায়।

শাস্ত্রীর গুরুবাক্য মতন করা পাপ নরাক? আপনারা কিরূপ করিরা থাকেন জানিরা, আমি কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহারই মতন করা করিতে বাধ্য থাকিলাম, একজ্ঞ সকলে আমাকে ভীকৃ কাপুরুষ এবং আরো যদি কিছু বলিবার থাকে—বলুন।

আমার এই মন্ত-গ্রন্থ প্রস্তুতকৈ অনেক হয়ত গোড়ামীও মনে করিতে পারেন। সে কথা পরে বুঝা যাইবে, সকলে জ্ঞাত আছেন, মন্ত গইতে প্রথমতঃ কুল-গুরুরই (২) প্রয়োজন হয়। কুল-গুরুর সম্বন্ধেও অনেকে আবার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। “তিনি বালক, মূর্ণ এবং অসমাদারী হইলে; সামাজিক প্রথা বা শাস্ত্রমতে তাঁহারই নিকট মন্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকা, তাঁহাদের মতে তাঁর বিরুদ্ধ এবং উহা পৌরাণিক শাস্ত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণ (যেহু) জাতিই স্বাধীনতা মাত্র।” কোন বিষয় মীমাংসা না করিরা, নিজের মন্ত বুদ্ধি করাকে “স্বাধীনতা” বলে।

হিন্দু শাস্ত্রকার কোনও বিষয়েরই মীমাংসা করিতে অবশিষ্ট রাখিরা বান নাই, সুতরাং একবার মীমাংসা শাস্ত্রে নাই কি? তা বা হউক, এখানে আমার মন্তটি উনিয়াই যদি

(২) বিনি, পিতা পিতামহকে মন্ত দিয়াছেন, অথবা তাঁহারই বংশের যে কোনও ব্যক্তিকে “কুলগুরু” বলা হয়।

তাহাদের আগত্য ভজন হয়, তবে আর শার
খুঁজিবার প্রয়োজন কি? পাঠক! অগ্রে
আমার মতটিই শুধুন।

বালকের প্রকৃতি অতি সরল (হিংসা ঘেব
বর্জিত) আকৃতিও তাহার মনোহর, সুতরাং
কুটিণ, কুচক্রী এবং শোক-চিন্তা ক্লিষ্ট, বিবর্ণও
বিবরাসক্ত, ব্যক্তির গুরু হইবার সেকি বোধ্য
নয়? মূর্খের সম্ভাব্য মূর্খ এবং পণ্ডিতের সম্ভাব্য
পণ্ডিত হইবে, এরূপ কোন বিধি পাওয়া
যায় না। আমি জানি,—আমার শিক্ষকদি-
গের মধ্যে অনেকেই অসদাচারী এবং বরষেও
আমাদের নান ছিলেন, এখন আমি যেক্ষণ
শিক্ষা প্রাপ্ত হইরাছি, অনেকে আবার সেক্ষণ
শিক্ষাও প্রাপ্ত হন নাই, তবে কি আমাদেরও
বালকত্ব, মূর্খত্ব এবং চরিত্রগত দোষ স্পর্শিত
হইরাছে? তাহাই যদি স্বীকার্য্য না হইবে,
তবে আর বালক মূর্খ কিবা অসদাচারী গুরুর
নিকট মাত্র গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? কুল-
গুরু তাক্য কি অভ্যাত্য, সম্বন্ধে আমি অল্প
কোন প্রমাণ দেখিতে পাইনা, তবে বাগানের
মালিগা বধন গাছে জোড় কলম বাঁধে, দেখি-
রাছি—এক জাতীয় (স্বজাতীয়) চারা না
হইলে, তাহাদের কলমে জোড়া লাগে না!
আবার চারার উন্নতি দ্বারা কলেরও উন্নতি
হইয়া থাকে। একপাত্রে সাগর-জল, অল্প
পাত্রে গঙ্গাজল রাখিয়া, উভয় পাত্রেই জল
একত্রিত করিলে সমস্ত উভয় জলের গুণ

হ্রাস পায়। কিন্তু পূর্ণকরণে অর্থাৎ সাগরে
সাগর এবং গঙ্গায় গঙ্গাজল মিশাইলে, তাহার
গুণ আরো বর্ধিত হয়, ইহার অধিক প্রমাণ
প্রয়োণের প্রয়োজন হইবে কি? তা বা
হউক, আমি পরিজনদিগের নিকট আমাদের
গুরুদেবের নাম শুনিয়াছি মাত্র, তাহাকে
কখনও দেখিরাছি এরূপ মনে হয় না।
কারণ যে, জ্ঞান হইলে পর পাঠ্যবহায় এবং
বিবর-কার্য্যানুরোধে বহুকাল আমি বিদে-
শেই গত করিরাছি। বাটী থাকার সময়েও
তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ না হইবার
অনেকগুলি অন্তরায় আছে। বৎসরে তিনি
একবারমাত্রই বার্ষিক (১) নিতে আসিরা
থাকেন। তন্নিম্ন আমাদের বাটীতে তাঁহার
অল্প কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ
হয় না। যখন আসেন,—একরাত্রির অধিক
কখনও বাস করেন না। তাহাও আবার
অধিক সময় আমাদের অন্তরবাটীতেই গত
করেন এবং সেখান হইতেই পুনঃ প্রত্যাগত
হন। কারণ যে, সেখানেই তাঁহাদের (গুরু-
দেবের ও পুরোহিতের) প্রয়োজন ও আধি-
পত্য। বহির্জাতিতে (বিশেষতঃ আমার
নিকটে) তাঁহাদের না আসিবার অনেকগুলি
কারণ আছে বটে, কিন্তু বিস্তার তরে এতুলে
তাহার উল্লেখ করা হইল না। [ক্রমশঃ।

শ্রীমদ্বারজ্ঞান মিত্র মহাশয়।

(১) প্রতি বৎসর গুরুদেবকে প্রণামী-
স্বরূপ বাহা দেওয়া হয়।

অধর্ম—না পুণ্যসঞ্চয় ।

বেদের সময়ে অল্পমরণ কিবা সহমরণ প্রথা চলিত ছিল না । কাহারও মৃত্যু হইলে এখনকার জৈনদের ও শিকানীদের মত আর্ধোরা হাসিতেন, সকলে কত নৃত্য গীত করিয়া বেড়াইতেন । তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, তদ্বারা পরমায়ু বৃদ্ধি হয় । অন্তোষ্টি-কিরার সময়ে শ্রমানে চিতা সাঙাইয়া তাহার উপর শব রাখা হইত । মৃতব্যক্তির বিধবা পত্নী তাহার পাশে চিতার উপর শুইতেন, চিতার চারিদিকে পুত্রবতী সখা স্ত্রীলোকেরা চক্রে ঘুরিয়া এবং উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া ঝাঁড়াইয়া থাকিতেন । তাঁহাদের চক্ষু দিয়া একবিন্দু জল পড়িত না । ভুলিয়াও কেহ একবার শোক করিতেন না । কিছুক্ষণ পরে সখা রমণীদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইত । এদিকে ঋত্বিক্, বিধবা নারীকে চিতা হইতে উঠিতে বলিতেন, উঠিলে তাঁহাকে পুনর্বার বিবাহ করিতে আদেশ করিতেন । তখন দেবর কিবা মৃত-ব্যক্তির শিশু অথবা বাটির কোন পুত্রাতন চাকর আনিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া ভুলিয়া গাইতেন । পরে শবদাহ হইত ।

আমাদের বোধ হয় বৈদিক কালের পূর্বে লোকে যখন অভ্যস্ত অসভ্য ছিল, সেই সময় আর্ধাজাতির মধ্যে সহমরণ চলিত

ছিল । জীবিত মানুষকে গোড়াইয়া মারা পণ্ডিত্য কাণ বৈ আর কিছুই নহে । সাধ করিয়া স্ত্রীহত্যা, মাতৃহত্যা করা ধার্মিক লোকের বৃদ্ধিতে আসে না, এ কেবল পাণ্ডৱ নরশিশাচদের মনের ঘোর অজ্ঞতার পরিচয় । বেদের সময়ে আর্ধোরা অশিক্ষিত ও সভ্য হইরাছিলেন, ধর্মের নির্মূল জ্যোতিঃ তাঁহাদের মনকে আলোকিত করিয়াছিল ; তেমন অবস্থার বিধবা আশার ভুলিয়া কখনই তাঁহারা স্ত্রীহত্যা করিতে পারেন না, কিন্তু একটা প্রথা অনেক দিন দেশে চলিয়া আসিলে, একেবারে তাহা উঠাইয়া দেওয়ার কঠিন হয়, বৈদিক সময়ের পূর্বে সহমরণ চলিত ছিল, তাই বৈদিক কালে ঋষিরা ঐ প্রথা একেবারে রহিত করিতে পারেন নাই । সে অজ্ঞ যামীর মৃত্যুর পর, পুত্রাতন নিরস রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিধবা নারী মৃত পতির চিতাশয্যার গিরা একবার শরন করিতেন । শেষে তাঁহাকে উঠাইয়া আনা হইত । এটা আসল নিরসের নকল নিরস বৈ আর কিছুই নহে । অসভ্য অল্পমান করিয়া এখন এই পর্য্যন্ত বলা বাইতে পারে ।

ক্রমে রাজবিপ্লবে ও ধর্মবিপ্লবে হিন্দুরা আবার অজ্ঞ হইয়া পড়িলেন । পূর্বের মত জ্ঞানাহীনগন ও ধর্মালোচনা থাকিল না, এই অবস্থার কঠিন ভ্রমে পড়িয়া তখনকার

অদ্রবর্ষী শাস্ত্রকারেরা পুনর্বার সহমরণ চলিত করিলেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ঋতুমতী ও গর্ভবতী নারী এবং কোলে ছোট ছেলে থাকিলে সে সকল স্ত্রীলোক পতির সঙ্গে মরিতে বাইতেন না, তবে ঋতুর তৃতীয় দিবসে স্বামীর মৃত্যু হইলে একদিন শব রাখিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ১৮২২১২৩ সালে গভর্ণমেন্ট চারিদিকে তীব্রদৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন, পুলিশের বিশেষ অনুমতি না লইয়া কেহ সতী-দাহ করিতে পারিতেন না, ওজ্ঞা সে সময়ে চারি পাঁচ দিনের বসী মড়া পড়িয়া থাকিত। যে কয়েক দিন মড়া পড়িতে থাকিত, ততদিন পর্য্যন্ত হস্ত-ভাগ্য বিধবা নারী কিছুই আনিতেন না। সে ব্যবস্থা ভাল-ছিল। চুপ করিয়া নিভাস্ত বেকার থাকিতে হয়, তাহার চেয়ে বেগারে দাঁতে দাঁত দিয়া, ওকাইয়া মৃত্যুর দিকে অনেকটা আগ্রসর হইতে পারিতেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিয়া আগে মৃতদেহকে চিতার উপর রাখা হইত। প্রেতপিণ্ডাদি দেওয়া হইলে নাপিত আসিয়া সতীর নখ কাটিয়া দিত। তাহার পর তিনি আলফার থলিয়া, হাতের শাখা ভাঙ্গিয়া দান করিয়া আসিতেন। দান করা হইলে স্বামীর স্বজনেরা তাঁহাকে ঢেলীর কাপড় পরাইত, রান্না-হতা দিয়া হাতে আলতা বাঁধিয়া দিত; চুণের উপর থরে থরে চিকণী

সাজাইয়া দিত এবং কপাল বড়িয়া সিন্দূর মাখাইত। এইরূপ বেশভূষা হইলে সতী, আচমন করিয়া তিল জল ও কুশহস্তে পূর্ব-মুখে সন্মরন করিতেন। এইরূপ সন্মরন করা হইলে সতী স্বর্গ্যাখ্যা দিয়া দিক্‌পাল-দিগকে সাক্ষী করিতেন। লোকপালদিগকে সাক্ষী মানিয়া সতী সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করিতেন। শেষে তিনি চিতার উপর উঠিয়া স্বামীর পাশে শয়ন করিতেন। আত্মীয় স্বজনেরা কক্ষির বেতী এবং গাছের কাঁচা ছালের দড়ী দিয়া তাঁহাকে মৃতদেহ ও বড় বড় কাঠের কুদার সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিত। তাহার পর অগ্নি সমর্পণ করা হইত। চারি দিক্‌ হইতে লোকে ঝুপ্‌ ঝাপ্‌ করিয়া বড় বড় কক্ষির, শরের ও পাকাটির বোঝা চিতার উপরে ফেলিয়া দিত। কেহ কেহ চিতার উপরে বড় বড় বাঁশ ফেলিয়া দিয়া চাপিষা থাকিত। এদিকে পাঁচ সাতটা ঢাক বাজিতেছে, কীর্তনীয়ারা খোল করতাল বাজাইয়া আকাশ পাতাল ছাইয়া ফেলিতেছে। চিতার ভিতর ঘোর আর্তনাদ হইলেও তাহা শুনিবার উপায় নাই। কচিং আণ্ডণের জালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে কেহ কেহ চিতা হইতে পড়িয়া বাইতেন। চিতাভ্রষ্ট সতীকে প্রোজাপত্য প্রারম্ভিত করিতে হইত। প্রারম্ভিতের পর গৃহস্থেরা আর তাঁহাকে ঘরে লইতেন না। কানেই

মুদাকরশেরা তাঁহাকে লইয়া বাইত। তাই চিতা হইতে কেহ কদাচিৎ পড়িয়া গেলে আত্মীয় স্বজনেরা জীলোকটার মাথায় লাঠি মারিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিতেন। চিতা প্রদক্ষিণ করার সময় অনেকেরই শরীর দিয়া দর দর স্বর্ণধারা বহিতে থাকিত এবং অল্পকণ পরেই মুচ্ছা যাইতেন। কাহারও কাহারও এই সময়ে হঠাৎ মৃত্যু হইয়াও গিয়াছে। বাঁহারা এই সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, অস্তাবধি সেই সকল বৃদ্ধ লোক জীবিত আছেন।

সে কালের সহমরণ দেখিবার নিমিত্ত বালক, বালিকা এবং অনেক সম্ভবা জীলোক শ্রমশানে যাইতেন, তাঁহারা সতীর হাতের বালা, ভাঙ্গা শাঁখা, কপালের সিন্দূর এবং ছড়ান খই কুড়াইয়া আনিতেন। কোন বালবধু পতিপরায়ণা না হইলে, তাহাকে সেই সিন্দূর পরাইয়া দিত। সেই খই বিছানায় রাখিলে ছারপোকা হইত না। কাহাকে প্রেতিনীতে পাইলে সেই শাঁখা ভাঙ্গা রোগীর পণার বান্ধিয়া দেওয়া হইত।

জীলোকের উপর এত অত্যাচার, কাজীর নিস্তেজতা এবং মাজের সম্বনতির লক্ষণ। পতির মৃত্যুর পর, পুড়িয়া মরিবে—জীলোক !—আর পত্নী মরিলে পোড়া পুরুষ, কোলের গৃহ-লক্ষ্মীকে লইয়া পুড়িয়া মরিবে না, একাদশীও করিবে না। তিনি কেবল

নুতন বর সাজিয়া আর একটা বিবাহ করিবেন। কেন? এত অস্তায় কি ভয়? যে দিন হইতে জীলোকদের প্রতি এই অত্যাচার ঘটয়াছে, সতী-দাহও সেই সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল।

শ্রীদেবেশ্বরনাথ মহিতা।

স্থখ কিসে ।

ভারত ! "আজ তোমার এ দশা কেন ? আজ তুমি যানভাবে জগতের এককোণে বসিয়া ভাবিতেছ কেন ? আজ তুমি সকল সম্পত্তি হারা হইয়া ভিখারী সাজিয়াছ কেন ? কে তোমার পূৰ্ণ পোষক, পূৰ্ণ পোষণ ও পূৰ্ণ ঐশ্বর্য্য হরণ করিল ? যে ভারতের যশো ভাতিতে এক সময়ে সমগ্র জগত আলোকিত হইত, আজ সেই যশ প্রদীপ কোন যোদ্ধা কঙ্কাবাতে নিভিয়া গেল ? যে ভারতের ব্রাহ্মণ্যভেদের প্রথর প্রভায় বিদেশীয়গণ ভয়ভীত হইত, আজ সেই ভারত এত নিম্নত ভাবধারণ করিয়াছে কেন ? আজ ভারতের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর না কেন, দেখিবে সকলি যেন বিবাদ মাথা, সকলি যেন উদাস উদাস ! ভারতাকাশে তপন আর সেরূপ উজ্জল কিরণ বিকীরণ করেনা, চাঁদ আর সেরূপ সুখ হাসি হাসেনা, সমীর ভেমন দিচ্ছ সমীভবায় প্রাণে সমুদ বর্ণন করেনা। ভাঙ্গ-

তের কাননে কাননে কুসুম তেমন স্বর্গীর
মধুর হাসি হাসেন। সাথে পাখিগণ তেমন
কুমধুর গায়না। হার? আজ আমরা কি
শোচনীয় অবস্থার উপস্থিত! আমরা উন্নতির
উচ্চনিধর হইতে যে পতনের নিম্ন প্রদেশে
উপস্থিত হইরাছি তাহাতো একবারও
ভাবিনা। ভ্রাতঃ। আর কতকাল এরূপ
ভাবে দুঃখজীবন ভার বহন করিবে, কতকাল
দীন ও অলস ভাবে কেবল নিজের মজিরা
খানব নাম কলঙ্কিত করিবে? ভাবিয়াছ কি
কোন পাণে দেবতা হইতে গওতে পঙ্কিত
হইরাছ? একমাত্র পবিত্রতা হারা হইরাই
যে আজ ভারতবাসী এরূপ নীচ অবস্থার
পতিত হইরাছে, তাহাতে অধ্যাত্ম ও সঙ্গের
নাই। একমাত্র ধর্মবিহীন হইরাই যে ভারত
হাহাকারে পরিপূর্ণ হইরাছে, তাহা কে অস্বী-
কার করিবে। পূর্বকালে ব্রাহ্মণগণ সমাজের
সর্বমম কর্তা ছিলেন, তাহার নিত্য পবিত্র-
ভাবে সকল কার্য সম্পন্ন করিতেন। তাহাদের
মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস
চতুষ্রয়ের প্রচলন ছিল। সংসারে প্রবেশ
করিবার পূর্বে তাহার ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা আত্মার
প্রকৃষ্ট উন্নতি সাধন করতঃ সংসারে প্রবেশ
হইতেন, এই সংসার জীবনের সজ্জিত।
দেহজন্ত তাহার ভগবানের অতিপ্রায় মত
কার্য্যভিলাষী হইয়া সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে
সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন, সংসারের

মোহিনী প্রলোভন তাহাদের আত্মাকে
পতনের দিকে লইয়া বাইতে কখনই সক্ষম
হইতনা। হৃদয় হইতে সাধন উঠাইয়া লইলে
যেদ্রুপ তাহা কখনই কোনও প্রকার জলীর
পদার্থে বিমিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা থাকেনা,
অজ্ঞপ সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্বে ব্রহ্ম-
চর্য্য প্রভাবে আত্মার বল সাধন করতঃ
বিবেক বলে সর্বিশেষ বলীমান হইতে পারিলে
সে মন আর সংসারের কুহকে পাপের ঠাঁটে
পতিত হইয়া কলুষিত হইতে পারেনা। অধি-
কত ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারা তৎকালে সকলেরই
আত্মনির্ভরতা শিক্ষা হইত। কারণ ১৭কালীন
ছাত্রগণ গুরুর গৃহে থাকিয়া স্বীয় জীবিকা
নির্ভর্যের জন্য তিক্তবৃত্তি অবলম্বন করিত।
তাহাদের আপনাপন পরিচ্ছাদাদি আপনা-
দিগকেই পরিচাল্য করিয়া লইতে হইত।
এতদ্বিতর গুরুর গৃহের অনেক কার্য্য সম্পাদন
করিয়া দিতে হইত। সুতরাং তাহাদের
শারীরিক ও মানসিক উত্তরাধিকার সজ্জিত
বর্ধিত হইত। কাজেই তাহার অগ্ৰগতি
দেহ মন লইয়া সংসারে বিচরণ করিতে সক্ষম
হইত। তাহাদের দ্বারা সংসারের সকল
কার্য্যই সুসম্পন্ন হইত। অপরাধের জাতি-
গণও শ্রেষ্ঠব্যক্তি-ব্রাহ্মণদিগের অনুসরণ করিত
ও তাহাদের অনুমোদিত কার্য্যাবলীর সাধনে
প্রবৃত্ত হইত। তজ্জন্মই ভারত তখন এক
উন্নত ছিল। আর আজকাল ব্রাহ্মণ তাহার

স্বীয় কর্তব্য বিষয় হইরাছে, কাজেই অপর-
পর জাতিও তাঁহাদের সহিত পতনের এত
নিরঙ্কুল উপস্থিত হইরাছে। অতএব যদি
আমাদিগকে প্রকৃত স্থখের অন্বেষণ করিতে
হর, তবে পুনরায় ধর্মালোকে অগতকে
উদ্ভাসিত করিতে প্রয়াসী হওয়া একান্ত
কর্তব্য। এ অগতে সকলেই স্থখ চায়। রাজার
অট্টালিকা হইতে দীনের কুটার পর্য্যন্ত সর্ব-
ত্রই “স্থখ”—“স্থখ” ধ্বনি উদ্ভিত হইতেছে।
কিন্তু কি করিলে প্রকৃত স্থখী হইতে পারা
যায়, তাহা অগত বুঝিতে পারিল না। কেহ
মনে করে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইতে
পারিলেই বুদ্ধি প্রকৃত স্থখী হইতে পারা যায়।
অগণিত রাজ্য অর করতঃ বিপুল সাম্রাজ্য
স্থাপন করিয়া সাম্রাজ্যের মুকুটে ভূষিত হইতে
পারিলেই বুদ্ধি স্থখের চরম সীমার উপনীত
হওয়া যায়। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল বিশ্বাস।
সংসারের কোন পদার্থেই মানুষকে স্থখী
করিতে পারে না। রাজকোষপূর্ণ অগণিত
অর্থ, স্নেহময় জনক, স্নেহময়ী জননী, ও সমস্ত
পারিভ্রাতানিত স্থত বদন কখনও মানুষকে
প্রকৃত স্থখ দিতে পারে না, বিবিধ রসনা
তৃপ্তিকর খাদ্য, বিবিধ বিলাস সামগ্রীতে
মানব প্রকৃত স্থখের আশ্বাসন লাভ করিতে
পারে না। সুসজ্জিত সৌখ্যবাসী হইলেই মনে
শান্তি আসিতে পারে না, প্রিয়তমা জীবন
সঙ্গের প্রাণাধিকার পত্নীর প্রণয় মাখা বদনেও

মানুষকে প্রকৃত স্থখের অধিকারী করিতে
পারে না। এ সকলি মোহ, এ সকলি ভ্রম !
যে বস্তুর ধ্বংস আছে, তাহাতে চিরস্থায়ী স্থখ
কি প্রকারে সম্ভব হইবে ? পার্থিব বাহ্য
কিছু দেখিতেছ, তাহার সকলিতো অনীক !
সকলিতো ভঙ্গুর। যে ব্যক্তি বস্তুকেই স্থখের
জিনিষ মনে করে, তাহার জ্ঞান নির্মোহ
আর কে আছে। অতএব বহুগণ। যদি নিত্য
স্থখের অধিকারী হইতে চাও, তবে যে বস্তু
নিত্য বাহার ধ্বংস নাই, এরূপ বস্তুর অন্বেষণ
কর। সংসার ভীষণ মরুভূমি। মানব তাহাতে
শ্রান্ত যুগ যুগপ। মারামরীচিকা জলজলে
মানব যুগ এখানে সর্বদাই চলিত হইতেছে।
অতএব সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন একান্ত
আবশ্যক। কণহারা কোনও বস্তুর অর্থেই
লালায়িত হওয়া উচিত নহে। যদি প্রকৃত
শান্তির স্থখই মিলিলে অতৃপ্ত শিরাস। হ্র
করিতে চাও, তবে একমাত্র নিত্য ও পূর্ণার্থ
মিলিল পান কর। ধর্মাসুত হ্রদে ডুব দাও
দেহের আলা জুড়াইবে, আত্মা শীতল হইবে
ও প্রাণে অভিনব বর্ণের আবির্ভাব হইবে।
আর বসিয়া থাকিওনা, আর দূর হইওনা।
এইতো সময় যায়, এইতো সুকোমল ভূমি
বিক্রম্যমান ছদ্মহইতো সংসারের তাণ্ডে মুক্তিলা
কাবা হইয়া বাইবে। তখন তাহাতে ধর্মবৃক্ষ
ফলাইবেন। অতএব বহুগণ এই সময়
হইতেই ধর্ম সাধনে রত হও। পার্থিব সকল

কার্যেই ভগবানকে স্মরণ করিও । লেখা পড়ার মুখ্য উদ্দেশ্যে। অপর কিছুই নহে । ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্যই মনের উৎকর্ষ সাধনার্থ শিক্ষার আবশ্যক । দেখা গেলের সহিত জলই মিশিতে পারে, একজাতীয় না হইলে তাহাদের মিলন হয় না । ভগবান করুণাময়, তিনি অতি পবিত্র ও অতি নির্মল ! তাহাতে পাপের কালি লাগিতে পারেনা । মাছুষ যদি তরুণ নিকলক ও পবিত্র না হয়, তবে কি প্রকারে ভগবানের সহিত মিলিত হইবে । যে ব্যক্তি বত অপবিত্র, ঈশ্বর তাহা হইতে তত অধিক দূরে অবস্থিতি করিলে । সংসারে চারিদিকেই ভগবানের অপার করুণা বিরাজিত রহিয়াছে । সমীর তাঁহারই স্নিগ্ধতা বহন করিতেছে । কুসুমে তাঁহারই কোমলতা ও তাঁহারই পবিত্রতা বিমিশ্রিত রহিয়াছে । তাঁহারই করুণাধারা স্বরূপ নদ নদী সর্বত্র প্রবাহিত ! কিন্তু অন্ধ মানব তাহা দেখিতে পারেনা । মুগ্ধ মানব ভগবানের উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাঁহার অভিপ্রেত কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়া । সম্মুখে নিত্যবশ্ত বর্তমান, কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তুচ্ছ জ্বলের অবেশে ইতস্ততঃ অবধা ঘুরিয়া মরে । অতএব বুদ্ধগণ ! যদি তোমরা জ্বলের সংসারে প্রকৃত জ্বলের অভিনাব কর, যদি মাসব হইয়া দেবতার উপযুক্ত হইতে চাও । যদি ঐহিক ও পারলৌকিক উত্তরবিধ স্বপ্ন সম্বোধে অভি-

লাব থাকে, তবে আর সংসারের তুচ্ছমোহে জুলিওনা । সমর থাকিতে কার্যে রত হও । মন্তকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ গ্রহণ কর ; দক্ষিণ হস্তে ভ্রার ও বামহস্তে সত্যের দণ্ড লও, হৃদয়ে ঈশ্বরের পবিত্র মূর্তি অঙ্কিত করতঃ কার্যে প্রবৃত্ত হও । তবেই মানব হইয়া দেবতা বলিয়া পূজ্য হইতে পারিবে, তোমাদের জীবন ধন হইবে ।

শ্রীকৃষ্ণদত্ত ভট্টাচার্য্য ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

প্রবাহ—১ম বর্ষ শ্রাবণ—উপযুক্ত সম্পাদকের হাতে পড়িয়া কাগজখানি চলিতেছে ভাল । প্রায় সমস্ত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি তৃপ্তিকর “ঋণশোধ” বড় ভাল লাগিল । ভাষা ও ব্যাকরণে লেখক প্রাণের কথা টানিয়া আনিয়াছেন । “উপনিষৎ” শীর্ষক প্রবন্ধটিতে সব জায়গায় আমাদের মতের মিল না থাকিলেও প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে এবং ইহার ভাষাও বেশ প্রাজ্ঞল । “ভারতোদ্ধারের” শ্লেষ সাময়িক হইয়াছে । “অগ্নির-সত্য” নামক প্রবন্ধটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ।

ভারতী - ২৯ বর্ষ শ্রাবণ ১৩১২ । প্রথমেই “আশা” নারী একটা কবিতার আমরা পড়ি-তৃপ্ত হইয়াছি । “চীনদেশে” প্রবন্ধটি লাগিল ভাল । শ্রীযুক্ত জ্যোতিষিজ্ঞ নাথ ঠাকুরের

“মহানাতক” বড় বেশী ভাল লাগিল না।
হানে হানে কবিতা ঞ্চতিকটু হইরাছে।
স্বকবি জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের কবিতা
যদি কোথাও ঞ্চতিকটু লাগে, তাহা হইলে
আম কাহার নিকট আমরা নির্দোষ কবিতা
প্রত্যাশা করিব ?

আজ হ’তে আখ্যায়িক নহেন অগ্রজ মোর
তাঁহা হ’তে হইলাম
স্বতন্ত্র আমি অতঃপর।

কিন্তু তব করস্থিত ওই শর নিরখিয়া
ব্রাহ্মণ্যে অম্লরক্ত
হইল আবার ॥

“স্বতন্ত্র আমি অতঃপর” এবং “ব্রাহ্মণ্যে
অম্লরক্ত” কেমন যেন কাণে খটু করিয়া
লাগে। “সর্বজ্ঞ মিত্র” নামক প্রবন্ধে অশ্রদ্ধা-
স্তোত্র গ্রন্থের রচয়িতার আবির্ভাবকাল নির্ণয়
করিতে চেষ্টা করা হইরাছে এবং খৃষ্টির
অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরে তান্ত্রিক ধর্মের
কিরূপ প্রবলতা ছিল, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা
করা হইরাছে মাত্র। । শ্রীযুক্ত অমৃতলাল
বসু মহাশয় “বরের কথা” লিখিতেছেন।
তাহা বেশ সরল সুলভ এবং বোম্ভা মহা-
শয়ের পরিণত বয়সের স্বভাবের রসিকতা
সম্বিত। ধর্মতান্ত্রিক “থকিপোথাকা” খালা
দেখিয়া গ্রাম চাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এখন
তো খালা ঢাকা আছে, পরে কি হইবে জানি

না। “একথা অনেক” নামক প্রবন্ধটিতে
মহানানবীষ মহাশয় Protoplasm theory
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার
এরূপ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ পাঠোপযোগী। আর
কোথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বা
কবিতা দেখিলাম না।

জানুয়ারী ১ম বর্ষ। আমরা প্রথম হইতে
অষ্টম খণ্ড অবধি পাইয়াছি। প্রত্যেক খণ্ডের
স্বতন্ত্রভাবে সমালোচনার স্থানান্তর বলিয়া
কয়েকটা উচ্চ প্রবন্ধাদির উল্লেখ করিয়া
ক্ষান্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর “লক্ষ্মী-
ভ্রমণ” নামক প্রবন্ধটি বড় ভাল লাগিল।
ইহাতে কিছুই নাই অগচ্চ সব আছে। জলধর
বাবু শূন্য হাঁড়ীতে পাত পাড়িতে চিরকালই
সিদ্ধহস্ত। “রামায়ণে গার্হস্থ্য ধর্ম” বেশ
ভালই লাগিল। “ছদ্মবেশী” সবধে এখন
কিছুই বলা গেল না, কারণ উহা অসম্পূর্ণ।
শ্রীযুক্ত দেবেশনাথ সেন যে অপূর্ণ
“নৈবেদ্য” দিয়াছেন, তাহা নানা প্রকার
অসময়ের স্মৃতি ফলে সজ্জিত। শ্রীযুক্ত
বীরেশ্বর পাণ্ডে মহাশয়ের প্রবন্ধটি অতি
সুলভ এবং সারগর্ভ। হাতকসে মিঃ ডিঃ
এল, রায় সবার চেয়ে সুলভ বলিয়া তাঁহার
“সবার চেয়ে সুলভী কে” সুলভ হইরাছে।
“দযীচি” কবিতাটি ক্ষীরোদ বাবুর স্বভাব-
সিদ্ধ সুলভ লেখনীর পরিচায়ক। “ঐক-
জীবের সঙ্গ” — হরিশাধন বাবু যোগল ইতি-

হাসে চিরকালই দক। “আবুস্তির উপ-
যোগিতা” লাগিল ভাল। আবুস্তির হারাগজে
রক্ষিত মহাশয়ের “বিধির বিধান” সবকে
বলিবার কিছুই নাই।

কোহিনুর মৈশাখ—আবাড়। বৈশাখের
কোহিনুরে “উপধি বিতরণ মতঃ ও লডকর্জন
নামক প্রথম ব্যতীত উল্লেখ যোগ্য আর
কিছুই নাই। মৈশাখ সংখ্যার ত্রয়োদশ
যোগাঙ্গল হক সাহেবের “সৌন্দর্যমান বাবুর”
ও ব্যারিটার চন্দ্র বাবুর আত্ম সমালোচনা
নামক প্রবন্ধের প্রথমার্ধ। “আবাহন”
নামক কবিতাটি রবীন্দ্রসাহেব রচিত হইলেও
পঞ্চদশ হইরাছে একরূপ কবিতা পড়িয়া পড়িয়া
আমরা নাহে হাল হইরাছি। আবাড় সংখ্যা
অপেক্ষাকৃত উত্তম; আরো বাবুর প্রাচ্য ও
প্রতীচ্য দর্শন নামক প্রবন্ধ অভিনয় চিন্তা-
শীলতার চিত্র বিদ্যমান—লেখক চিরজীবী
হইরা বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করুন।
বঙ্গ ভাগবাসি কবিতা আধুনিক আবহাওয়া
প্রসূত ভাল লাগিল না, জীবন্ত বাবুর আদব
কার্য্য মন্দ নহে। “আমাদের সমাজ”
অনেকটা আমাদের সমাজের মত। প্ৰেমে
কবিতা মন্দ নহে। কবিতা জুজের প্রথম
হুইটী কবিতা; বেশ মধুর—লেখ সাহেবের শেষ
হুইটী ভাল লাগিল না—উহার কবিতা না
কবিতা মোটের উপর কোহিনুরের পরি-
চালন মন্দ হইতেছে না, সুন্দরমানসের লক্ষ-

ভাবানুরাগ দর্শনে আমরা অভিনয় প্রীত হই-
লাম, এতদিন কোহিনুরের ছাপা কাগজ
ভাল আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

মাসিক মন্তব্য ।

ষ্টারথিয়েটার। কয়েকটা বন্ধ কর্তৃক
অনুরুদ্ধ হইয়া আমরা রাণা প্রতাপের তৃতীয়
অভিনয় রজনী সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।
অমৃতলাল বসু শঙ্কুসিংহের ভূমিকায় অব-
তীর্ণ হইয়া সাধারণের প্রীতি উৎপাদন
করেন। অভিনয় অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গীত
সুন্দর হইরাছিল, দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা
সমস্তই সুন্দর ও রচিতমত। তবে শেষ অঙ্কে
পুত্র হত্যার প্রতাপসিংহের হস্তে “বন্দুক”
দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম—ভরসা করি
অমৃত বাবু বন্দুকের পরিবর্তে “খর্বা” ব্যবহার
করিয়া এই লোথটুকু পরিহার করিবেন।
প্রতাপ, শঙ্কু, মেহেরউদ্দিনা, দৌলতউদ্দিনা
মানসিংহ পৃথিয়াজ প্রভৃতির অভিনয় অতি
সুন্দর ও স্বাভাবিক আমরা ষ্টার থিয়েটার
অভিনয় চাফুধ্যে প্রীত হইরাছি। পুত্রক
সবকে হই এক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল—
বাল্যস্মৃতি সমালোচনা করা হইবে।

আলোচনা।

“মস্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।”

নবম বর্ষ । } ভাদ্র, সন ১৩১২ । { পঞ্চম সংখ্যা ।

নিবেদন ।

বিগত বৈশাখমাস হইতে আমরা অনেকগুলি মাসিক পত্রিকার সহিত বিনিময়ার্থ পত্রিকা প্রেরণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু ২১৩ খ্রিঃ পত্রিকা ব্যতীত কেহই নিয়মমত বিনিময় প্রদান করিতেছেন না। অনেকে হরত আমাদেব পত্রিকার স্বল্পমূল্য বলিয়া বিনিময় প্রদানে মনোযোগ করেন নাই, তাঁহাদের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁহারা যেন স্বরণ রাখেন মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য সাহিত্য প্রচার ও তদর্থ সাহায্য করা, কেবল অর্থলোলুপতাই পত্রিকা প্রকাশের পরমোদ্দেশ্য নহে। প্রায় নয়বৎসর অতীত হইল, “সাহিত্যের উন্নতি কল্পে এই সমিতি স্থাপন করিয়াছি, অতঃপর মাসিক সম্পাদক ও প্রকাশক মহাশয়গণের নিকট আমাদের এই ভিক্ষা যে আমাদের সছুদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারা যেন হাওড়ার এই একমাত্র পত্রিকার সহিত বিনিময় প্রদানে কৃতিত্ব না করেন।

সম্পাদক।

বিশ্বামিত্র ।

বিশ্বামিত্র বৈদিক গগনের বিরাট গ্রহ। একদিন ইহার ত্তেজে ভারতভূমি বিভাসিত হইয়াছিল;—ইন্দ্রাদি দেবতাও তদ্ব্যপায় ছিলেন। অদম্য অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক অভিনিবেশ দ্বারা মানব যে অসাধ্যসাধন করিতে পারে, মহাবীর বিশ্বামিত্রের পবিজ চরিত তাহার প্রদীপ্ত প্রমাণ। বীর অমাত্য-বিক বীরহে তিনি সেই আদিম আৰ্য্যসমাজে যে প্রচণ্ড তেজ প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা ভারতে একটা যুগান্তর সংঘটিত হইয়াছিল।

বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবের বহু বৎসর পূর্বে মহর্ষি চ্যাবন একদা রাজা কুশিককে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ভীষণ বিরোধ, এবং তাহা হইতে কুলসত্ত্ব উপস্থিত হইবে। মহাবীর বিশ্বামিত্র সেই ভয়াবহ সংঘর্ষ হইতে উদ্ধৃত অসম্ভব অনল। এই অনল দ্বারা তদানীন্তন আৰ্য্যসমাজের কুলস্কারগণি দগ্ধ হইয়া এক অপূর্ণ পবিজ সংস্কারের সূচনা

হইয়াছিল। কি কারণে সেই ঘোর বিরোধ সংঘটিত হয় এবং কিরূপে তাহা বিশ্বাসিত্রের চরিত্রাফুরণে সহায়তা করিয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনার প্রবৃত্ত হইব। যে সময়ে ভারতে বর্ণভেদ প্রথা দৃঢ়ীভূত হয় নাই; ব্রাহ্মণ যে সময়ে ক্ষত্রিয়ের সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিত এবং ব্রাহ্মণের স্বত্ব সম্বলে অধিকার করিতে ক্ষত্রিয়েরা চেষ্টিত হইত; সেই ভীষণ সমাজবিপ্লবকালে ভারতে নানাস্থানকার অশান্তি ও উপদ্রবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ব্রাহ্মণি বশিষ্ঠ ও ঠাকুর সেই সামাজিক বিপ্লবের প্রচণ্ড লোভ নিবর্তিত করিয়া সমাজে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠের জীবনীতে এই সকল বিষয় সযত্নে বর্ণিত হইবে। সেই ভীষণ সামাজিক বিপ্লবকালে ক্ষত্রিয়বল এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল যে, তাহার তেজে এক একটা ব্রাহ্মণবংশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মহাবীর পরশুরাম সেই প্রলয়ঙ্কর প্রচণ্ড ক্ষত্র-তেজ দমিত করিয়া সমাজে সাম্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্ষত্রিয়-গণ একদা কতদূর শত্রুতা করিয়াছিল, একটি উদাহরণ দ্বারা তাহা বিশদ করিবার চেষ্টা করা বাইতেছে। অতি প্রাচীনকালে কৃত-কীৰ্ত্তনাবে কোন প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। বৈদ্যক ভৃগুসন্তানগণ তাহার পুরোহিত। পার্শ্ববর্তী কৃতকীৰ্ত্তন সোমবাগ সমাপনাতে

অগ্রভুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিপুল ধনদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই রাজা স্বর্গারোহণ করিলে তদ্বংশীয় নৃপতিগণের অর্থ প্রয়োজন হইল। তাহার ধনের অবশেষে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং ভার্গবদিগের বিপুল ধন আছে জানিতে পারিয়া তাহাদিগের নিকট আগমন পূর্ব্বক ধন বাচক্ষ্য করিলেন। ভার্গবেরা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ধনরক্ষণ মানসে সমস্ত অর্থ ভূমি-মধ্যে প্রোথিত করিলেন; কেহ কেহ ক্ষত্রিয় হইতে ভীত হইয়া ধনসম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন; কেহ বা উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই সকল ক্ষত্রিয়দিগকে তাহাদের অভিলাষমত ধনদান করিতে বাধ্য হইলেন। অনন্তর কোন ক্ষত্রিয় যদৃচ্ছাক্রমে ভার্গবগৃহে ধনন করিতে করিতে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইল। তাহাতে তাহাদের লোভ দিগ্ধ হইয়া উঠিল এবং সকলে মিলিত হইয়া বিষম ক্রোধসহকারে নিশিত শরদ্বারা ভার্গবদিগকে সংহার করিতে লাগিল, এমন কি ভার্গবদিগের গর্ভস্থ শিশুদিগকেও নষ্ট করিয়া সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ভৃগুকুল উচ্ছাদমান হইলে ভার্গবপত্নীরা ভয়ান্ত হইয়া দুর্গম হিমালয়ে পলায়ন করিলেন। এই একটা সামান্য উপাখ্যান দ্বারা ভদ্রানীতন ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণবিশেষিতা স্পষ্ট

প্রমাণিত হইতেছে। একরূপ ব্রাহ্মণধৰ্মবো অনেকগুলি রাজত্বের বিবরণ মহাভারতাদিতে পাওয়া যায়।

এই সকল নরপতির চরিত্র আলোচনা করিলে ভারতীয় আৰ্য্যসমাজের তদানীন্তন অবস্থা অনেক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে। যে সময়ে ইহার রাজ্য পাগন করিয়াছিলেন, তখন ভারতে বর্ণভেদ প্রথা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণীভূত করিয়াছিল, কিন্তু তখনও তাহা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্তম্ভ হইয়া নাই, তখনও বর্ণভেদ সূচক কোন একটি নির্দিষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। তখন ব্রাহ্মণের আধিপত্য অলঙ্ঘিত ভাবে ধীরে ধীরে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছিল; কিন্তু রাজার সার্বভৌমিকত্বের সামাজ্য ছাড়াও তদানীন্তন রাজত্ব সমাজে পতিত হয় নাই। বস্তুতঃ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বীহারী সমাগরা ধরার অধীশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে, মুসলমান রাজস্বকালীন সামাজ্য সামাজ্য ভূস্বামীর দ্বারা অনতিসমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাঙ্গা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেই সীমাবদ্ধ অনতিবিস্তৃত ভূভাগ শাসন করিয়া তাঁহারা একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। কিসে প্রজাবর্ণ কুশলে থাকে, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, অধর্ম প্রবেশ করিতে না পারে, বেদবিশ্বাসদৈনন্দিক-ব্রাহ্মণগণের তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য

থাকিত। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ মঙ্গলাবস্থানে তাঁহারা ব্যাপৃত থাকিতেন; রাজ্য বহিঃশত্রুগণের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়া কোষদণ্ডাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের সমৃদ্ধীনে সাহায্য করিতেন। রাজাকে সিংহাসনে অভিষেক করিবার সময় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এই বলিয়া শিক্ষা দিতেন; “বাহা কিহু ধর্মসম্বত, তাহাই কস্তাযজ্ঞানে অতন্ত্রিত ভাবে পাগন করিবে; কাম, ক্রোধ, মোহ ও আত্মভিমান দূরে তাগী করিয়া প্রিয়াপ্রিয়ের বিবন্ধ না ভাবিয়া সকল প্রাণীকে সমভাবে রক্ষা করিবে। যে কোন ব্যক্তি ধর্ম হইতে পশ্চি-ক্রষ্ট হইবে, নিজের কর্তব্যে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে বীর বাহুবলে নিগ্রহ করিতে ভুলিও না। ভূদেব ব্রাহ্মণগণ বাহাতে কোনরূপে দণ্ডিত না হইলেন, বাহাতে রাজ্য-মধ্যে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন না হয়, কামনোবাঞ্চে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও।” এই উৎকৃষ্ট উপদেশের উপরই সনাতন রাজ-ধর্ম স্থাপিত; বলিতে কি ইহাই শাস্ত্রী রাজনীতি। ইহার সম্যক অনুসরণ দ্বারা রাজা সর্বাঙ্গীন কলাপ লাভ করেন; অত্যাচার করিলে তাঁহাকে নিশ্চরই বিপর্য্য হইতে হয়। বেদ, নিষ, নত্ব, প্রদান প্রভৃতি নৃপতিগণ ইহার দৃষ্টান্ত। এই সকল রাজ্য ব্যবস্থাপন চরিতার্থ করিবার মানসে প্রজার মঙ্গলে দৃষ্টি না রাখিতে রাজাচ্যুত ও বিনষ্ট হইয়া-

হিলেন, তাঁহাদের এচও ক্ষত্রবল আড়ম্বর-
শূন্য ব্রহ্মভেদের বিবদাহী সুলভ হইতে
তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই ।

সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনু-
সন্ধান করিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, ব্রাহ্মণ-
গণই অক্ষুণ্ণ রাজাদিগকে শাসিত করিয়া
রাজ্যের মঙ্গল নিরন্তর অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা
করিয়াছেন । কিন্তু তাহা বলিয়া ব্রাহ্মণ মাত্রই
যে, “তদ্বৎ অপাপবিদ্ধ”, নিরহঙ্কার, অমৎসর
ও স্বার্থত্যাগী ছিলেন, একদল ঐশ্বর্য বায় না ।
হুঁকীনা ও অলিগর্তের ভায় দান্তিক ও স্বার্থ-
পর ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্তও পৌরাণিক গ্রন্থে
দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু সেরূপ ব্রাহ্মণের
সংখ্যা নিতান্ত অল্প । সে দাহাহউক, বর্ষ-
ভেদ প্রথার ক্ষুর্তি সহকারে ব্রাহ্মণের একাধি-
পত্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ক্রমে ব্রাহ্মণ
একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়া পড়ি-
লেন । যে ব্রাহ্মণ কোন রাজার কৌলিক
গুরু বা পুরোহিত হইলেন, তাঁহার সম্মানগণ
যোগ্য না হইলেও নির্জীবাদে সেই গুরুদাসিত্ব
পূর্ণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রহিলেন । তখন রাজ্য-
বিস্তার ও রাজ্য রক্ষা রাজভগণের প্রধানতম
উদ্দেশ্য ; আভ্যন্তরীণ কোন সামাজিক
খ্যাপায়ে তাঁহারা মনোনিবেশ করিবার অব-
সর পান নাই, অথবা করিতে সাহস করেন
নাই । অগিচ সমাজ তখন সম্পূর্ণ গঠিত হয়
নাই । তখন সমাজের গঠন আরম্ভ হইয়াছে

মাত্র ; ব্রাহ্মণই তাহার স্থপতি । এইরূপে
ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্বদিন দিন বাড়িতে লাগিল ।
যজ্ঞ, পূজা, উপাসনা, সকল ধর্মকর্মেই ব্রাহ্মণ
দিগের একাধিপত্য অসাপেক্ষ হইয়া পড়িল ।
ইহাদের মধ্যে যাহারা যোগ্য, তাঁহাদিগেরই
প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল ; কিন্তু
যাহারা অযোগ্য, তাঁহারাও পিতার ও পিতা-
মহের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রহিলেন ; কেহ
তাঁহাদিগের অধিকারে সামান্য আপত্তিও
উত্থাপন করিল না । এইরূপে গুরু ও পুরো-
হিতের পদ ক্রমে পরম্পরাগ্ৰাপ্ত কৌলিক
স্বরূপে পরিগণিত হইল । তৎকালে একটি
বিষয় ইহাদের স্বার্থসংরক্ষণে বিশেষ সহায়তা
করিয়াছিল । ঋষি, ভৃগু প্রভৃতি একএকটি
ঋষি একএকটি বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের জ্ঞাত ।
সেই মন্ত্ররহস্য তাঁহারা স্বয়ং সম্মানদিগকেই
শিক্ষা দিতেন, অপর কেহ তাহা জানিতে
পারিত না । সুতরাং সেই মন্ত্রপ্রভাবই তাঁহা-
দের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রধান সহায় ।
এইরূপে কোন বিশেষ রাজকুলের পুরোহিত
উপযোগী সকল গুণগ্রামে বিভূষিত না হই-
লেও অনেকে পিতৃ দৃষ্ট মন্ত্রের অধিকারী
থাকিতেন বলিয়া সেই উচ্চপদে নির্জীবাদে
অধিষ্ঠান করিতেন । কিন্তু কোন ক্ষত্রিয় বা
বৈশ্য সম্মান ব্রাহ্মণ যোগ্য অস্ত্রাস্ত্র উৎকৃষ্ট
গুণের অধিকারী হইয়াও ব্রাহ্মণ হইতে পারি-
তেন না । এইরূপে ব্রাহ্মণের পরম্পরাগ্ৰাপ্ত

কৌলিক স্বরূপে পরিগৃহীত হইল এবং ইহার পরিচায়ক ও পরিমাপক গুণাবলী ক্রমে বিধানগ্রন্থের একটি অনাবশ্যক অধ্যায়ে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু অচিরে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়াতে সমাজে প্রচণ্ড বিপ্লবের আবির্ভাব হইল। বীর বিশ্বামিত্র সেই বিপ্লবের নায়ক।

ক্রমশঃ

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায় কবিত্ববর্ণ।

সোণার পারিজাত ।

পুঙ্খম পরিচ্ছেদ ।

নৈহাটী হইতে সাতাইশ মাইল দূরে, গঙ্গাতীরে এক ভগ্ন অট্টালিকা,—নিকটে কোন গ্রাম নাই, জন মানবের বসতি নাই, সেখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে, পূর্বদিকে মল্লিকপুর, দক্ষিণে তিন মাইল, ব্রাহ্মণাল উত্তরে বিনোদনগর, জনশূন্য ভগ্ন অট্টালিকা বহুদিন ধরিয়া সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে,—কেহ সে দিকে কিরিয়াও চাহে না। অট্টালিকার অধিকাংশ গৃহই ভগ্নশীর্ণ; মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘ বট-অশ্বখ জন্মিয়া গিয়াছে, ইষ্টক স্তূপ, আর ভগ্ন স্তম্ভ, কচিং মধ্যে মধ্যে দুই একটা কক, অভয় অবহার আছে, সেই অট্টালিকার আরতন, বহুদূর বিস্তৃত,—অট্টা-

লিকার চারিধারে পরিধা-রেখা তখনও অধিক ছিল, সেই অতীত টেলুগু দর্ভ কবলের মত ভগ্ন ভীর্ণ পরিত্যক্ত অট্টালিকা দেখিয়া কোন পথিক অসুস্থমান করিতেন, ইহা কোন অভূত বলশালী রাজবাড়ী ছিল, মালেকানেরা তাহাদের সর্বস্ব লুটিয়া লইয়া স্বাভা ও রাণীকে গঙ্গাঙ্গেল ডুবায়ে রাখিয়া গিয়াছে, কোন উদীয়মান ঐতিহাসিক বিবেচনা করেন, তা নয়, এই বাড়ীতে এক ঘর বড় জমিদারের বাস ছিল,—বর্গীস তাহাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া গৃহ মধ্যেই মরিয়া রাখিয়া যায়,—মরণের পর এখনও তাহাদের শ্রেতাঙ্গা কাদিয়া কাদিয়া ঐ সকল ভগ্ন গৃহে ঘুরিয়া বেড়ায়।

শেষোক্ত মতই অতিশয় প্রাচ্য হইয়া, সর্বত্র প্রামাণ্য হইয়াছে,—কেননা, মল্লিকপুরের হরিপাল বিনোদনগরের হাট করিয়া যখন গহনার নোকার করিয়া বাড়ী কিরিতেছিল, তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল, অতি করুণস্বরে একটা শ্রেতিনী কাদিয়া কাদিয়া তাহার বাগিত জদয়ের স্বর্ণগাথা দিগন্তের কোলে ভাসাইয়া দিতেছিল। সেই কথা সে বাড়ী গিয়া তাহার জীর সাক্ষাতে বলার, তবে শ্রেতিনীর দৃষ্টিতে তাহার স্বাধীর তবিকা অকল্যাণ আশঙ্কার তাহার জী সে রাজ্যে তাহাকে আহার করিতে দেয় নাই, পরে তৎপর দিবস অতি প্রত্যুষে গিয়া রামগতি

মাথা ঠাকুরকে ডাকিয়া আনিয়া সম্বর পাঁচ আনা পরয়া ও তিন আন্ত হাড়ী দিয়া, এক বাট জল পড়িয়া গইয়া, বামীকে পান করাইয়া তবে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে ।

কৃষ্ণপক্ষের রজনী ঘন ঘোরা, দিকে দিকে বিশ্বপ্রাসী অন্ধকারের বিরাট তুণ ভাসিয়া ভাসিয়া ফিরিতেছে, সেই অন্ধকার রাশির মধ্য দিয়া পথহার পথিকের স্তায় বিশেষ হারা সন্নিবেশ হ হ করিয়া কোন্ হইতে কোন্ দিকে চলিয়া যাইতেছে, অন্ধকশিচক্রে তারকা পরিশুদ্ধ পরে ঘেঘ গুলা আকাশে জড়াজড়ি করিতেছিল,—পক্ষা স্থির হইয়া আকাশের ঘেঘের দিকে চাহিয়া লঘু মৃদু গতিতে বাহিরের অঙ্গগমনে চলিয়া যাইতে ছিল ।

সেই জনমানব শূন্য ভগ্ন অট্টালিকার, ইটক তুণের মধ্য হইতে একপাল শৃগাল উর্দ্ধমুখ করিয়া একবার ভীষণ কোলাহলে ডাকিয়া গেল, কিয়ৎক্ষণ প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া গইয়া অবশেষে স্থির হইল, তাহাদের সেই ভীষণ কোলাহলে, সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যস্থ এক কক্ষে এক যুবতী আগিয়া উঠিয়া বসিল, সে অধিকক্ষণ নিভ্রা যায় নাই—একটু ভয় আসিয়াছিল মাত্র । উঠিয়া বসিয়া চারি দিকে চাহিল,—সমস্ত ভগ্ন কুটীর ব্যাখিয়া ঘোর অন্ধকার জমিয়া ছিল, ব্যাধগৃহ সমা-নীতা পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীর স্তায় সে একবার চকিত চকল চাহনীতে চারিদিকে চাহিয়া

দেখিল, কিন্তু সব অন্ধকার । অন্ধকার ব্যতীত আর কোথাও কিছু দেখিতে পাইল না ।

তাহার নিকট একটি দেশলাইয়ের বাক্স ছিল, তাহা জালিল, নিকটে একটা মৃৎ প্রদীপ ছিল, দেশলাই টানিয়া প্রদীপ জালিয়া গৃহের অন্ধকার বিদূরিত হইল, রমণী যে গৃহে শয়ন করিয়াছিল,—সে গৃহখানির দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতির পরিমাণ কম নহে, কিন্তু অতিশয় জীর্ণ, গৃহের মধ্যে কোথাও ধসিয়া, কোথাও বসিয়া গিয়াছে, গৃহের দরোজার বাহির হইতে শিকলী, এক চাবি দেওয়া, গৃহমধ্যে সামান্য প্রকারের কিছু আহাৰ্য্য ও এক কলসী জল সংস্থিত ছিল, যে গৃহে যুবতী অবস্থান করিতেছিল, তাহার পার্শ্বে আর একটি গৃহ, সে গৃহের সহিত এই গৃহের সংলগ্ন দ্বার উন্মুক্ত,—কিন্তু বাহির হইতে তাহারও দ্বার বন্ধ, ফলকথা ভিতর হইতে এই ছই করে যাতায়াত চলে, কিন্তু বাহির হইবার উপায় নাই, যে গৃহে যুবতী ছিল, সে গৃহখানি অসংস্কৃত ও জীর্ণ হইলেও সেখানে অল্প কোন জঞ্জালাদি ছিল না, কিন্তু অপর গৃহখানি নিতান্ত অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধানিতে পূর্ণ ।

যুবতীর শয্যা একখানি স্থির মাদুর, উপা-খান তাহার স্পৃষ্ট বাহ,—কোনলাজে স্থির মাদুরের দাগগুলি রক্তমুখ হইয়া উঠিয়া গিয়াছে ।

সুবতী উঠিয়া আলো জালিয়া, সেই মাদ্র-
রের উপরে : পা ছড়াইয়া বসিয়া বসিয়া কি
ভাবিতে লাগিল, তাহার দীর্ঘায়ত চক্ষুর
হইতে জলধারা গড়াইয়া ফুলগোলাপবৎ গও-
মূল ভাসাইয়া তুলিতে লাগিল ।

সুবতী যেখানে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে-
ছিল, সহসা তাহার অনুরে মেঝের একটা খস
বারগা হইতে একটা ফুলদেহী ইঁহর এক
টুকরা কাগজমুখে করিয়া লইয়া বোধ হইল,
মেঝের নিম্ন ভূগর্ভ হইতে উঠিয়া কিচির
মিচির করিয়া উঠিল । সুবতী চমকিয়া উঠিয়া
দেখিল একটা ইঁহর—তখনও তাহার দেহাচ্ছ
ভাগ গর্ভে এবং উর্দ্ধাংশ উপরে—সুবতী
ইঁহর দেখিয়া তাড়া দিল, ইঁহরটা মুখের
কাগজ টুকরা কেলিয়া দিয়া, উপরে উঠিয়া
কোণের পথ দিয়া জজালময় অপর গৃহে
চলিয়া গেল, জনমানব পরিত্যক্ত গৃহে এক-
খণ্ড কাগজ কোথা হইতে লইয়া আসিল
তাবিয়া, সুবতী কাগজখণ্ড ছুড়াইয়া আনিয়া
আলোর নিকট লইয়া তাহা পাঠ করিল,
সেই কাগজ খণ্ডের কোণাকুলিতাবে এক
পাশ ইঁহরে কাটিয়া কেলিয়াছে, সমস্ত পাঠ
উদ্ধৃত করিতে পারিল না, যেটুকু লেখা ছিল,
তাহা এই—

***** যদি ভিতরে আসিতে পার,

..... হিনী জানিতে পারিবে,

ভোবারও কি * ত হইবে, আমার জালা

অসীম, * ক তর করিও না। আমি কে
দিন থাকি * তবু পাইবে।—

শ্রীমতী মানদানন্দিনী ।

সুবতী দুই তিনবার পত্রখানি ভাল করিয়া
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল,—শ্রুতঃ ব্রুজিতে
পারিল, তাহা ত্রীলোকের হস্তাকর !

তখন সে ভাবিল, ও কাগজ কোথা
হইতে আসিল, ঐ পাশের গর্তটা দিয়া ইঁহরে
টানিয়া আনিয়া,—ঐ গর্তের মধ্যেই কি
মানদানান্দী কোম ত্রীলোক আমারই মত
পাষগুণের করকবলিত হইয়া আবদ্ধ
আছে ! কিন্তু যেহেতু যেরূপ কঠিন ত্রিত্তিতে
পাঁখা, তাহাতে পাষগুণ উহার মধ্যে মনুষ্য
থাকিবার উপযুক্ত স্থান করিবে কি প্রকারে,
কিন্তু এই প্রাসাদের অন্তঃ কোন গৃহে অথবা
আমার আসিবার পূর্বে এই গৃহে কোন
রমণীকে পাষগুণ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া
ছিল,—হয়ত তাহার নিকটে কালী কলম ও
কাগজ ছিল,—হয়ত সেই-ই একথা লিখিয়া
থাকিবে, তারপরে সে চলিয়া গিয়াছে, অথবা
পাষগুণ তাহার জীবনের অন্ত করিয়া কেলি-
য়াছে ।

সুবতী আবার পত্রখানা লইয়া আলোর
কাছে গেল,—আবার পাঠ করিল, যদি
ভিতরে আসিতে পার, * হিনী জানিতে
পারিবে, “হিনী বোধ হয় কাহিনী হইতে
পারিবে, তখন আবার তাবিল,—এর ভিতরে

মাইতে বলিতেছে,—কিন্তু ভিতর অর্ধে কি, এই প্রাসাদের ভিতর, না ভূগর্ভের ভিতর? সে অনেককণ চিন্তা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইল, যেখান হইতে ইঁদুরটা উঠিয়াছিল, তাহার নিকটে গেল,—চাহিয়া দেখিল একটা স্নড়ক বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। স্নড়কের মধ্যে দুইটা অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিয়া পার্শ্বের টালি ধরিয়া টান দিল, টালিখানা উঠিয়া পড়িল,—তারপরে সে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে, এক খানা মোটা লৌহপাত, তদুপার্শ্বে পাতিত,—খুব জোরে সেখানা ধরিয়া টানিল,—এবার সমচতুর্কোণ চূণ বলির কাজ করা স্নড়ক এবং নামিবার সিঁড়ি—সে তখন ভিতর হইতে গৃহের জরিদিকে খিল বন্ধ করিয়া দিয়া প্রাণপন হস্তে করিয়া সেই সিঁড়ি বহিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। [ক্রমশঃ।

শ্রীস্বরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

অভীভূতের স্মৃতি ।

আরা ।

কর্তব্যের গুরুতার দিকে বহিয়া কিছুদিন আমাকে আরার বাস করিতে হইয়াছিল। ঐ অল্প দিনে আরা সম্বন্ধে বাহা জানিতে পারিয়াছি, আজ তাহাই লিপিবদ্ধ করিব।

আরা কলিকাতা হইতে ৩৬৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা একটা ক্ষুদ্র সহর। আবার প্রান্তভাগে গাঙ্গী নদী (শোননদের খাল) প্রবাহিত। ইহার আরতন অতি ক্ষুদ্র, জলও বর্ষার সময় ভিন্ন অতি অল্পই থাকে। এখান হইতে ডিহিরি অবধি একটা কেনাল বা খাল আছে। এই কেনাল দিয়া টিমারে ডিহিরি বাওয়া যায়। ভাড়াও খুব কম। এই খালের অনতিদূরে জলের কলের রিজার্ভার (Reservoir) রাখা আছে। জলের কল থাকার আরার লোকের কখনও জলের কষ্ট পাইতে হয় না।

আরা আসিবার পথে কইলবারের নিকট (কলিকাতা হইতে ৩৬০ মাইল) শোননদের উপর এক পোল আছে। এই পোলটি (Bridge) ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা ১৮৬২ খৃঃ অব্দে নির্মিত হয়। ইহা ৪,৭২৬ ফিট দীর্ঘ, ইহার উপর দিয়া রেলওয়ে ডবল লাইন ও নিম্ন দিয়া পদব্রজে যাতায়াতের দুইটি রাস্তা আছে। ২৮টি প্রকাণ্ড খামের উপর এই পোলটি অবস্থিত। প্রত্যেক খাম ১৫০ ফিট অন্তরে নদী-গর্ভে ৩২ ফিট প্রোথিত আছে। নদী-বন্ধ হইতে পোলের উচ্চতা ৩৫ ফিট। এই পোলটি দেখিতে অতি সুন্দর। ট্রেনের উপর হইতে ইহার সৌন্দর্য্য কিছুই দেখা যায় না। পোল দেখিতে হইলে কইলবার ষ্টেশনে নামিতে

হয়। পোলেও উপরেই হেসন। ইহা নির্ধারণ করিতে ৪৪,৩৩,৩২৪ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক ফুটে ৯১৭ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ভাইকার্স বয়েল vicars Boyle সাহেবের অক্ষরকীর্তি “আরাহাউস”, টেসনের অনতি দূরে, সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতি স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহি বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী ক্রুরসিংহ আরাম ইংরাজ প্রবাসীদিগকে নৃশংসরূপে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। ভাইকার্স বয়েল রেল-ওয়ে ইঞ্জিনিয়ার পূর্বে এ সংবাদ পাঠিয়া “আরাহাউসে” প্রচুর খাদ্য ও পানীয়ের সহিত সাহেবদিগকে আশ্রয় দান করেন এবং প্রাণ-পণে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করেন। দানাপুর হইতে সৈন্ত আসিয়া হতভাগ্যদিগকে রক্ষা করে, উক্ত বাতীর দেওয়ানে অদ্যাপি শুলির দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে একটি সরকারি ও একটি প্রাইভেট এন্ট্রেন্স স্কুল আছে। স্কুলটির অবস্থা মন্দ নহে। পরীক্ষার ফল প্রত্যেক বারের প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। এখানকার জেলে ভাল কন্ডল তৈয়ারী হয়, নিকটবর্তী পল্লীতেও ভাল কন্ডল পাওয়া যায়, দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা।

এখানকার বাতীর প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বসিয়া থাকে। এখানে “ঢেবুয়া” (গোরক্ষ-পুরী পরসার) চণন বেণী। পরসাকে ইংগা

পাই বলে, ঢেবুয়া এক আনিয় ৭টা পাওয়া যায়। আমরা প্রথম প্রথম এক পরসার জিনিস কিনিয়া পাঠ দিয়া আসিতাম, হিন্দি ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকায় মধ্যে মধ্যে বড়ই ভুলিতে হইত। একদিনের কথা শুনিগেই পাঠক বৃত্তিতে পারিবে। হিন্দি না জানিলেও হিন্দি বলিবার শ্রম সক ছিল। একদিন চাকরকে ২টা পাঠ দিয়া একটা লাউ আনিতে বলিয়া ছিলাম, তখন জানিতাম না যে লাউ কে “কটুয়া” বলে। লাউয়ের হিন্দি “লাউয়া” করিয়া লইয়াছিলাম। চাকর বেচাণের দোষ কি, সে এক নাপিত আনিয়া হাজির করিয়াছিল। তখন কি আর জানিতাম সে নাপিত কে “লাউয়া” বলে। সে অবধি হিন্দি বলার সকল সময় অনেক কমিয়াছিল।

এখানে উচ্চশ্রমী মহারাজ বিক্রমানিত্যোবংশধর ভূমণ্ড ও একটি বাটী ও একটি উদ্যান আছে। এট বাটীতে মহারাজের কর্মচারীরা বাস করেন, শুনিয়াছি পূর্বে মহারাজ মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করিতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজ ঈংরাজ বাগানের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিয়া রাজত্বকিয় পরিচয় দিয়াছিলেন।

এখানে অনেকগুলি বাঙ্গালি বাসিন্দা আছেন, অনেককে তাওয়া পরিদর্শনের অন্তও

এখানে আসিয়া থাকেন। স্থানটি বেশ হাজার, এখানে জজ ও মাজিস্ট্রেটের কাছারি
বাস্যকর। আরার লোক সংখ্যা ৪৬,২০০ এবং দাতব্য হাসপাতাল আছে।

শ্রীশ্রুতেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রীতি-আবাহন।

১

সুশুপ্তি-সিঙ্গুর জলে ডুবিয়া মেদিনী,—

আগত যামিনী !

পুলকে খুলিল অঁধি কুসুম-কামিনী !

কুঞ্জ-বিনোদিনী !

ছড়া'রে জোছনা-ধারা, করি বিশ্ব মাতোয়ারা,

হাসিছে চন্দ্রমা, পাশে প্রেমসী রোহিণী,

একল তটিনী !

২

নীরবে সন্ধ্যার সনে প্রীতি সম্ভাষণ

করিছে পবন ;

ধেরিছে প্রকৃতি-প্রেম-মন্দির-নয়ন

প্রীতির স্বপন !

মরি কি শাস্তির ছায়া, জুড়াইয়া শ্রান্তকারা।

মধুরে মধুরে করে প্রীতি-বিলেপন,—

মৃদু পরশন !

৩

এ সুখ সন্ধ্যার প্রিয়ে—কল্পনে আমার

এস একবার !

নাচিয়া উঠুক স্বপ্নি, পরশে তোমার,—

প্রেম-পরাধার !

স্বর্গীর বীণার তান, মোহিত করুক শ্রাণ,
দূরে থাক্ হৃদয়ের তীব্র হাহাকার,—
বিষাদ-আধার !

৪

এস এ বিচ্ছিন্ন হৃদে স্বর্ণ-লতিকা,—
অরণ্য বাসিকা !
ধরিয়া সোণার করে, হে অভিসারিকা,
মেমের তুলিকা !

মুক্ত প্রাণে গুপ্ত ছবি, আঁক'রে প্রাণের কবি,
ফুটিয়া উঠুক কুঞ্জে অমুঠে কলিকা,—
মালতী, মল্লিকা !

৫

এস লো অতীত-স্মৃতি অঞ্চলে বাধিয়া,
বিশ্ব আলিঙ্গিয়া,
কবিতার পুষ্পে পুষ্পে সোহাগে সিঞ্চিয়া
হ্রিদিব-অমিয়া !

বিরহে বিবশ অঙ্গ, স্রোতস্বিনী নিস্তব্ধ,
অদম্য আনন্দে পুনঃ উঠুক নাচিয়া,
হৃদি তরঙ্গিয়া !

৬

আজি এ বর্ষণ-ঘন,—অমুতা কল্পন,—
সঘন শ্রাবণ ;
উদ্দীপিত সৌধামিনী, বিটঙ্গী নর্তন,—
জীমুত গর্জন !

উদ্দাম ঝটিকা ঘোর, বিষাদ-নীলিমা-লোর,
থাকুক সে ভীষণতা করি আবরণ,
বাহিত রসণ !

বসন্ত--বিলাস--কুহ-সুখচি--অপন

হেঁকক নয়ন,

সুখ অবনির কোণে লভুক শয়ন

ধিরহ-তপন !

সপুলিন-সঙ্ঘা-কূলে, নীরবে বিটপী মূলে,

এস দৌহে করি পুত প্রীতি-উদ্বোধন, —

ঢালিয়া চুখন !

৮

“হউক অনন্ত গর্ভে মঙ্গল স্বকল্যাণ,—

ব্রত-অস্থিষ্ঠান !

হউক বিস্ত ৭ বিস্তে ব্যাপ্ত অপমান,—

দ্রুত-আহ্বান !

অগতের চক্ষুগুলি, দেখুক আপনা ভূমি”

তোমার আমার ব্রতে নিত্য বহমান,—

কি নীতি মহান !

৯

সাধনার শেষ সীমা——সিদ্ধ সন্মিলন,—

অনন্ত গগন !

কর্তব্য-সুখতি-প্রাণে সুরিবে ভুবন,—

নন্দন-কানন !

নিম্নলিখিত ছ’টি অংশি, অনিমিষে চেয়ে থাকি,

অনন্ত অগৎ-বক্ষে হেরিবে তখন,

পুণ্য-দরশন !

শ্রী অটলবিহারী দাস ।

কে তুমি ললনা ?

(১)

স্বরগের শোভাময়ী কে তুমি ললনা ?
 কেন গো তোমার পানে, চেয়ে থাকি অন্ত মনে,
 তুলে যাই সংসারের জলন্ত-যাতনা ।
 অধমের হঃখহরা কে তুমি ললনা ?

(২)

কুসুম-ভুষণ প'রে কে তুমি ললনা ?
 অভাগার হঃখ দেখে, মুখেতে অমির মেখে,
 এসেছ কি পুরাইতে অতৃপ্ত বাসনা ।
 অভাগার পাছে ফের কে তুমি ললনা ?

(৩)

স্বরগের শোভাময়ী কে তুমি ললনা ?
 হেরিলে তোমার মুখ, মনে পড়ে গত সুখ,
 মনে পড়ে পেরদীর হাসি-মুখ-খানা ।
 অতীতের স্মৃতি তোল কে তুমি ললনা ?

(৪)

কুসুম-ভুষণ প'রে কে তুমি ললনা ?
 কতদিন হলো হার ! অশানের আঙ্গিনায়,
 গিরগিলনে বিসর্জিছি সংসার কামনা ।
 গত-সুখ হৃদে তোল কে তুমি ললনা ?

(৫)

স্বরগের শোভাময়ী কে তুমি ললনা ?
 দিওনা হৃদয়ে ব্যথা, তুলোনা অতীত কথা,
 বাজাও না হৃদয়ের ছিন্ন-তন্ত্রী-বীণা ।
 ঐশ-ভোলা বেশে সেজে কে তুমি ললনা ?

আলোচনা ।

(৬)

কুসুম-ভূষণ প'রে কে তুমি ললনা ?
 ভেবেছিছ তুলে যাব, তুলে তারে সুখী হব,
 তুলি তুলি করি আর তোলা হল না।
 হৃদয়ের শাস্তি-হরা কে তুমি ললনা ?

(৭)

স্বরগের শোভাময়ী কে তুমি ললনা ?
 জুড়াতে প্রাণের আলা, বিজনে এসেছি বালা,
 শাস্ত হ'তে দাও দীনে করোনা ছলনা।
 অন্তঃগায় দাও হৃৎকে তুমি ললনা ?

(৮)

কুসুম-ভূষণ প'রে কে তুমি ললনা ?
 যেথা হ'তে এসেছিলে, সেথা তুমি যাও চ'লে,
 প্রেমময়ী-মুক্তি ল'রে আর হেথা থেকে না।
 অধমেরে লক্ষ্যভ্রষ্ট করোনা করোনা।

শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় ।

শেষ ।

সঙ্গীত মিলায়ে গেলে ঘন-বায়ু-স্তরে
 শেষ তানটুকু খেলে স্রতির মন্দিরে।
 যেত তব্ব যুগ্মপুঞ্জ শুক হ'রে গেলে
 স্রমধুর ভ্রাণ তার ভ্রাণেন্দ্রিয়ে খেলে।
 গোলাপ শুকায়ে গেলে 'দল'গুলি তার
 প্রিয়র শয্যায় পড়ি করে হাহাকার।
 তেমনি তোমার স্রুতি তুমি গেলে চলে
 প্রেমের বৃকতে গুয়ে চুমি পড়ে চলে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

সতী-প্রশস্তি । শ্রীযুক্ত যছনাথ চক্রবর্তী
বি, এ প্রণীত। কবি ভূমিকার বলিয়াছেন
যে—“এই পুস্তকে সতী রমণীর পারলৌকিক
অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার উপাদান
প্রধানতঃ আমাদের পরম পবিত্র হিন্দু শাস্ত্র
হইতে গৃহীত”—কিন্তু আমরা স্থানে স্থানে
ইউরোপীয় কবি Dante-এর “ডিভাইনা
কমেডিয়া” নামক গ্রন্থের স্বেয়ং ছায়া মাত্র।
যছনাথ বাবুর কবিতাগুলি বেশ প্রতিমধুর
হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে কবিতার ভাব
অতি সুন্দর হইয়াছে। একটু উদ্ধৃত করিয়া
দিলাম—

“মরণে কেবল প্রেম সুবর্ণের
নিকষ-পাখাণ এই অগতের !

মরণের সনে নর-সুদরের

কাম-বলিদান প্রেমের যুগে ;

* * *

যছনাথ বাবুর “কয়েকখানি পত্র”
নামক আরও একখানি পুস্তক আমরা পাট
রাছি। পুস্তকখানি ত্রীপাঠ্য এবং রমণীকুলের
সম্পূর্ণ শিরোমণি।

যমুনা । আষাঢ়, খ্রীঃ— স্বাক্ষরিত “উষার
বপ্ন” কবিতা মন্দ নহে। অতিমান একটি
চলন সহি গম, নূতনত্ব কিছুই নাই। বাশরী
বাজাইতে গিয়া লেখিকা যা’ত’ বাজাইয়াছেন
এ বাজনা অনেকবার শোনা হইয়াছে।
বিচারমালা ক্রমশঃ প্রকাশিত। “কুসুম মধুপ
বার্তা” ঠিক বৃকোদর বধ কাব্যের স্তায় সু-
ললিত। কবিতাদেবী একেত কলেজের ছাত্র-
গণের স্তায় জ্ঞানীয় বাতিবান্ড হইয়া পড়িয়া-
ছেন, তাহার উপর ডাক্তারকুল যদি তাহার
অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেন, তবে তাহার জীবন
সংশয় হইয়া উঠে। নিম্নাধিনীর প্রতি
shellyr To night নামক কবিতার অল্পবাদ
মন্দ হয় নাই লেখকের হাত ভাল তবে অতি
literal অল্পবাদ ভাল নয়; “মদ্যমেরে” একটি
পাগলামী বা জ্যাঠামি কাগজের উপর এসব
কেন ? প্রণয়ে প্রারম্ভিত গল্প। গল্পটিতে
অশ্লীলতা দোষ না থাকিলে বড় সুন্দর হইত।
মোটের উপর যমুনার সুপাঠ্য প্রবন্ধের বড়
অভাব।

প্রাণ। এটবারে পূর্ণ বাবুর আত্ম-
সাহিত্যে অভিলাষ ভিন্ন আর কিছুই ভাল
লাগিল না, পূর্ণ বাবুর লেখার আগাগোড়া
চিন্তাশীলতা বিদ্যমান, হঠাৎদের নীলার কি
অকাল মৃত্যু হইল ? মোটের উপর যমুনার
পরিচালন ভাল হইতেছে না।

উষা। আষাঢ় প্রাণ। বাঁক বৃক্ষের

জ্ঞাত প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। পরিচালক-
গণ ছাপা কাগজের প্রতি বৈরুপ দৃষ্টি রাখিয়া-
ছেন, প্রবন্ধের প্রতি একরূপ দৃষ্টি রাখা তাঁহা-
দের কর্তব্য। প্রাথমিকমতে “আত্মদান” ও
আগাফ মাসে “খোকা” উভয় মধ্যে একটু
ভাল। একরূপ পত্রিকা সমালোচনা করাও
বিড়ম্বনা জনক। এই পত্রিকার আমরা প্রচুর
বাল-পাঠ্য প্রবন্ধ দেখিতে ইচ্ছা করি।

প্রবাহ। ভাজ। আজগালকার মাসিক
পত্রিকার মধ্যে প্রবাহ একখানি সর্বোৎকৃষ্ট
পত্রিকা। এবারকার প্রবন্ধ কর্তাই আশ-
বের ভাল লাগিল, তন্মধ্যে দানোদর বাবুর
“অগ্নির সত্য” সর্বোৎকৃষ্ট। এইবারে অতি-
রাম যে বল বাজাইয়াছেন, তাহা বড় মধুর
জাহার প্রতিদিকণে ওতাদী বিদ্যমান। অতি-
বাদন বড় কষ্টসাধ্য রচনা একরূপ রচনা কোন
কারণেই প্রবাহে স্থান লাভের যোগ্য নহে।

এক সমালোচনা ।

হোলাবাই । প্রসিদ্ধ ভাবুলবিহার
বিক্রেতা কিশোরীলাল বৈদ্যকর্তৃক প্রকাশিত
ও তাঁহার দোকানের ম্যানেজার বাবু কৃষ্ণা-
নন্দ শর্মা প্রণীত। পুস্তকখানির ছাপা কাগজ
ভাল। লেখক পুস্তকপ্রারম্ভে লিখিয়াছেন
ঐতিহাসিক উপভাস কিন্তু ইহাতে ইতিহাসের
নামগন্ধ নাই, ঐতিহাসিক উপভাস কাহাকে
বলে তাহা বোধ হয় লেখক জানেন না,

এই মধ্যে লেখকের পাণ্ডিত্য যথেষ্ট বিদ্যা-
মান ! কিশোরী বাবু বনী ব্যক্তি, তাই বলিয়া
কি এইরূপে অপব্যয় করে। তবে তাঁহাদের
উদ্দেশ্য সকল হইবে, কাও পাইলে লোকে
একরূপ পুস্তক লইতে কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু
এইরূপ, অত্যাচারে বঙ্গ সাহিত্য মানবের
দুস্ত্রবেশ হইয়া উঠিতেছে।

শোক সংবাদ । বঙ্গবাসী পত্রিকার
সম্পাদিতারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু আর ইহ
অগতে নাই। সকলের মমতাপাশ ছিন্ন
করিয়া তাঁহার নিলিপ্ত আত্মা অস্ত্র করে-
দ্রবস হইল অমরভবনে চলিয়া গিয়াছে।
যোগেন্দ্রবাবু নিজে একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক-
ছিলেন ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রকাশ করিয়া হিন্দু-
ধর্মের পোষকতা করিতেন, ভগবান তাঁহার
পরলোকগত আত্মার মঙ্গল করুন। আমরা
তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পারবারবর্গের সহিত
সহানুভূতি জানাইতেছি। আলোচনার
আমরা তাঁহার জীবনী ও প্রতিমূর্তি প্রকাশ
করিতে বিশেষ চেষ্টা করিব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। পূজা সমাগত দেখিয়া
তাঁড়াতাড়ি বশতঃ ভাঙ্গ সংখ্যা ভিনকর্ণা
পরিবর্তে হই কর্ণা দেওয়া হইল ইহাতে
গ্রাহকগণের ক্ষুব্ধ হইবার কোনও কারণ নাই
কারণ আমরা বৈশাখ আষাঢ়মাসে অর্ধ কর্ণা
হিসাবে এক কর্ণা অভিরিক্ত দিয়াছি।

ম্যানেজার।

আলোচনা।

“মস্তকের সাধন কিম্বা শরীর পতন।”

নবম বর্ষ।

}

আশ্বিন, সন ১৩১২।

}

ষষ্ঠ সংখ্যা

আশা।

শারদোচ্ছ্বাস।

এ জীবন সূর্য্য যবে অস্ত গেল চলি,
হে বঙ্গ জননী মোর, “আর বৎস” বলি,
খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশ দুয়ারে ;
ললাটে চুখন দিলে, শিরের আমার,
জালিলে অনন্ত দীপ। ছিল কণ্ঠে মোর,
একখানি কণ্টকিত কুহুমের ডোর,
সজীবিতের পুরস্কার, তারি ক্ষত জালা,
জদরে জলিতেছিল,—তুলি সেই মালা,
প্রত্যেক কণ্টক তার নিজ হস্তে বাচি,
খুলি তার ধূরে ফেলি শুভমালা গাছি,
গলার পরারে দিবে লইলে বরিয়া,
মোরে, তব চিরন্তন সন্তান করিয়া।
অকণ্ঠে ভরিয়া উঠি খুলিল নয়ন ;
সহসা জাগিয়া দেখি—এ শুধু স্বপন।

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হরষে আনন্দে হাসিছে ধরনী
মধুর সমীরে হরষ মাথা।
প্রাণের হরষে হাসিছে প্রকৃতি
ফুল ফণ তরল তিকা মাথা ॥
নীলাকাশে ভাসি শরতের রংকা
প্রাণের আবেশে জোছনা ঢালে।
মনে হয় যেন এসে প্রাণে প্রাণে
গাহিতেছে গীত আবেশে চলে ॥
উঠ ঐশ্বর্য্যসী মেলচ নয়ন
আসিতেছে আজ আকাঙ্ক্ষার ধন।
জ্বিলোক তারিণী এস মা জননী
নিষ্কলি নিঃশব্দ চঞ্চল চরণ ॥
কি অকুটাবণী মিশিছে সমীরে
জদরে তুলিছে মধুর তান।
স্বপ্নের সাগরে ভাবের লচরে
মাতুরা উঠিছে আমার প্রাণ ॥

সংসার যাতনা দৃষ্ট-খিন্ন প্রাণ

হরষে কেননো পাগল পারা ॥

চির-বিষাদিত হরগো বেজন

সেও ত আজিকে হরষে ভোর ।

জ্বলে যায় সব সংসার যাতনা

হরষে মুছিয়ে নয়ন লোর ॥

“মা আসিছে” বলে বঙ্গবাসী দলে

পরিছে নুতন নবীন সাজ ।

হাসি মাথা মুখে চলে মন সুখে

দেখিতে মারেরে ভুলিয়া লাজ ॥

কেননো আজিকে বিষাদিত চিতে

জ্বলিতেছে এই মধুর ধারা ।

এ হরষ দিনে জেগে ওঠ বীণে

ঝঙ্কারি আমার হৃদয় তারে ।

গাওরে পঞ্চমে দৈবত মধ্যমে

মাতায়ে চৌদিক সুরব পারে ॥

হয়ে হরষিত মারের পূজায়

বিহ্বল পরাণে সবে মিলে গায় ।

এস মন আজি নিয়ে ফুল সাজি

ভক্তভরে সপি মার রাঙাপায় ॥

স্বাভাৱিক ইন্দ্রিয়

দেবী পূজা ।

পরিবর্তনই জগতের নিয়ম । এখানকার কিছুই চিরকাল সমভাবে থাকেনা বলিয়াই ক্রমে ক্রমে সমস্ত বস্তুর পরিবর্তন সত্যটিত হইতেছে, এই নিয়মে কালের পরিবর্তনও অবশ্য-জ্ঞাবী । হেমস্তের পর শীত, শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ । আজি পরিবর্তন-প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় সেই সুখের শরৎকাল সমাগত । বর্ষার সে মেঘ-মলিনতা কাটিয়া গিয়াছে । সুনীল অম্বর লাগিয়াগারে ভাসিতেছে ; শরতের শুভ্র আকাশ আর ঘোর ঘন ষটীজ্ঞান নাই । মেঘ বিনিমুক্ত শরতের

শশধর অম্বর আসনে সমাসীন হইয়া আপন সুবিমল স্নিগ্ধ কিরণ প্রভায় চারিদিক পুলকিত করিতেছে । টাদের হাসির সহিত প্রকৃতির মধুর হাসি বেশ মেলামিশি ভাবে সংমিশ্রিত হইয়া কি যে এক অবাঞ্ছিত, অনির্বাচনীয়, আনন্দময় ভাব পরিফুল্ল করিতেছে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য । প্রকৃতির সে দীনহীন মলিনবেশ আর নাই, আবার যেন সত্যী সন্মীবিভা হইয়াছেন, রাজরাণী বেশ ধারণ করিয়া আবার যেন মহামারীর আবাহন মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছেন, তাই আজ হাটে, বাটে, পথে, মাঠে চারিদিকেই হাসির রাজ্য বিরাজিত, চারিদিকেই সুখের তরঙ্গ প্রবাহ

হিত হইয়া চিরহুঃখী বাঙ্গালীর প্রাণে সুখের
অমির সুখাধারা ঢালিয়া দিতেছে। কান্তারে
কুল ফুটিরাছে; জ্যোৎস্নাবিশোধিত শরদীর
কুসুমরাশি, প্রফুল্লিত হইয়া মাতৃ পুত্রের জন্ত
উঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে, এখন
চারিদিকেই-কুল চারিদিকেই কুসুম রাজ্য
নিষ্পত্ত, বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্য যেন কুণময়,
বিশ্বেশ্বরীর পূজার জন্ত প্রস্তুত। মরি! মরি!
প্রকৃতি স্নন্দরী কেমন মনোরম, অভিনব
সাজে সুসজ্জিতা হইয়া, কুসুম কন্দ শেফা-
লিকা প্রভৃতি নব নব কুসুম ভূষণে বিভূষিতা
হইয়া পরমাপ্রকৃতি আনন্দময়ীর আগমন
প্রতীক্ষায় উদ্গীর্ব হইয়া রহিয়াছে। ভাট
বঙ্গবাসি! এই সময় একবার প্রাণ ভরিয়া,
হৃদয় খুলিয়া নয়ন মেলিয়া প্রকৃতি সন্তীর এই
সামরিক অমূল্য শোভারশি সন্দর্শন করিয়া
দেহ মন প্রাণ ও আত্মার চরিতার্থতা লাভ
কর, এই প্রকৃতি জননীই যে জগত সাম্রাজ্যের
অধিকারিণী, আমরা সকলেই এই জননী
সম্মান, উঁহারই স্নেহময় ক্রোড়ে সকলেই
একত্রে প্রতিপালিত, অতএব উঁহারই সুখে
আমাদের সুখ, উঁহারই দুঃখে আমাদের
দুঃখ। হ্রস্ব বর্ষীয় জননী 'ববাদ ভারাক্রান্তা'
ছিলেন, সম্মানপণেরও কঠোর একশেষ হইয়া-
ছিল। আজ মাতা সুখস্রোতে ভাসমান,
কাজেই তৎক্রোড়ে স্থিত চিরহুঃখী সম্মানপণী
আজ মায়ের সুখে সুখভোগ করিতেছে,

উঁহার হাসিমুখ দেহিরা বিষাদভাব জুলিয়া
আজ হাসা আসে। ইতস্ততঃ বিচরণ করি-
তেছে, আজ প্রকৃতির সৌভাগ্য বিনাশের
সহিত প্রকৃতিপুঞ্জেরও সেই ভাগ্য বিকাশের
স্বপ্নপাত হইয়াছে, আজকাণ যেদিকে বাই,
যেদিকে চাই, সেই দিকেই নব নব ভুবন-
মোহন ভাবের আবির্ভাব দেখিতে পাই, সেই
দিকেই স্বজাতীয় প্রেমের প্রাণভরা আনন্দ
কোলাহল শুনিয়া শ্রবণকুহর পবিত্র করিতে
পারি।

আবার সেই আশ্বিনমাস। আমাদের
সেই আদ্যেই শুভ আশ্বিন সমাগত; শরতের
শুভ আশ্বিনে মাতৃ পূজার সচরী ঘটী আরম্ভ
হইয়াছে। জড়প্রায় নির্জীব বাঙ্গালী আবার
শক্তিমত্ত হইয়াছে; অন্ধ আবার চক্ষুমান
হইয়াছে, দরিদ্র বাঙ্গালী আবার ত্রিদিবের
অধীশ্বরী অগজজননীর দর্শন পাইয়াছে। মহা-
শক্তির মহামন্ত্র বলে আবার তাহাদের চর্ছল
হৃদয়ে প্রভূত বল সঞ্চার হইয়াছে; সকলে
আবার উৎসাহিত হইয়া জননীর বোধন
কার্য্যে প্রাণপণ করিতেছে। বাঙ্গালীর এমন
উৎসব, এমন প্রাণভরা আমোদ আর কোনও
কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন বিশ্ব-
ব্যাপী আনন্দ উৎসব আর কোন পূজার
নাই, ঐ মা—আসিতেছেন, জৈপান কোণ
আলো করিগা আমার মা জৈপানী তারে
আসিতেছেন। দশমসর পরে আবার মায়ের

অকৃতি সন্তানগণকে মনে পড়িয়াছে, মাতৃহারা হইয়া যে আমরা অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতেছি; অন্তর্ধানিনী মা সন্তানগণের সেই কষ্ট অন্তরে অনুভব করিয়া দশভুজ দশ-প্রহরণ ধারণ করতঃ আমাদের সকল দুর্গতি নাশ করিবার জন্য আজ মর্ত্যে আগমন করিতেছেন। মা প্রসন্নময়ি! মা শরণাগত পাণিকে! এই শরণাগত দীনান্ত পতিত সন্তানগণের প্রতি একবার কৃপা দৃষ্টি কর, মা সর্বশক্তি-সম্বিতে! একবার তোমার শক্তিহীন সন্তান গণের প্রতি মুখ তুলিয়া চাও, তাহাদিগকে শক্তিমন্ত কর, তাহাদের দুর্ভাগ্য রূপে বল দাও। মা! বিবেচয়ি! একবার কমললোচনে অপাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া তোমার এই সাদেশ ভারত স্বর্গের প্রীতি বিধান কর। মা! তোমার পবিত্র ভারতে ঐ দেখ দানবের মর্দ-ভেদী অত্যাচার ক্রমঃ বাড়িতেছে, তোমার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ভারতে আজ তোমার প্রিয় পুত্রগণ কুখার সময় খাইতে পার না, পিপাসার সময় জল পায়না, পরিবার তরে কাপড় পায়না, আজ হুতিক দানবের বদন ব্যাদানে তোমার লক্ষীর ভাণ্ডার ভারতের অধিবাসীগণ পরমুখাপেক্ষী, আজ দম্ভা তত্ত্বের ভয়ে তাহারা একান্ত প্রণীড়িত ওস্ত ভীত। মা! দানবের অত্যাচার আর সহ্য হয়না। মা দানবদলনি! তোমার এই অকৃতি সন্তান-গণকে দানব হস্ত হইতে পরিজ্ঞাপ কর। মা

অন্তরে! অন্তর প্রদান করিয়া আমাদের চরিতার্থ কর। পরিজ্ঞাপ-পরায়ণে! মা! পরি-জ্ঞাপ কর, একটু প্রসন্ন ভাব ধারণ করিয়া দেখ মা তোমার স্নেহের সন্তানগণের কি দুর্দশা হইয়াছে, আমাদের দারিদ্র্য হুঃখ নাশ করিতে একবার অন্নপূর্ণা মূর্তিতে ভারতে পদার্পণ কর, আমাদের উদর পুরিয়া চারিটি খাইতে দাও। হুতিক দানব-করে আমরা মর মর জর জর হইয়াছি, আমাদের সর্বনাশ হইতেছে, দেশ উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে, এ সময় তুমি না রাখিলে কে আর রাখবে মা, দেবি! আমরাই মা আৰ্য্য সন্তান, তোমার রক্ষিত দৈববলে বলীয়ান তোমার পুত্রমন্ত্রে মতিমান, তবে মা! আমাদের এ দশা কেন? কেন আমরা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পর প্রত্যাশী হইয়া বসিয়া আছি? জননী বাহাদের ত্রিলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ত্রিলোকী-তল যে জননীর পদাশ্রয়ে সতত আশ্রিত, তাহার সন্তানগণের এত দুর্দশা কিসের জন্য মা! আমাদের উদরে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাগ, ব্যবহারে কোন অস্ত্র নাই, আজ আমরা নিজ দোষে সমস্ত হারাইয়াছি, অসীম শক্তি-মন্ত আৰ্য্য বংশসম্মত হইয়া আজ শক্তি-সামর্থ্য বিহীন, নগণ্য জাতির ভ্রায় একধারে পড়িয়া রহিয়াছি, আজ তোমা হারা হইয়া যে আমাদের এত দুর্গতি, এত অবনতি, এত উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে, আজ আমরা

জীবন্ত হইয়া রহিয়াছি, যদিও বাঙ্গালীর কিছুই নাই, যদিও তাহারা সমস্ত হারাইয়াছে, তথাপি তোমার স্মৃতি, তোমার পবিত্রাদপি পবিত্র স্মৃতি বাঙ্গালী এখনও বিস্তৃত হয় নাই, কত মুগ্ধগান্তর অতীত হইল, কত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া গেল, তবুও তোমার স্মৃতি এখন বাঙ্গালী সমভাবে মনোমন্দিরে পূজা করিয়া থাকে, সেই ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের অন্ত তোমার উপাসনা করিয়া ছিলেন, সঙ্কটে পড়িয়া সঙ্কটনাশিনীর অকাল বোধন করিয়াছিলেন; নীলোৎপলাভাবে আপনার কমল আঁখি উৎপাটন করিতে কৃত-সঙ্কর হইয়াছিলেন, তুমি প্রসন্ন হইয়া অভয়-দানে তক্তের মনোবাসনা পরিপূর্ণ করিয়া ছিলে। সাবর্ণিকে মন্বন্তরে সুরথ রাজা ও সমাধি নামক বৈশ্ণব বাসনা পরিপূর্ণ করিয়া ভক্ত বৎসলা নামের পরিচয় প্রদান করিয়া ছিলে, আমরা শক্তিশীন সামর্থ্যবিহীন হইলেও কি সে স্মৃতি ভুলিতে পারি? শরত সমাগমে শারদীয়ার্চনা বাঙ্গালীর হৃদয় তন্ত্রাতে গ্রথিত, প্রস্তর ফলকে কঠিনরেখা পাথরের ভাষা ইহা চিরকাল সমভাবে রহিয়াছে। তাই বাঙ্গালী প্রতিবৎসর ঠিক এই সময়ে এই স্থানের শরতে চিন্ময়ী মায়ের মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে, হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তির সহিত মাতৃপদে পুষ্পাকলি দিয়া কৃতকৃতার্থ হয়, বাঙ্গালী যখন যে সাকারমূর্ত্তির কল্পনা করিয়া

পূজা করে, তখন সেই মূর্ত্তিই তাহারা সেই বিস্ময়কর ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়াই পূজা করে। পার্থিব উপাদানে গঠিত কাল্পনিক মূর্ত্তি বলিয়া তখন তাহাদের জ্ঞান থাকেনা। হিন্দুর সাকার মূর্ত্তি এইরূপে গঠিত হয়, ইচ্ছাতে কি হিন্দু পৌত্তলিক বলিয়া স্থগিত হইল? তত্ত্ববৎসল ভবান্যাস্যমূর্ত্তি গড়িয়া যদি হিন্দু নিম্ননীর হয় হউক, তাহাতে হিন্দুর গৌরব বাড়িবে বই কমিবে না।

শরতের ঐ আসনে মহামায়ার এ মহা-পূজা অগতে চিরকাল সমভাবে থাকিবে, কেহ ভুলে নাই, কখন ভুলিতে পারিবে না। মা! আমরা পরাধীন উপারবিহীন, তথাপি মা আমরা তোমার আশাতে আশ্বাসিত, তোমার শ্রীচরণ বলে আমরা বলীয়ান। মা! যোগীন্দ্র মোহিনী, আজ তুমি যোগীন্দ্র ভবন পরিত্যাগ করে মুগ্ধপ্রবাহনে মন্তো নগেন্দ্র ভবনে আসি-তেছ। বৎসরান্তে আবার কি তোমার পিতামাতার কণা মনে পড়িয়াছে? মা শৈশব-স্মৃতে! এস মা এস, আপুপিত্রী গণন পুষ্পে সুশোভিতা, বহুকণা শ্রামলা শতসম্পন্ন, প্রকৃতি হাস্যময়ী মা! এত তোমার পুত্রের সময়, বহুদিন মাতৃদারা হইয়া যদিও আমরা বলহীন বিত্তবিহীন মধ্যবিত্তের ক্ষীণতরু হইয়াছি, কিন্তু মা! তোমার আগমনে আমরা আবার উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত শক্তিমত, তোমার পূজা করিতে তোমার প্রসাদ লাভ

করিতে আজ পুনরায় তোমার পাতকী, অকৃতি সন্তানগণ অগ্রসর হইয়াছে। মা! চরণদ্বাণ, ঐ তবারাধা চরণদ্বাণে আমাদিগকে ধৃত কর। আমরা সকল জালা সকল যন্ত্রণার হস্ত চইতে পরিস্কৃত হইয়া জীবন শান্তিময় করি। মা! যদিও আমাদের কিছুই নাই, যদিও আমরা পার্থিব সকল বিঘ্ন চইতে একপ্রকার বঞ্চিত হইয়াছি তথাপি আমাদের পবিত্র হৃদয় ত এখন আছে, এখন ত আমাদের রসনা অবশ হইয়া নাই, এখন সে মা মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে পারে, তাই বলি মা! এস, কৈলাসের মণিমন্দির পরিত্যাগ করে একবার তোমার এই অকৃতি অধম ভক্তগণের হৃদয় মন্দিরে সমাসীন হও, আমাদের অন্ধকার অবসাদযুক্ত হৃদয়মন্দির তোমার খোগীজন নিসেবিত চরণস্পর্শে পবিত্র হউক, অন্ধকার তিরোহিত হউক, আমরা তোমার বাৎসল্য স্নেহের অন্তলতলে নিমজ্জিত হইয়া আপন হারা হই, আমরা আমিভ ভুলিয়া তব তব্ধে মিশিয়া যাই, মা! কে বলে আমাদের উপায় নাই, যখন আমরাই তোমার পার, তখন আমাদের উপায়ও তোমার ঐ রাজাপায়, যে একবার তোমার ঐ চরণরেণুব অণু পার, তাহার ত তৎক্ষণাৎ সকল অন্তপায় ঘুটিয়া যায়, মা! মনে করি পদে পদে তোমার ঐ পদে মতি বির করি, মনে করি আমার মন ভূমকে তোমার ঐ পাদপদ্মের মণুপানে

সত্তত নিয়োজিত করি, কিছ না! সে ত কথা শুনে না, সে ত বাধা মানে না। প্রমত্ত বারণসম আত্মহার্য হইয়া বুধা কাজে ঘুরিয়া বেড়ায়, আমার হইয়া আমার প্রতি সে ফিরিয়াও দেখে না, মা! ঐ দুর্ভাগ্য বারণসম মন-বারণের ভয়ে আমি কল্পিত বড় ভীত হইয়াছি। আর মা! আমার এই হৃদয় স্নান-জনে, কল্পণা কটাক্ষপাতে, অভয় অসিধাতে আমার এ পশুপাশ বিমুক্ত কর, মহিষাসুরের ত্রায় আমার কেশ পাশ আকর্ষণ করিয়া তোমার দেবহুর্ভ ক্রোড়ে টানিয়া লও, মা! তোমার স্নেহ পাশরূপ নাগপাশে আমাকে চিরতরে আবদ্ধ কর, আমি তোমারি বন্ধনে বাঁধা থাকিয়া তোমারই অভয় পদ মস্তকে ধারণ করিয়া, তোমারই ভুবন ভূগানরূপ দর্শন করিতে করিতে তোমারই স্বরূপে আত্ম বিসর্জন দিই মা! আজ তোমার স্নেহের সন্তানগণ বড় আত্মদে, বড় আশার হৃদয় বাঁধরা, বড় গৌরবে বক্ষ উন্নত করিয়া তোমার প্রভীক্ষায় বসিয়া আছে, মা! এক-বার আমাদের এই ঐতাপতপ্ত হৃদয়ে তোমার ঐ দেবহুর্ভ পদযুগল প্রদান কর, শান্তির সুধাধারা ঢালিয়া একবার এই চির তৃপ্তি প্রাণ সুশীতল কর, আমরা যেন তোমার নাম করিয়া তোমাতে মগ্নিয়া এই হুর্ভ মানব জন্ম সকল করিতে পারি। মা! এতদিন বাঙ্গালী, বাঙ্গালী নামের অপব্যোগ ছিল, এত

চেতনাহীন মুর্ছিত অবস্থায় ছিল, এখন
বাঙ্গালীর সে মুর্ছাতক হইরাছে, বাঙ্গালী
পুনরায় উদ্বোধিত হইয়া তোমার উদ্বোধন
মত্রে দীক্ষিত হইরাছে; তাহার। এত দিন
তাই ভাই টাই টাই ছিল, আবার একত্র
মিশিতে শিখিয়াছে, এতদিন পরে তাহারা
একটা বিশিষ্ট জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে
চেষ্টা করিতেছে, স্বদেশের হিত আশে মন
দিরাছে, তাহাদের ভারত মাতার হৃদয়ার
কথা স্মৃতি সমাক্রান্ত হইয়া মর্ম্মখল দগ্ধ করি-
তেছে, ভাই তাহাদের বহুকাল ব্যাপি অসু-
স্থির ঘোর কাটিতেছে, তাহারা জাগরিত
হইরাছে, মা! এইবার তাহাদের মাতৃপূজার
সময় আসিয়াছে, কেবল তুমি অপাঙ্গ দৃষ্টি
করিলেই, তুমি আশীর্বাদ করিলেই তোমার
সন্তানগণের আশা ভরসার মূল সুদৃঢ় হয়,
আমরা মায়ের সেবা করিয়া কৃতার্থ হই। মা!
অভীষ্ট ফলদাতা! আমাদের অভীষ্ট পরিপূর্ণ
কর, আমরা তোমার সেই আরাধ্য শ্রম
সন্তান বলিয়া যেন অগতীতলে পুনরায় আপন
ঐত্ব বিস্তার করিতে পারি।

এস ভাই! শাক্ত, শৈব, গাণপত্য গভূতি
ভক্তগণ! ঐ দেখ আমাদের ভবভরহরা মা
আসিতেছেন। শুধু মুখে প্রতিজ্ঞা করিলে
হইবে না, মুখের কণার শুধু কোন কাজ
হইবে না, এস আজ জননীর নিকট প্রতিজ্ঞা
করিয়া বাহাতে তাঁহার কৃপার আমাদের সেই

প্রতিজ্ঞা চিরস্থায়ী কর, তাহার অত্র অভয়
অস্তর পদে প্রার্থনা করি। বরাভর হস্ত
দেবীকে প্রসন্ন করিবার অস্ত্র এস ভক্তিরে,
ব্যুৎকরে, তারম্বরে বলি,—

শারদীয়া মিমং পূজাং করোমি কমণেশ্বরে।

আজ্ঞাপন্ন মচাদেবি দৈত্যদর্প নিমুহনি ॥

সংসারার্ণব ছুপারে সন্মান্থ বিনাশিনী।

ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে।”

ভাই! আজ আমরা দত্ত বরণা সকল
জাতির অগ্রগণ্য, আজ আমাদের চৈতন্যমিরা-
বৃত্ত মর্ত্যধাম স্বর্গের বিমল বিজয় বিভাসিত,
হৃদয়ের পাঠ অক্ষকার তিরোহিত; এস ভাই!
হৃদয়ের কপাট খুলিয়া, মায়ের জগন্মোহিনী-
মূর্তি তদুপরি স্থাপন করিয়া বলি,—

জয়ং দেহি মহামায়ে অগতশ্চাপরাভিতে।

টেলোকোন্মামিনী কুটি কুংপিপাসাস্তিনাশিনী

ধন্তোহং কৃতকৃত্যোহং সফলং জীবনং মম।

অগতাসি যতো চূর্ণে মতেশ্বরী সদাশ্রয়ে ॥

ভাই! এমন দিন আর চাইবে না। পদ্ম-
পত্র জলবিন্দুৎ এ জীবনের ত স্মৃতি নাই?
এই অস্ত্র সময় থাকিতে তবের সফল তব-
ভাবিনীর ত্রিপদকমল আশ্রয় কর, তাঁহার
শরণাগত হইয়া বল,—

শরণাগত ধীনর্ত্ত পরিজ্ঞানপারমণে।

সর্বগার্ভি হরে দেবী নারায়ণী নমস্ততে ॥

মহমহীনং ক্রিয়াধীনং তক্তিকীনং সুরেশ্বরী।

সংপূজিতঃ নরাদেবি পরিপূর্ণ তদস্ত মে ॥

সম্পাদক।

উন্মাদিনী ।

(১)

বৈশাখ মাস, দিবসের অবসান সময়, প্রকৃতি হাস্যময়ী অন্তর্গামী সূর্য্যের নানরশ্মি ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষশিরে সৌধ মস্তকে অশ্রু লইয়াছে ।

গোপালনগর ও মহম্মদপুর এই দুই গ্রামের মধ্যবর্তী একখানি সুবৃহৎ প্রান্তর, প্রায় ক্রোশাধিক পরিমিত হইবে । প্রান্তরটি বৃক্ষ শূন্য গৃহ শূন্য কেবল চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে, আজকাল এ প্রান্তরে লোক বাতারাতি অতি অল্প, প্রায় নাই বলিলেও হয়, কাল বৈশাখীর ভয়ে বৈকালে কেহ চলেনা, তবে বাহাদুরের না গেলে নয় ; তাঁহারাই কেবল এ পথে বাতারাতি করেন, কিন্তু আজ এই প্রান্তর মধ্যে স্ত্রীমাদুর্গা পরিশোধিত বাপী-তীরে বসিয়া নিরানন্দময়ী একটি রমণীমূর্তি, বয়স প্রায় পঞ্চবিংশতির অধিক হইবে না, দেখিলে উন্নতবংশীয়া বলিয়া বোধ হয়, রমণীর কোলে একটি দুগ্ধপোষা ক্ষুদ্র শিশু, দুই কি তিন মাসের হইবে, শিশুটি রোদন করিতেছে, কিন্তু শিশুটির সে কাতর ক্রন্দন তাহার কর্ণকন্ডে স্থান পায় নাই । রমণী সূর্য্যপানে চাহিয়া আপন মনে কি ভাবিতেছিল তাহার পর হিংসাদৃশ্য নরনে শিশুটির মুখ পানে চাহিয়া আপনাপনি বলিতে লাগিল

“এখনও ইহাকে কোলে করিয়া বসিরাছি, এইখানে ইহার ক্ষুদ্রদেহ সমাধি করিব, সংসারের জঞ্জাল গৃহের আবর্জনা দূর করাই ভাল” । এই বলিয়া বজ্রাঞ্চল হইতে কি বাহির করিয়া শিশুটির ক্ষুদ্র মুখে ঢালিয়া দিয়া স্তনপান করাইতে লাগিল । ক্ষুধার্ত শিশু শান্ত হইল, তৎপর কিয়ৎকণ মধ্যে শিশুটি যেন নিজ্রাঘোরে অবসন্ন হইয়া পড়িল ।

তাহা দেখিয়া রমণী তীব্রকণ্ঠে বলিতে লাগিল, বিষ খরিয়াছে আর রক্ষা নাই, এ নিজ্রা ইহাকে মরণের পথে লইয়া যাইবে ।

দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র শিশুটির প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল, পিশাচী আর হির হইয়া থাকিতে পারিল না, কপোৎপাদেহ সিক্ত করিয়া নয়ন প্রান্ত হইতে দুই বিন্দু উষ্ণ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, পরে মৃত সন্তানের মুখ চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিল, আমার গর্ভের সন্তান তুই, তবুও তোর প্রতি বৈরাগ্য পুত্র দ্বেহ প্রদর্শন করিলাম, জগতে বায়ুতুকই তাহার একমাত্র আদর্শ দেদীপ্যমান, তোর জন্ত আমার প্রাণ কাঁদিতেছে, হৃদয় আকুল হইতেছে, কিন্তু কি করিব বৎস, জনসমাজে তোর স্থান নাই দেখিয়া বিদার দিতেছি । যাও বৎস ! এই পাপ তাপ প্রবঞ্চনাপূর্ণ সংসার ছাড়িয়া, সেই জগৎপাতা জগদীশ্বরের অনন্ত শান্তিরাজ্যে গিয়া কিছুদিন আমার জন্ত অপেক্ষা করিও, আমি আমার কর্তব্য

কৰ্ম সমাপন করিয়া তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিব, এখন আমার বৃক্ প্রতীহিংসার ভীষণ আশুপ অলিতেছে, এ আশুপে আর একটিকে আহতি দিয়া অগ্নি নির্ঝাঁপ করিব, “আর কেন এইবার বাই” বলিয়া রাক্ষসী উঠিল। মৃত শিশুটিকে সেইখানে রাখিয়া গোপাল নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

স্বর্ধাসেব আর এ রাক্ষসী-লীলা দেখিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে সংসারকে অন্ধকার গর্ভে নিমগ্ন করিয়া পশ্চিমাকাশ কোলে অদৃশ হইয়া গেলেন।

(২)

হুলতানপুর একটি গণ্ড গ্রাম। ইহার মধ্যে একটি ছোট খাটো বাজার আছে, প্রতি সপ্তাহে বুধ ও শনিবারে হাট বসে। আজ বাজারের দিন, বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছে, ঐ বাজারের সদর রাস্তার একপাশে একখানি স্থান খড়োঘরের অলিন্দে, বসিয়া একটি উন্মাদিনী ধূলা কাদা মাখিতেছে, উন্মাদিনীর মাথার কুম্ভকেশ, পরিধান একখানি শতগ্রন্থি মলিন বাস, অতি কঠো ও গাঢ় বেটন সজ্জান হয় না। উন্মাদিনী বলিতেছে “আর কতকাল খুঁজিব, কতকাল বৃকের আশুপে অলিয়া পুড়িয়া মরিব, এইত কতদিন কত মাস অতিবাহিত হইয়াছে, ক্রমে দুইটি বৎসরও অতীত সময় গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তবু তাহাকেও খুঁজিয়া পাইলাম না, বৃকের

আশুপও নিবাহিতে পারিলাম না, তবে কি এই তাবে জীবন কাটিবে, আশা অশূৰ্ণ থাকিবে, না নিশ্চয়ই সবগুণা পূর্ণ করিব, আজীবন ধরিয়া সমগ্র সংসার খুঁজিব, যদি না পাই, মৃত্যুর অন্ততেনী সিংহবার পর্যন্ত দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনিব, তাহার পর তাহাকে লইয়া আমার মনের বাসনা পূর্ণ করিব”। কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া উন্মাদিনীর কথা শুনিতেছিল, এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক তাহার সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। উন্মাদিনী সহসা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“শিকান মিলিয়াছে, ইহার জন্ত আমি দেশে দেশে গুরিয়া বেড়াইতেছি, সরতান ! আমার অমূল্য জিনিষ লইয়া আবার ফাঁকি ?” ভদ্রলোকটি দীরঘরে উত্তর করিল, “কে তাঁর কি অমূল্য জিনিষ লইয়া ফাঁকি দিয়াছে।”

এ কথার উন্মাদিনী হো হো করিয়া উঠিল, এ হাসি যেন তাঁহার প্রত্যেক ধমনীর ভিতর কি এক ভীষণ মদিরাস্রোত ছুটাইয়া দিল, বলিল “নুতন প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সব ভুলিয়াছ, মনে কর আমাদের সেই প্রেমের কথা, তাহার পর কলিকাতার কথা, ভদ্রলোকটি উন্মাদিনীকে আর একটি মাত্র কথা বলিবার অবসর দিলেন না, আরক্ত-নয়নে একবার তাহার মুখপানে চাভিয়া সবলে এক পদাঘাত করিলেন, উন্মাদিনী পড়াইয়া

পড়িল, উদ্ভলোকটী সেদিকে আর দৃকপাত না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

(৩)

বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী একখানি গ্রামে হরমোহন চক্রবর্তীর বাস, ইহার অবস্থা আশ্চর্য সচ্ছল কিম্বা দৈন্ত্যভাবাপন্ন ছিলনা, মোটামুটি ভাবে দিন চলিয়া বাইত, তাঁহার মোহিনী নামী এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল, মোহিনীর বয়স যখন নয় বৎসর, সেই সময়ে হরমোহন অর্থ প্রত্যাশায় কন্যাকে একটি জরাজীর্ণ পলিতকেশ স্ত্রীরের করে সমর্পণ করেন। বার্ষিক সংসারে সকলেই স্বার্থের অন্ত লালারিত, তাহার উপর আবার পাশ্চাত্য সভ্যতালোকে সুন্দরী কন্যার বাজার কিছু চড়া হইরাছে, তাই তিনি আত্মাই শত রোপ্য মুদ্রা বিনিময়ে সংসারানতিজ হুহিতাকে একটি অশীতিপর বৃদ্ধের করে সমর্পণ করেন, অকৃতজ্ঞ স্বার্থীক হরমোহন কন্যার ভাবী অবস্থারদিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পাইলেন না। হায়! সংসারে এক্রপ করজল দেখেন?

এই বিবাহের পর মোহিনীর বৃদ্ধ স্বামী বন্ধন সংসারের নিকট হইতে অনন্ত দিনের অন্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন মোহিনীর বয়স চতুর্দশ বৎসর মাত্র।

মোহিনীর হাতের শাঁখা খসিলে সীমস্তের সিন্দুর মুছিল, মোহিনী বিধবা সাজিলে, মোহি-

নীর হাসি গেল, কান্না আসিল, শান্তি ঘুটিল অশান্তি আসিয়া হৃদয় ছাইল, আনন্দ গেল, নিয়ানন্দ আসিয়া বসিল।

মা, কন্যার মলিনবেশ দেখিতে না পারিয়া যখন মোহিনীকে জোর করিয়া দুই একখানি অলঙ্কার পরাইয়া দিতেন, রুম্মকেশগুলি তৈলসিক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতেন, তখন মোহিনী বলিত কাহার অন্ত বেষড়বা, কাহার অন্ত সৌন্দর্যের আয়োজন মা, ইহা মায়ের মর্ম্মকোষের উপর কিরূপ আঘাত করিত তাহা জননী মাঝেই বুঝিতে পারিবেন, বাহা ইউক মোহিনী শোক দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিয়া নীরবে আপনার সুদীর্ঘ নীরস দিন গুলা অতিবাহিত করিতে লাগিল।

বর্ষা বার, শরৎ আইসে, প্রকৃতি অভিনব সৌন্দর্যে ভূষিতা হয়; মেঘমুক্ত নির্মলকাশে চাঁদ হাসিয়া উঠে, তাহার কিরণে জগৎ মুগ্ধ হয়, মোহিনীর বালা জীবন কাটিল, যৌবন আসিয়া দেহরাজ্যে একাধিপত্য করিয়া বসিল, মনের অশান্তি তিরোহিত হইল, বালিকা এ হাসিতে অন্ত কেহ সুখী হইল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু পিতামাতার দম্ব হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া কেমন একটি গভীর নীরব নিশ্বাস বহিয়া গেল।

ইহার পর আরও দুইটি বৎসর মাত্র-
যের অজস্র হাসি কান্না সঙ্গে লইয়া অতীতের কোলে গুয়াইয়া পড়িল, মোহিনীর অবস্থাও

কিরিয়া গেল। মোহিনীর আর সে বলিন ভাব নাই, তাহার যতিগতি এখন স্বতন্ত্র পথে গিয়াছে, সে এখন চওড়া কালাপেড়ে কাপড় পরে, প্রত্যেক দিন চুল বাঁধে, দেহের প্রতি সমধিক যত্ন করে, নূতন নূতন অলঙ্কারে আপন শরীর অলঙ্কৃত করে, আর ঘন ঘন তাবুল রাগে ওঠবার রঞ্জিত করে।

মোহিনী তখন বোড়শী, ভাজের তরা গদ্যর স্তায় তাহার কোমল অঙ্গে রূপের তরঙ্গ উছলিয়া উঠিতে লাগিল, ভাণ্ডা বিধাতা উপেক্ষকে সেই তরঙ্গে ভাসিয়া বাইতে স্নিগ্ধ করিলেন, উপেক্ষ ভাসিয়া গেল।

মোহিনীর এত উন্নতি, এ উন্নতির পথ প্রশংসক কে উপেক্ষ? উপেক্ষ জটনৈক সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ সম্ভ্রান্ত, পূর্বে হ তে মোহিনীর উপর উপেক্ষের তীব্র দৃষ্টি পড়িয়া ছিল, সেই জন্ত মোহিনীকে নানা প্রলোভন দেখাইত, কখনও মোহিনীকে হীরক খচিত স্বর্ণালঙ্কার ও রৌপ্যমুদ্রাপূর্ণ বাক্স খুলিয়া অঘরে ইতস্ততঃ নাড়িতে থাকিত, কখন বা সেগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে আপন শয্যার উপর ফেলিয়া রাখিত তাহা দেখিয়া মোহিনী মনে করিত বড়লোকদের বৃদ্ধি এইরূপ পড়িয়া থাকে, উপেক্ষ তাহারই দুই একখানি অলঙ্কার লইয়া তাহার হস্তে অর্পণ করিত, ইহা ভিন্ন যে অর্থ প্রদান না করিত এমন নহে, মোহিনী সহজে লইত না, ক্রমে ইহার যেন কি একটা

সম্মোহিনী শক্তি তাহার কণি মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দিল, তাহা লইতে আর কোন আপত্তি করিত না, গতিক ভাল দেখিয়া উপেক্ষ করনা তুলিতে কত ভবিষ্যৎ মনোরম স্বপ্নের চিত্র আঁকিয়া মোহিনীর নমন সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া ধরিত, সে দৃষ্টে ঐশ্বর্যের বাঁধ একবারে ভাঙ্গিয়া গেল।

মোহিনী আর আশ্বসংঘম করিয়া চলিতে পারিল না, অলঙ্কার মধ্যেই কলঙ্কিনী পাপ সলিলে গা ভাসাইয়া দিল। প্রথমতঃ অতি গোপনে অতি নিঃস্বপ্নে তাহাদের প্রেমাত্মক চর্চা চলিতে লাগিল, কেহ দেখিল না, কেহ জানিতে পারিল না, কিন্তু যত্নের কল আপন বাজিয়া উঠিল, প্রথমে পিতামাতা তাহার পর প্রতিবেশী এইরূপে গ্রামময় রাই হইয়া গেল, এমন কি বৃদ্ধেরা তাহাদিগকে দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করে, যুবক যুবতীরা একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়ায়, বালক বালিকারা টলটল গাহিতে থাকে, সুতরাং লোকের নিকট দৃষ্ট দেখান ভার হইল, পিতামাতা তাহাদিগকে কত তিরস্কার কত লালনা করিল, তবুও তাহাদের কোন চৈতন্য চইল না, কয়েক দিন দিব প্রেমের-বাগদ-প্রীতির শৃঙ্খল দুতর হইতে লাগিল, পরিণামে যখন তাহাদের ঘরের বাহির হওয়া দায় হইল, তখন তাহারা একদিন রজনীগোপে বসেই অর্থ সঙ্গে লইয়া দেখ ছাড়িয়া পলায়ন গেল।

কলিকাতা সহর, সেখানে কে কাহার
ভাষ্য রাখে তাহার। এই জনাকীর্ণ সহরে মনো-
মত্ত একখানি বাটীভাড়া লইয়া একটা ক্ষুদ্র
সংসার পাতিয়া বসিল, কিছুই অত্যা-
বহন না, সব মিলিল, আর কেহ তাহাদের
প্রেমের কণ্টক হইল না, নিরাপদে দিন
কাটিতে লাগিল।

কলিকাতা উপেক্ষকে বড় আদরে রাখিয়া
ছিল, তাহাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিত,
দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, সেই তাহার সুখের
জন্ম আশ্রয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল।

এ সুখ তাহাদের অধিককাল স্থায়ী হইল
না, পৃথিবীর বার্ষিক পতি একবার ঘুরিয়া
আসিতে না আসিতেই সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত
হইয়া গেল, কিন্তু যৌবনের আশা অপূর্ণ
থাকিল, মোহিনী অর্থের জন্য উপেক্ষার উপর
দাবী লইত না, অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া খরচ
যোগাইতে লাগিল। উপেক্ষ মোহিনীর ঐকা-
ন্তিক বয়স ও বুকভরা প্রেম জীবনের করেকটা
মঙ্গল মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিতে ছিল, কিন্তু
সৌন্দর্যের উপাসক, ইন্দ্রিয়ের দাস, উপেক্ষ
আর একের প্রণয়ে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে
পারিল না, সেই প্রেমের সেই স্ত্রীতির বন্ধন
ছিন্ন করিয়া পলাইয়া গেল।

মোহিনীর সব ফুরাইল, জীবনের শেষ
আশা ভরসা সব ফুরাইল, আশা মুকুলিত
মানসোদ্যান উদরকে প্রাণে পরিণত হইল, কল-

নার স্তম্ভ সৌখিনী নিরাশার এক ফুৎ
কারে চুরমার হইয়া গেল।

বিপদের উপর বিপদ ঘটিল, দিনে দিনে
মোহিনীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

উপেক্ষ গিয়াছে, সেই সঙ্গে অলঙ্কারের
বাক্স অন্তর্হিত হইয়াছে, উপেক্ষ মোহিনীকে
যথেষ্ট অলঙ্কার দিয়াছিল, তাহা আর নাই।
কি প্রকারে আহার যোগাইবে তাহার উপর
বাটী ভাড়ার জন্য ঘন ঘন তাগিদা করি-
তেছে, কি করে কোথায় যাব, কুলে কিরি-
বার পক্ষা নাই, উদ্দাম প্রবৃত্তির তাড়নায় ও
লম্পটের কুহকে ভুলিয়া, কলঙ্কের পসরা
মাথায় লইয়া সকলের নিকট হইতে বাহির
হইয়াছে, আর কোন মুখে কুলে কিরিবে,
যাহা হউক অন্ধ্রে যে করেকথানি অলঙ্কার
ছিল তাগাই বিক্রয় করিয়া অমৃত্যুপানীয়ে
অতিথিত শীর্ণ দেহখানি লইয়া অতি কষ্টে
দিন কাটিতে লাগিল।

যশা সময়ে একটা পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ
হইল শিশুটা দুইমাসের হইলে কলিকাতা
সহর ছাড়িয়া গোপালনগর ও মহানন্দ
পুরের মধ্যবর্তী গ্রামে যে কাণ্ড করিয়াছিল
তাহা প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার
পর স্থলতানপুর বাজারে যে উন্মাদিনীর
কথা বলা হইয়াছে, এ সেই মোহিনী এবং যে
ভ্রলোকটী উন্মাদিনীকে পদাঘাত করিয়া-
ছিল এ সেই উপেক্ষ, উপেক্ষ চিনিতে পারিল

হানকাল পাঁজিতেদে আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়া ছিল ।

(৪)

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদা গভীরা বামিনীতে পরিদৃষ্ট হইল সুলতানপুর বাজারের সেই ঘরে আশুন লাগিয়াছে, সকলে অগ্নি নির্বাপন করিতেছে, আর সেই উম্মাদিনী রমণী নাচিয়া বিকট হান্তে বলিতেছে “হো হো প্রতিহিংসার আশুণ কখনই নিতিবে না, আমি বহুতে আলাইয়া দিয়াছি এবং এই সঙ্গে একটাকেও আহুতি দিয়াছি, এতদিনে আমার জীবনের ব্রত উদ্ঘাপিত হইল, আর কেন, এইবার বাই,” উম্মাদিনী আর সেখানে কণকাল অপেক্ষা করিল না, আনন্দে হাত-তালি দিয়া ক্রতবেগে গভীর অন্ধকারে মিশিয়া গেল ।

তাহার পর সকলে অগ্নি নির্বাপন করিয়া মেঘিল ঘরের ভিতর উপেক্ষের জীবন শূন্য অর্ধ-দগ্ধ বিকৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে ।

পরদিন প্রভাতে পরিদৃষ্ট হইল প্রকাশ রাজপথ পার্শ্বে একটা বৃক্ষশাখার উম্মাদিনীর মৃতদেহ সুলিতেছে, উম্মাদিনী উষ্মকনে আত্মহত্যা করিয়া সমস্ত জালা বহুশা শেদ করিয়াছে ।

ত্রিচন্দ্রমোহন দাস ।

সম্রাট হুমায়ুন ।

(৩)

অচিরেই সম্রাট নিরাপদে আগরা-প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন, যুবরাজ হিন্দোলও অল্পের সহ সময়-ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন । ইহার সন্ধ্যা লেই খেলাত প্রাপ্ত সম্মানিত হন । এই উপলক্ষে একটা প্রকাণ্ড জোজের আরোহণ হয় এবং মহা সমারোহে যুবরাজ হিন্দোল উদ্বাহ ক্রিয়া নিশ্চয় হয় । যুবরাজ আকবরিউ তাহার সং স্ত্রীভাণের নিমিত্ত সখল জেলা প্রাপ্ত হন এবং তথা হইতে সমস্ত বিদ্রোহী-দিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য আদিষ্ট হন । এই সময় হুমায়ুন সংবাদ পান যে শের শাঁ আফগান বেহারের ঝারখণ্ড জেলা নিজে অধিকার করিয়া বসিয়াছেন এবং প্রবক্তা করিয়া রোটারের * শক্তিশালী দুর্গ অবরোধ করিয়াছেন । অতঃপর তিনি বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়নগর আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন, খুব সম্ভব অচিরেই তিনি উক্ত নগর অধিকার করিবেন ।

এতৎ সংবাদে সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন,—“এই আকবরের অবাধ্যতা সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে । এখন আমরা বাইরা

উহাদের হস্ত হইতে চুণার লইয়ে ।” তৎপর সন্ধ্যাট ঐ দুর্গ আক্রমণ সম্বন্ধেই ইঞ্জিনিয়ার কর্তী খাঁর (সোলতান বাহাদুর কর্তৃক পরিত্যক্ত) পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে কুমী বলিলেন,—“ভগবান অনুগ্রহ করিলে আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারিব ।”

মোগল-সৈন্য আগরা হইতে যাত্রা করিয়া ২৪৫ হিজরীর (১৫৩৮ খৃঃ অঃ) বেবেয়াত দিনে চুণারের দশ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছাইল। এখানে কুমী খাঁ বিপক্ষদিগের শক্তি ও সৈন্য সংখ্যা দুর্গের কোন্ অংশ আক্রমণ ও কোথার কামান পাতা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় জানার অভিপ্রায়ে তাহার কেণাকত নামক নিম্নোক্তদাসকে একরূপ নির্দিষ্টভাবে প্রহার করেন যে, প্রত্যেক বেতের দাপ তাহার শরীরে স্পন্দিতরূপে ফুলিয়া উঠে। অতঃপর তিনি তাহাকে বিপক্ষ শিবিরে পাঠাইয়া বলিতে বলিয়া দিলেন যে, সে শেষ থাকে যাইয়া বলিবে, সে কুমী খাঁর দাস। তাহার প্রভু বিনা দোষে নির্দিষ্টভাবে তাহাকে প্রহার করার সে তাহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া এখানে কাজ করিতে আসিয়াছে। এইভাবে যদি সে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে, তবে তথাকার সমস্ত বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিলে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইবে।

কেণাকত এই আজ্ঞাধসারে আকগান

শিবিরে যাইয়া নিজের অবস্থা বর্ণন করিলে, আকগানরা তাহাকে কার্যে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়া দুর্গে লইয়া যায় এবং তাহার কতস্থান খোঁজ করতঃ ব্যাণ্ডেল বাঁধিয়া দেয়। ফলাফল তথায় ব্যক্ত করে যে, সে ইঞ্জিনিয়ারী কার্যে বিশেষ পারদর্শী। যদি তাহার অধুমতি করে তবে সে দেখাইয়া দিতে পারে, কোন্ স্থানে কামান পাতিলে শত্রুদলকে সহজে অপদস্থ করা যাইতে পারে এবং কুমী খাঁর আক্রমণ হইতে রক্ষার নিমিত্ত দুর্গের কোন্ স্থান কি ভাবে সুরক্ষিত করা আবশ্যিক তাহাও সে বলিয়া দিবে।

তাহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে, তাহাকে দুর্গ পরীক্ষা করিতে আদেশ করা হয়। * দুই একদিন পরে কেণাকত রজনী যোগে পলারন করিয়া আসিয়া তাহার প্রভুর নিকট বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিল যে, নদীর তীরে সুড়ঙ্গ কাটিয়া তথা হইতে দুর্গ আক্রমণ করা উচিত এবং তৎ পার্শ্ববর্তী স্থান এইভাবে বেঠেন করিতে হইবে যে বাহিরের সহিত তাহার কোনও সংস্রব রাখিতে না পারে।

* টুয়াট বলেন,—“In the year 1763 the English attempted to take Chunar by storm, but were repulsed; it afterwards capitulated,” See Edinbrugh Gazetter,

এই প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রাপ্তে রুমী খাঁ নদীর তীরে বৃহৎ কামানগুলি সাজাইয়া হুর্গের চারিদিকে বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে বিভিন্ন বিভিন্ন সেনাদল রক্ষা করিলেন।

এই সময় মহাম্মদ সোলতান ও অপরাপর বিজ্ঞানী সর্দারগণ আসিয়া সত্ৰাটের নিকট কমা প্রার্থনা করতঃ দলে প্রবেশ লাভের অনুমতি প্রার্থনা করিল। সত্ৰাট তাহাদিগকে কমা করিয়া দলে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন।

রুমী খাঁ দেখিলেন নদীর তীরে এখন উপযুক্ত স্থান নাই যেখান হইতে কামান লাগিয়া হুর্গের ভিতরের কোনও অনিষ্ট সাধন করা বাইতে পারে। তজ্জন্ত নদীর উপর কাঠের মঞ্চ করিয়া কামান পতিবার জন্ত সত্ৰাটের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহাই করিতে সত্ৰাট আদেশ করিলেন। তদনুসারে তিনি তিনখানি নৌকা একত্র করতঃ তদুপরি একটি মঞ্চ নির্মাণ করিলেন। এইভাবে প্রস্তুত হইতে করেক মাস কাটিয়া গেল। পরে ঐ ভাসমান মঞ্চ রজনী যোগে আক্রমণ শিবিরের নিকট আনিয়া, হুর্গ আক্রমণের আদেশ বিধোষিত হইল। কিন্তু বিপক্ষগণ এমনভাবে বহির্ভাগ রক্ষা করিয়াছিল যে এই আক্রমণে তাহাদের কোন অনিষ্টই হইল না। সত্ৰাটের ভাসমান ব্যাটারি বিধ্বস্ত হইল এবং

সাত শত যোগল-সৈন্য হুর্গের একটুমাত্র অনিষ্ট করিয়াই মহানিস্রায় অতিক্রান্ত হইল।

পরদিবস ভাসমান ব্যাটারি মেসারভের নিমিত্ত মিস্ত্রি নিযুক্ত হইল। অবলম্ব্যকারীগণ দেখিল যে, সত্ৰাট হুর্গ অধিকার করিতে একান্তই মনঃস্থ হইয়াছেন এবং তাহাদের সাহায্য গ্রাণ্ডির পথও নাই। কাজেই তাহারা জীবনের অনিষ্ট হইবে না এই সত্ত্বে আত্ম সমর্পণ করিতে সন্মত হইল।

এইভাবে হুর্গ অধিকৃত হইলে, রুমী খাঁ বন্দীগণের মধ্য হইতে তিনশত যোদ্ধা বাছিয়া তাহাদের হস্ত কাটিয়া কেলিবার আদেশ দিলেন। সত্ৰাট এই আদেশে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলেন যে, তাহারা জীবন নষ্ট হইবে না এই আশ্বাস পাইয়া আত্ম সমর্পণ করিয়াছে এখন এইভাবে তাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করা অতি অবৈধ ও ঘৃণিত কার্য।

এই প্রধান হুর্গ অধিকার করিয়া সত্ৰাট একটি বৃহৎ খানার আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে প্রচুর আমোদ প্রমোদ ও বিলাস-সাগরের সুরারাস ছুটে। কক্ষগারীগণের পক্ষো-রতি ও সর্দারগণ খেলাত প্রাপ্ত হন।

অতঃপর সত্ৰাট রুমী খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি ভাবে এই হুর্গ রক্ষা করিতে হইবে এবং কাহার উপর? বা সেই ভায় অর্পণ করা যায়। রুমী বলিলেন যে, বেগ শীরেক বাতীত দলের অন্য কোনও ব্যক্তির

উপর এ কার্যের ভারার্ণ করা যাইতে পারে না । ভবনস্বারে মন্দিরটী মীরকেকে দুর্গাধিপতি স্বরূপ নিযুক্ত করেন । কিন্তু অন্যান্য সর্দারগণ কবী খাঁর এই বিক্রম ভাবের উপদেশ মানের জন্য এমনি অসন্তুষ্ট হন যে, অচিরেই কবীর খাঁদের মধ্যে বিব মিশ্রিত করিয়া দিয়া তাহার জাগতিক রক্তবকের অভিনয় শেষ করেন ।

শ্রীমদভ্যুদয় সার্যাল ।

বন্দে মাতরম্ ।

জানি না—কি শুভকণে কবি “বন্দে মাতরম্” এই ভীম ভাবপূর্ণ স্বদেশী সঙ্গীতটী রচনা করিয়া আপন পুস্তকে সম্মিলিত করিয়াছিলেন । আজি ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর প্রাণের সুরে মিলিত হইয়া উঠরবে মিনাদিত হইতেছে ; এই জাতীয় উদ্বোধনের দিনে ইহা পুনরায় বাঙ্গালীর ক্রীণ কণ্ঠে তৈরবী রামিগীতে সঙ্গীত হইতেছে । আজি এই সঙ্গীতের সম্বোধন স্বরে বাঙ্গালী উদ্‌বোধিত হইয়া পুনরায় স্বদেশ হিত করে মনোনিবেশ করিতেছে । চিরবিজিত পর পদাশত বাঙ্গালীর বৃষ্টি মুচ্ছাভঙ্গ হইল, এতদিন পরে বৃষ্টি তাহাদের সুবৃষ্টির ঘোর কাটিল, বৃষ্টি তাহারা পুনরায় মোহ নিজা হইতে আগণিত হইয়া বাঙ্গালিনী মায়ের হৃৎ

মোচনে বদ্ধগণিকর হইল ! তাই আজ চারিদিকে নিজীব বাঙ্গালীর ক্রীণকণ্ঠ হইতে গগনভেদী স্বরে “বন্দে মাতরম্” শব্দ সমুদ্ভূত হইতেছে । হুস্মতি-সম্পন্ন হিন্দুজাতির মতিগতির পরিবর্তন হইয়াছে ; তাহারা নিজের হৃৎ নিজেদের দুর্গতির কারণ এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই আজ কোটা কোটা কাতর কণ্ঠে মাতৃ পূজার সেই প্রাণ মাতান “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীতের ভীমরব শুনা যাইতেছে ।

বিদেশীর বণিকগণ আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে ক্রমশঃ অন্তঃসার শূন্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন । অব্যবহার্য্য, অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যের বিনিময়ে আমাদের দেশ হইতে যে মহামূল্য রত্ন সকল লইয়া যাইতেছেন, আমাদের সর্ব্বশ লইয়া যে আপনার গৃহ পরিপূর্ণ করিতেছেন, এতদিন পরে এ দেশীয়গণ তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছে । তাই আজ চিরবিজিত বাঙ্গালীর মোহ নিজা খুচিয়াছে, তাই তাহারা মাতৃ সেবার মোহন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উন্নতির প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইতেছে । বাঙ্গালী একটা জাতি বলিয়াই গণ্য নহে, তাহাদের কোনই ক্ষমতা নাই, স্বত্বতি করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করে— তাই তাহাদের প্রতি ক্রকোশ না করিয়া ভারতের রাজ্য প্রতিনিধি কর্ত্তন বাহাদুর বদ্ধ ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের

উন্নতির পথে কষ্টকল্পনা করিতেছেন।
 মারের ৮ কোটি সন্তান একত্র থাকিলে
 পাছে ভবিষ্যতে কোনরূপ অশান্তি উপস্থিত
 উপস্থিত হয়, এই ভয় বড় নাট আমাদিগকে
 পৃথক করিয়া দিলেন। যাহাতে আমরা
 পরস্পর পরস্পরের নিকট সহানুভূতি না পাই
 বাহাতে এই ৮ কোটি সন্তান পরস্পর ভাই
 ভাই বলিয়া চিনিতে না পারে, বাহাতে
 কতকগুলির সচিব কতকগুলির সংসদ বনা
 থাকে, কর্ত্তন বাহাদুর সেই সঙ্কল্প করিয়া
 আমাদিগকে পৃথক করিয়া দিতে মনস্থ করি-
 রাছেন। আজীবন আমরা যে জননী জন্ম-
 ভূমির শান্তিময় সুশীতল কোড়ে চিরস্থখে
 লালিত পালিত হইতেছিলাম, বাহার সুবিস্তৃত
 ক্ষত্র শ্যামল অঙ্গে এতদিন আমরা একত্রে
 স্থখে বিচরণ করিয়া আসিতেছিলাম। হায়!
 আজি রাজ প্রতিনিধির বিধি বিধানে সেই
 মাতৃকোড় পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি
 সন্তান স্থানান্তরে গেল। এত কালের জ্ঞান
 এত অজ্ঞান বিনয় সমস্তই বুঝা হইল—কিছু
 তেই বড়লাটে—স্বয়ং দ্রবীভূত হইল না।
 দ্বিভ্রষ্ট প্রজাবর্গের জ্ঞানে কর্ণপাত না করিয়া
 কর্ত্তন বাহাদুর বজ্রদেবকে ছুইভাঙ্গে বিভক্ত
 করিয়া দিলেন। ইহাতে যে তাঁহার কি দৃষ্ট
 সিদ্ধি হইল—তাঁহা তিনিই জানেন।

জানিনা—কি কক্ষণে তিনি সাত সমুদ্র
 তের নদী পার হইয়া ভারতে পদার্পণ করিয়া-

ছিলেন, জানিনা—কি কক্ষণে তিনি ভারত-
 বাসীর ভাগ্যে বিধাতারূপে এদেশে আসিয়া
 তাহাদের সমস্ত আশা ভরসা, সমস্ত আশা
 সিদ্ধির পথ অবরোধ করিলেন, দেশীয়
 বাঙ্গালী দেশটাকে কাটিয়া পান খান করি-
 লেন, দেশীয় ভারত আজ ছারখার হইল।
 দেশের দুর্ব্বলরূপ মহাশয় আজ বঙ্গবাসীর
 ক্ষমতায় বিবম বাজিয়াছে, প্রত্যাশিত্রয়ে আজ
 তাহার মর্মান্বিত হইয়া প্রত্যাশিত্রয় করিয়াছে—
 রাজা যতই কেন আমাদিগকে পৃথক করিয়া
 দিবার চেষ্টা করুন, যতই কেন তাঁহারা
 আমাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করুন
 হউন। আমরা তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত
 হই না। রাজা প্রজার রক্ষাকর্ত্তা জানিনা
 এতদিন আমরা আমাদের সমস্ত বিশ্ব রাজার
 উপর ভরসা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম তাহার
 কোনও কথার বাদ প্রতিবাদ করিতে বিরহ
 বাঙ্গালী আদৌ অভ্যস্ত ছিল না। কিন্তু এখন
 হইতে আমরা নিজের অবস্থা ভাল করিয়া
 বুঝিতে শিখিয়াছি, ভালরূপ বুঝিতে পারি-
 য়াছি বলিয়াই আজ আমরা স্বদেশ ও
 স্বজাতির রক্ষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। এই
 প্রতিজ্ঞার ফল “জাতীয় আন্দোলন” স্বদেশ-
 জাত জয় ব্যবহারই এই আন্দোলনের মূল
 মন্ত্র, এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কার্য করিলে
 স্বদেশানের স্বধোই আমরা একটা “জাতি”
 গঠন করিতে পারিব, নীচ আমরা আবার

পূর্ব আর্থগোঁরব লাভ করিয়া ধন হইব।

এতদিন বাদামীজাতি একটা জাতি বলিয়াই বিবেচিত হইত না—কারণ তাহাদের মধ্যে “জাতীয়তা” আদৌ ছিল না; তাহারা স্বদেশবাসীকে আপন সহোদর বলিয়া মানিত না। আজ তাহারা একপ্রাণে একমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত স্বদেশ প্রীতি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে; স্বদেশ জাত দ্রব্য ব্যবহারে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতেই অবগত হওয়া যায়—বাদামীজাতি নিজের গন্তব্য পথ ঠিক না হইয়া কার্য করিলে নিশ্চয়ই তাহাদের গোঁরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে; তাহাদের বলগোঁরবে দেশ বিদেশ পরিব্যাপ্ত হইবে, তাহাদের স্বধের পথ উন্মুক্ত থাকিবে। জাতীয় উদ্বোধনের—জাতি সংগঠনের ইহাই প্রকৃত সময়। তাই ত্বরিতবাসি! পারিবে কি? অটল অচলভাবে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে জীবন উৎসর্গ করিবে কি? আমরা কি বদেলীর দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিয়া রাখিতে সমর্থ হইব, পুনরায় কি আমরা সকলের নিকট আমাদের মহত্বের পরিচয় দিতে পারিব! যে জাতি চিরকাল জীবনহীন লবঙ্গার, যে জাতি শক্তি—সামর্থ্য বিহীন, তাহারা চিরকাল সকলের নিকট লাঞ্চিত—অপমানিত, স্থপিত সেই অধম জাতির কি

পুনরুদ্ধার হইবে? সেই অনাদৃত বঙ্গীয় জাতীয়ত্বের ক্রীণ প্রাণ বাহুর মুহূর্ত্তকারেই কি তাহার পুনর্জীবনলাভ হইবে? এমন দিন কি হইবে যে অধম বঙ্গজাতির সৌভাগ্যগগনে পুনরায় সূর্য সূর্য্যের উদয় হইবে? ভগবান কি এমন দিন দিবেন—আমাদের দুঃখতির কি এমন দ্রুত পরিবর্তন করিয়া সুখতি প্রদান করিবেন? আমরা পুনরায় কি আমাদের ঘোর অভাব বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতিকারার্থে যত্নবান হইব? পুনরায় কি আমরা প্রাণ খুলিয়া গাহিতে পারিব—‘বন্দে মাতরম্’

হিন্দু চিরকালই রাজভক্ত; রাজভক্তি তাহাদের হৃদয়ের প্রত্যেক পরতে পরতে অঙ্কিত, রাজাকে তাহারা দেবতা বলিয়া জানে। পিতা যেমন পুত্রের রক্ষাকর্তা, রাজা সেইরূপ প্রজাবর্গের রক্ষাকর্তা, পুত্র নিবিশেষে প্রজাপালনই রাজধর্ম। পুত্রগণের কোন কষ্ট হইলে, তাহারা কাতরকণ্ঠে কোনও বিষয়ের জ্ঞাত আবেদন করিলে—পিতা যেমন তাহাদের অভাব বুঝিয়া—তাহাদের কাতরক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া থাকেন। রাজারও সেইরূপ প্রজাগণের কাতর চীৎকারে কর্ণপাত করা একান্ত কর্তব্য। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদে আমরা রাজার নিকট সকলে মিলিয়া কাতর প্রাণে কত আবেদন করিলাম। তাহার প্রতিরোধার্থে কত সভাসমিতি করিলাম, রাজা কিছুতেই

ক্রক্ষেপ না করিয়া বঙ্গদেশের ব্যবচ্ছেদ কার্য অকাতরে সমাধা করিলেন, প্রজাবর্ণের মলিন বদনের প্রতি একবার ফিরিয়া ও দেখিলেন না। যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন—তাহা অবোধে সমাধা করিলে, কোন বাধাই মানিলেন না।

এই বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কার্যে বড়লাট আমাদের একটি মহাশুভ কার্যের সূচনা করিয়া দিলেন, প্রকারান্তরে আমাদেরকে আমাদের বহুদিন বিস্মৃত, পূর্বগৌরবের কথা হিন্দু জাতির মনমধ্যে জাগরিত করিয়া দিলেন, আমরা কি ছিলাম আর এখন কি হইয়াছি, প্রকারান্তরে তাহাই শিক্ষা দিবার জন্ত কক্ষন বাহাজুর বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। এই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে আমরা আমাদের পূর্বস্বত্তি ফিরিয়া পাইরাছি; নিজের অনন্য জন্মভূমির বিষয় এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের উপকারিতার বিষয় আমরা এখন বেশ বুঝিতে পারিরাছি; তাই আমাদের মোহ ছুটিয়াছে; আমরা নিজের হৃদশার কারণ, সকলের নিকট হিন্দুজাতির অখ্যাতির কারণ বুঝিতে পারিরাছি। কেন যে সকলের নিকট এত ঘৃণিত হইতেছি, তাহার কারণ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়া আজ তাহার প্রতিবিধানে আমরা স্বদেশের স্বজাতির এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইরাছি।

দেবরূপ সুবাস্তাস বহিমাছে, চারিদিকে বেকরূপ স্বদেশীর দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন চলিতেছে। বোধ হয় আমাদের দেশ অচিরেই আবার শান্তি রাজ্য হইবে, অচিরেই আমরা ঘোর অভাবের হস্ত হইতে দারিদ্র্যের দাক্ষণ দাবানল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব, আমাদের কাঙ্ক্ষানী মাকে আবার রাজ-রানীর বেশে সুসজ্জিত করিয়া তাহার পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব। তাই ভারত-বাসি! তোমাদের শাপে বর হইল। বাজার সহিত মনোযোগিতা করিবার আবশ্যক নাই; যে পক্ষা দারিদ্র্য, এক্ষণে যাহাকে গন্তব্য পথ বলিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইহাও অমূল্যের করিতে পারিলে দেখিবে—আসরেট তোমাদের এই সং পক্ষা অবগম্বনের কল তোমাদের দিগকে সুখের রাজ্য দেখাইয়া দিবে, তোমাদের চিরশান্তির উজ্জ্বল পথ তোমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিবে। রাজা তোমাদের কণ্ঠ শুনিয়া সে কার্য করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে তোমাদের নিকট বিসবং বোধ হইতেছে কিন্তু একবার তাহা দেখি ইহার ভবিষ্যৎ কি সুখকর হইবে। বড়লাট আমাদের পৃথক করিতে গিয়া আমাদেরকে আরও দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট করাইয়া দিলেন—আমরা পুনরায় স্বদেশ ও স্বজাতির আদর করিতে শিখিলাম। তাই! আমরা বিদেশীর দ্রব্য কেন ব্যবহার করিব। আমাদের মতো আছে, তাহা আর

কাহার আছে? পৃথিবীই কোন জাতির
আছে, একবার তাই দেখি। তাই! বিলাতী
দ্রব্য আমাদেয় দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে।
আমরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া স্বদেশ-জাত দ্রব্যের
অনাগর করতঃ, বিদেশীয় দ্রব্য আবৃত্তক না
হইলেও কেবল বিলাসিতার জন্য তাহা ক্রয়
করিতেছি; দেশের টাকা বিদেশে পাঠাই-
তেছি। অশন বসন-অর্থ-সামর্থ্য বাহা আমা-
দের ছিল—তাহা অগতে আরু, কাহারও ছিল
কি? তাই! মোহ ত্যাগ কর—একবার চক্ষু
মিলিয়া দেখ, তোমার দেশের অবস্থা তোমার
দেশীয় ভ্রাতৃগণের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়
হইয়াছে; দেখিয়া সকলে শপথ কর—আর
বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিব না। শুধু
প্রতিজ্ঞা করিলে হইবে না, সভা সমিতি
করিলে হইবে না, কার্য্যতঃ দেখানই প্রতিজ্ঞা
রক্ষার মূল। তবে সভা যে করিতে হইবে
না—তাহা নহে, সভা না হইলে সকলে একত্র
সমবেত না হইলে কেমন করিয়া সকলে এক
মত হইবেন। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজ
কার্য্য করা এবং ক্ষমতানুসারে দুই একজনকে
কাজ করান স্বদেশ হিতৈষীমাজেরই কর্তব্য।
বিশেষ ধীর ও স্থিরভাবে সভা সমিতি করিয়া
ঊপদেশ প্রদান করিতে হইবে—তাহার
সহিত কার্য্য করিতে বন্ধগণিকর হইতে
হইবে। বন্ধুতা উপদেশ ভিন্ন এ প্রতিজ্ঞা
রক্ষা হইবে না, শব্দরূপ ব্রহ্মবাণ না হইলে

এ লক্ষ্য ভেদ হইবে না। তাই! যে প্রতিজ্ঞা
করিয়াছ; স্বদেশের জন্য বাহার অল্পধন-
করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে; আইস—জন্ম-
য়ের প্রভূত শক্তির সহিত সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা
করিতে চেষ্টা করি। শক্তি ভিন্ন কোনও
কার্য্যই হইবে না, কারণ শক্তিই জগতের
এবং জাগতিক জীবের অবলম্বন। যে শক্তি
প্রভাবে মরুভূমিতে মল্যাকিনী প্রবাহিত হয়,
যে শক্তি প্রভাবে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়,
বাহার রূপার পক্ষু ছুরারোহ গিরি উল্লম্বনে
সমর্থ হয়; বাহার রূপার জনশূন্য কান্তারে
কুহুম সকল প্রক্ষুটিত হয়; বাহার রূপাবলে
মানব স্রষ্টার কার্য্য সকল স্রষ্টারূপে
সম্পন্ন করিতে পারে, বাহার রূপাবলে হতাশ
হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, এস—আমরা সেই
মহাশক্তির শরণাপন্ন হইয়া হৃদয়ে প্রভূত বল
সঞ্চার করি। বাহার প্রভাবে আমরা আমা-
দের প্রতিজ্ঞা অচল অটল রাখিতে পারিব।
এস—আমরা এই আন্দোলনের মূল শক্তি
সেই মহাশক্তির শক্তিতে শক্তিমত্ত হই।
তাহা হইলে আমরা লক্ষ্য স্থির রাখিতে
পারিব, প্রতিজ্ঞা স্থির থাকিবে। হৃদয়ে নব
আশার সঞ্চার হইবে। যেখানে আশা সেই
খানেই উৎসাহ; যেখানে শক্তি সেইখানেই
সাহস, যেখানে অভাব সেইখানেই উত্তোষ।
আজ আমরা যের অভাবে পতিত হইয়া এস
সেই মহাশক্তির আরাধনা করিয়া দেশের ও

দেশের অভাব মোচনে দৃঢ়ব্রত হই। শুধু বাদ প্রতিবাদ করিলে চলিবে না; শুধু কথাই কাজ হইবে না। কার্য্য করিতে হইবে, কার্য্য না করিলে উন্নতি কোথায়? ভাই! এখন আর কিছুই নাই; নিশ্চেষ্ট ভারতে আজ সকলেই নিদ্রিত, ঘুমে অচেতন। এখন এই আদর্শ ভারতে সকলেই অভাব; আমাদের এই সাধুজন নিবেদিত রত্নময় ভারত আজ অভাবময়, এই ঘোর অভাবে পতিত হইয়া এতদিন পরে আমাদের চৈতন্য হইয়াছে। অতএব ভাই! আর নিশ্চেষ্ট থাকিও না, যাদের দুর্দশা মোচনে হস্তবান হও, দেখ, তোমাদের সোণার সংসার আজ ঘোর দারিদ্র্যের ঘোর অর্ধ-কুচ্ছুরার আবাসভূমি হইয়াছে। আর কি নিদ্রিত থাকা উচিত? এখন কার্য্যের সময় হইয়াছে—সকলে মিলিয়া সকলে একত্র সমবেত হইয়া কার্য্যের জ্ঞাতোমাদের জীবন উৎসর্গ কর। “বন্দে মাতরম্” এই মহামন্ত্র হৃদয়ে জপমালা করিয়া মহাশক্তির শরণাপন্ন হইয়া নবোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, তোমাদের মঙ্গল হইবে। দেশের দুর্গতি দূরে পলাইবে, সকলে দত্ত হইবে।

সম্পাদক।

স্বদেশী আন্দোলন ।

বঙ্গের অন্ধচ্ছন্দে মর্দ্যাহত হইয়া বাঙ্গালার অধিবাসীবর্গ বিাতী জবা ব্যবহার করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে যে এই প্রতিজ্ঞাফুলিক দাবাঘির নায় সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া পড়িয়াছে—চতুর্দিকে গাঢ় স্বদেশ তন্ত্রির লক্ষণ সমূহ দেখা যাইতেছে; মাতৃভূমি জননীর পূজা হইতেছে—এই মহাপুঙ্কর পুরোহিত বর্গ হইতেছেন মাননীয়—সুপ্রসন্নাপ বন্দ্যোপাধ্যায় মিঃ জে চৌধুরী বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বাবু কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি—আর সুরকুমারমতি, উৎসাহের প্রতিমূর্তি স্বরূপ ছাত্রগণ এই পুঙ্কর জন্য সর্ব্বত্র পণ করিয়াছেন।—এরূপ সৌভাগ্য বঙ্গদেশে অনেকদিন আসে নাই, জাপানের জয়, বঙ্গের স্বদেশ প্রীতি দেখিয়া আমাদের মনে হয় দেবতা প্রোচা-জগতের ৬দশা দর্শনে বাণিত হইয়া তাঁহার সঙ্কেহ প্রৌচন্তে আমাদের মস্তকে আশীর্বাদ ধারা বর্ষণ করিতেছেন। ঐতিহ্যে প্রায় ৮০ টি ব্রিটিশ সভা (অর্থাৎ বাহাতে প্রায় লক্ষ লোক বর্ত্তমান ছিলেন) হইয়া গিয়াছে এতদ্বিধ ক্ষুদ্র সভার সংখ্যা নাই। এক্ষণে বিদেশীয়গণ স্বস্বার্থ রক্ষার্থ আমাদের সম্মুখে যে কুচক্রাণ বিস্তার করিবে তাহা ভিন্ন করিয়া স্ব স্ব কর্তব্য সাধন করিয়া আর পুণ্য করিতে পারিলেই আমাদের দন্য বোধ করিব।

সোণার বাঙলা ।

(টাউন হলে গীত ।)

আমার সোণার বাংলা,
 আসি তোমার ভালবাসি ।
 চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
 আমার প্রাণে বাজার বাঁশি ॥
 ওমা কাণ্ডনে তোর আশের বনে
 জ্বাণে পাগল করে (মরি হার হার রে)—
 ওমা অগ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
 কি দেখেছি মধুর হাসি ॥
 কি শোভা, কি ছায়া গো !
 কি মেহ, কি মায়্যা গো !
 কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
 নদীর কূলে কূলে ।
 মা, তোর বুকের বাগী আমার কাণে
 লাগে সুধার মত (মরি হার হার রে)—
 মা তোর বদনখানি মলিন হলে
 নয়ন জলে ভাসি ।
 তোমার এই খেলা ঘরে
 শিশুকাল কাটিগ রে—
 তোমারি পুষ্পাটী অঙ্গ মাখি
 ধন্ত জীবন মানি ।
 তুই দিন কুরানে সন্ধ্যাকালে
 কি দীপ জালিস ঘরে (মরি হার হার রে)—
 তখন খেলা খুলা সকল ফেলে
 তোমার কোলে ছুটে আসি ॥

খেয় চরা তোমার মাঠে
 পারে বাবার খেলা ঘাটে
 সারাদিন পাখী-ডাকা ছারার ঢাকা
 তোমার পল্লি-বাটে
 তোমার খানে ভরা আভিনাতে
 জীবনের দিন কাটে (মরি হার হার রে)—
 ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই
 তোমারি রাখান, তোমার চাষী ॥
 ওমা, তোর চরণেতে
 দিলেম এই মাথা পেতে
 দেগো ! তোর পায়ের ধূলা
 সে যে আমার মাথার মণিক হবে ।
 ওমা গরীবের ধন যা আছে তাই
 দিব চরণতলে (মরি হার হার রে)—
 আমি পরের ঘরে কিন্ব না তোর
 ভূষণ বলে গলার কাঁসি ॥
 শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

স্বদেশী সঙ্গীত ।

(রামপ্রসাদী সুর ।)

তুই মা মোদের অগত আলো ।
 তুমি স্থখে হাসি মুখে
 আঁধার দীপ তুমিই আলো !
 মা বলে মা ডাকলে তোরে,
 সারাটি প্রাণ ওঠে ত'রে,
 বেশেছি মা তোরেই ডাঙো ;

তোরেই ঘের বাসি ভালো !
ওই কোলে মা পাই যদি ঠাই,
জনম জনম কিছুই না চাই,
থাকনা ওদের গৌর বরণ,
হলেমই বা আমরা কালো !
পরের পোষাক খুলে ফেলে,
কিরলাম ঘরে ঘরের ছেলে,
আখির নীরে মোদের শিরে
আশীষ-ধারা আজি ঢালো !

শ্রী প্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

বিগত রামমোহন লাইব্রেরীর বার্ষিক
অধিবেশনে জেনারেল এসেমব্লি হলে গীত।

স্বদেশী সঙ্গীত।

“অ”

আমার জন্মভূমি—আমার জননী—আমার
তোমার নিভৃত-নির্জিত-নীরব-কক্ষে,
“ কোমল-স্রামল-বিটপী-পুত্রে,

ওগো ! কত ছায়া, কত মারা, কত মেহ মুখে
আমিত জানি না।

তোমার পল্লী-ছায়-বাটে,
দোহন-মুখর-গোষ্ঠে,
শত-স্রামল-মাঠে,
নিভৃত-নির্জন-বাটে

আমি পেরেছি তা—

সারা জনমে পাইনি’ক বা

“ ভগ্ন-মগ্ন-মন্দিরে,
“ শৈবাল-পূর্ণ-বাগী নীরে—
“ তর-পল্লব-মর্ষরে—
“ কার গান শুনি মা ?
“ ইটিনীর কল-তানে
“ বিহগের মধুগানে
“ নিখারের নব নিঃস্বনে

প্লাই যেন অক আকুলতা !

তোমার উদার-অনন্ত-আকাশে,

“ মন্দ-মগ্ন-বাভাসে,
“ বাণীর রবে ভাসে,
“ বিজলী-ঝলকে হাসে

অটহাসি—চা—চা—হা !

কাহার অটুট বাণী,

“ করুণ-কাচিনী,
“ কঠ মোচিনী

ডেকে বলে “ওঠনা”

ডেকে বলে “জাগনা”

ডেকে বলে “দেখনা”

সে ভূমি।—আমার জন্মভূমি—আমার মা।

অনৈক বঙ্গ সন্তান।

বিগত টাউনহল উৎসবে ছাত্রগণ
কর্তৃক গীত।

আবাহন গান ।

কে বলে ভেঙ্গেছে অঙ্গ ; ভেঙ্গেছে মোহের বাসা
আগিরা উঠেছে বঙ্গ-ভদ্রের তরুণ-আশা ॥

ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর,
নিরাশ—বিলাস—চোর,

ঐ, উদিগ্ন হৃৎকের ভোর, কাকলী নবীন-ভাষা ।
কে বলে ভেঙ্গেছে বঙ্গ, ভেঙ্গেছে মোহের বাসা
তবে ঘৃণিত বিলাস বাস, চরণে দলিয়া সই ।

কল্যাণি ! নবীন সাজে সাজলো মঙ্গলময়ি
জাও প্রদাহিত-কণ্ঠে অমৃত-প্রাণেপ স্নেহে,
কোনল-শীতল কর বৃণাও পীড়িত দেহে ?
ধোয়াও নয়ন-নীরে মায়ের বেদনা সই ;
দেহে শক্তি সঞ্চারিয়া স্নেহে স্নেহে শক্তিময়ী ;
দেহ দেহ নবশিক্ষা, নবমস্ত্রে দেহ দীক্ষা,
ভূলাও ভারতে ভিক্ষা, দেহ প্রাণে নব বল
জুঃখিনীর জুঃখিনীর মুছাইতে চল চল

শও শত স্তুত স্তুতা,
হইলে সেবা নিরতা,

সুহৃৎকে দূরিতে বাধা, আসিবে নবীন বল
মায়ের আশীষে হবে গৃহে গৃহে স্মরণ ।

শ্রীগিরিজামোহিনী দাসী ।

সাধারণ সংবাদ ।

বরণ কোম্পানীর ধর্মঘট ।

বিগত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কোম্পানীর
হাওড়ার কারখানায় কর্তৃপক্ষগণ এই মর্মে
এক আদেশ প্রচার করেন যে, অতঃপর
বাবুদিগকে হাজিরার জন্য টিকিট কাটিতে
হইবে। বাবুগণ কুলিদিগের ত্রায় প্রবেশ-
কালীন টিকিট পক্ষ করিতে অস্বীকৃত হইয়া

এককালে ক্রন্দ্র ত্যাগ করিতেছেন। এই
লকল বাঙ্গালীর সুখোচ্ছলকারী কেন্দ্রাণীগণের
জুঃসহ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ নানাস্থানে
অর্থ সংগ্রহ হইতেছে। প্রসিদ্ধ গন্ধ্র জব্বা
বিক্রেতা মিঃ এচু বোস সপরিবার প্রায় চারি
শত টাকা দিয়াছেন, ঠাঁয়ের স্বনাম ধন্য
ম্যানেজার বাবু অমৃতলাল বসু তাঁহাদের
রক্ষালয়ের এক রাত্রেই আশ্রয় প্রদান করিয়া-
ছেন, এতদ্বিত্ত হোপ কোম্পানী নামক টেশ-
নার্স ও বেঙ্গল ষ্টোর প্রভৃতি কয়েকজন
ব্যবসাদারও তাঁহাদের সাহায্যার্থ কতক
দিবসের লাভ ছাড়িয়া দিতেছেন। মিনার্ভার
অধ্যক্ষগণ একটা সাহায্য রজনী দিতেছেন,
আশা করি অত্যন্ত রক্ষালয়াদ্যক্ষগণ ইহাদের
দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্থ
হউন। নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি
যে, বাঙ্গালী নামধারী কয়েকজন কুলঙ্গার
এখনও সাহেব-পদ লাঞ্চিত হইয়া ক্রন্দ্র করিতে
যাইতেছেন। দৈনিক সহযোগী “সন্ধ্যা” তাহা-
দের নাম ধাম প্রকাশ করিয়া দিতেছেন,
এজ্ঞ আমরা নিতুঙ্গ বাবুর নিকট অধিক
কৃতজ্ঞ, কারণ এই নরাধনগণ উপযুক্ত শিক্ষা
না পাইলে চির-কলঙ্কিত বাঙ্গালী নামে গাঢ়
মসী লেপিয়া দিত। স্থানীয় সমাজপতিগণ
কি ইহাদের সহিত হুঁকা বন্ধ করিতে পারেন
না—না স্থানীয় ব্যবসায়গণ “সুর্বত *
ঔষধের” ব্যবস্থা করিতে পারেন না ?

কবিকাতা,—১৩৩ নং মঙ্গলদ্বাড়ী ষ্ট্রীট “হরি-বহ্নে” শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত

আলোচনা।

“মস্তকের সাধন-কিন্মা শরীর পতন।”

নবম বর্ষ।

কার্তিক, সন ১৩১২।

সপ্তম সংখ্যা।

বিজয়োৎসব।

দুর্গোৎসবের পর বিজয়োৎসব। বিজয়ার আয়োদ, বিজয়ার কোলাকুলি কেবল এই শারলীয়া মহাপুজার বিজয়াতেই নির্দিষ্ট হইয়াছে, অল্প কোন প্রতিমার বিসর্জনে এ উৎসব নাই। এস তরু পাঠকবৃন্দ! এস ভাই হিন্দু, মুসলমান, বৈদ্য, খ্রীষ্টান আল আমরা পরম্পর হিংসা ঘেব, বাদ বিসম্বাদ ঐক্যে মনোমালিন্য মায়ের মুকুরী প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বতির অগাধ সলিলে বিসর্জন দিয়া! এস-আলিমন, অভিবাদন ও কোলাকুলি করিয়া কৃতার্থ হই, পরম্পর একতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আত্মভাবে কার্যকরী অবতীর্ণ হই।

আনন্দময়ী বিশ্বজননী মা সত্ত্বসর পরে কেবল মাত্র তিন দিনের অল্প বর্তে আলিয়া-ছিলেন। তাঁহার অবসাদগ্রস্ত, হারিত্য হ্রাণ নিপীড়িত সন্ধানপণকে সাধনা করিতে মর্তে

মায়ের শুভাগমন হইয়াছিল বটে কিন্তু তিনটি দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই মা আবার চলিয়া গেলেন। তক্তের সাধের চতীমণ্ডপ অঙ্ককার করিয়া মাহেশ্বরী মহেশ্বর সর্বনে গমন করিলেন। আমরা চিৎকারী মায়ের মুকুরী মূর্তি সাগর-সলিলে নিমজ্জিত করিয়া কোথায় হ্রাণে ত্রিমাণ হইব, না তাহার পরিবর্তে আমরা সিদ্ধিগানে আনন্দোজত হইয়া পরম্পর কোলাকুলি করিতেছি। মায়ের আনন্দময়ী প্রতিমা বলে তাগাইয়া বিবাদের পরিবর্তে এত আনন্দ উৎসব কেন? শোকের পরিবর্তে প্রাণতরা জ্বলের অভিনয় কেন করিতে হয়?

তরু সাধক জননীকে বলে বিসর্জন দিয়া, কখন আনন্দে আত্মহারা হইতে পারে না। প্রকৃত্তে যদিও আমরা মায়ের মুকুরী প্রতিমা সাগর সলিলে ভাসাইয়া বিই যত, কিন্তু আবারের আন্তরিক তাব তাহা মনে, বাস্তবিক আমরা মায়ের প্রতিমূর্তি বলে

ভাসাইয়া দিই না। আমরা সনাতন ধর্ম-
নীকে আমাদের বান্ধবদের বনের প্রবেশ
ভক্তি-তরঙ্গে ভাসাইয়া তদ্ব্যবস্থা লাভ করি,
তাহার প্রসাদে অগ্নিমান্নাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ
করিয়া সিদ্ধিপানে বিভোর হই। তাই বিজয়া
মাহাত্ম্য হিন্দুর পক্ষে এত সুখের ও এত
উৎসবের দিন। সম্বৎসরের মধ্যে এমন
পবিত্র দিন হিন্দুর আর নাই। ইহাই আমা-
দের বিজয়োৎসবের গূঢ় ও সারমর্ম। তাই
এই উৎসবে বিবাদের পরিবর্তে আনন্দোৎসব
করিতে হয়। বিজয়ার দিন যখন সংহার যুদ্ধা-
ঘাটা ঘট হইতে পুষ্প গ্রহণ করিয়া সাধক
সেই প্রাণলক্ষী মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে,
যখন মায়ের প্রতিমা প্রদক্ষিণ করিয়া বলে—
মা! তোমার আগমনে আমি ধন্য, আমার
কুল পবিত্র হইল। তখন কোন পাবকের চক্ষু
জলভারাক্রান্ত না হয়, কেন পাবক অশ্রু বিস-
র্জন না করিয়া থাকিতে পারে? যখন দেবী-
প্রতিমার আসন স্পর্শ করিয়া বলিতে হয়;—
গজ গজ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে।
বৎপুত্রিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদন্ত মে।
গজ গজ পরং স্থানং যজ দেবো মহেশ্বরঃ।
সম্বৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।

শক্তিব্রহ্মপী মা আমাদের হৃদয় মন্দিরে
ত চিরকালই অবস্থান করিতেছেন। তাহারই
শক্তিতে ত আমরা শক্তিমত্ত হইতেছি, সেই
মায়ের কৃপাতেই ত আমরা জীবিত রহি-

যাছি। তাহারই কৃপায় ত এই বিশাল বিশ্ব
ব্রহ্মাণ্ডের ধাবন্তী বস্ত্র স্নানিরমে চলিতেছে।
তথাপি আমরা মাছুষ, পদে পদে আমাদের
। প্রকার ভ্রম প্রমাদ সংঘটিত হয় বলিয়া
। আমাদের স্বতীশক্তিকে নবীভূত করিবার
জন্ত প্রুতি বৎসর মায়ের স্নেহময়ী মূর্তি
গড়িয়া ভক্তি প্রাথন্যে তাহার অর্চনা করিয়া
কৃতার্থ হই, ভক্তিতরে মা মা বলিয়া ডাকিয়া
আমরা মায়ের নাম-সাগরে অম্বগাহন করিয়া
মানবজন্ম সফল করি।

জেতাযুগে জ্ঞানরূপী রাজা রামচন্দ্র মায়ার
মোহরূপী রাবণ ও কুস্তকর্ণ সমরে জয়লাভ
করিয়া চৈতন্তরূপিণী সীতার উদ্ধার সাধনার্থ
এই সাধের শরতে শারদীয়া মহাশক্তির
আরাধনা করিয়াছিলেন। তগবতীর কৃপায়
সময়ে বিজয়লাভ করিয়া চতুর্থ দিবসে নিজ
অমুচরগণ সহ তগবান শ্রীরামচন্দ্র মহামহোৎ-
সবে এই বিজয়োৎসব কার্য সমাধা করিয়া-
ছিলেন। হিন্দু এই পবিত্র স্থতি ভুলিতে
পারে না বলিয়াই তাহার প্রতি বৎসর
তাহাদের আধ্যাত্মিক বিধি বিহিত কার্য
করিয়া সনাতন ধর্মের মহিমা কীর্তন করে।
মায়ার ও মোহ সময়ে বিজয়লাভ করিয়া জ্ঞান-
রূপী তগবান শ্রীরামচন্দ্রের চৈতন্তরূপিণী সীতা
লাভ হইয়াছিল। আমরা কীদৃষ্টি সম্পন্ন
হইলেও এতদিন মায়ামোহে বিভক্তিত হইয়া
চৈতন্ত হারা হইয়াছিলাম। আজ এই বিজ-

যোৎসবের পর যোৎসব আদ্যোদেব মায়াপান
হিঃ হইরাছে, মোহনিত্রা। দুটিরাছে।
আমরা পুনরায় আগ্রহিত, এবার হইরা চৈতন্য
লাভ করিয়াছি। আমাদের লজ্জা অপারিত
হইরাছে, তাই আজ বদেহ ও স্বাভাবিক
প্রতি প্রীতি দেখাইতে যত্নবান হইয়াছি।
এস তাই ভারতবাসি! এস তাই আত্মনক
স্বসন্তানগণ! আজ আমরা জননী জন্মভূমির
নামে জরজর তুলিয়া মায়ের উন্নতি করে
প্রাণহতি দিতে কৃত সক্ষম হই, আমরা পর-
স্পর একতানুজ্ঞে আবদ্ধ হইরা, তাই তাই
এক ঠাই হইরা, এস-আগিলন, অভিবাধন ও
কোলাহলি করিয়া আমাদের চির ভ্রাতৃত্ব
অক্ষুণ্ণ রাখি, পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহায়-
ত্ব দিতে দেখাইতে চেষ্টা করি। আজ আমরা
যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, ধীরে ধীরে যে
পথে অগ্রসর হইতেছি, এই পন্থাই আমাদের
দারিদ্র্য নাশের প্রকৃত পন্থা। এই পন্থার
অপূরণ করিলে নিশ্চয়ই আমরা পুনরায়
স্বপ্নের মুখ দেখিতে পাইব। আমাদের আশায়
পূর্বে পুনরায় স্বপ্নের বাণী আলিয়া স্বপ্নে
কালান্তিপাত করিতে পারিব।

এতদিন পরে এসসরম্বী মা আমাদের
প্রতি এসরা হইরাছেন? কি এক অমাত্মিক-
দৈবশক্তি আমাদের প্রত্যেক শীরায় শীরায়
প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, বাহার বলে
আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়

রক্ষিত সমর্থ হইব। এই মধুর দিনে এই
মধুর সম্মিলন যে কেমন মধুর তাহা ভারত-
বাসী মাঝেই অবগত আছেন। এই বিজ-
য়োৎসব যে পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও প্রীতি
স্থাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা তাহাতে আর সন্দেহ
মাত্র নাই। এস তাই ভারতবাসী! আজ
জাতিভেদ ভুলিয়া, হিংসা ঘেব ভুলিয়া সদা-
নন্দে প্রেমালিঙ্গনে পরিকৃপ্ত হই। বাহাতে
আমরা অচিরে দৃষ্ট দানব হস্ত হইতে আরা-
বেহ জননী জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে পারি,
বাহাতে মায়ের নয়নের অশ্রুজল মুছাইরা
তাঁহাকে পুনরায় সুখী করিতে পারি, সে
বিষয় প্রাণপণে চেষ্টা করি। ঐ দেখ, দৃষ্টিক
দানব করে প্রতি বৎসর আমাদের কোটী
কোটি স্বদেশীর ভ্রাতা অকালে কালকবলে
পতিত হইতেছে; অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান কেন্দ্র
ভারতে বাস করিয়া অন্নভাবে তবলীলা লাভ
করিতেছে। আমরা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াও
সেই দানব বিনাশে যত্নবান হইতেছি না,
ইহা কি কম কোণের ও পরিচাপের বিষয়?
তাই! আর নিশ্চেষ্ট থাকিও না; বারামোহ
দুটিরাছে এস, এবার সকলে বহুপরিকর
হইরা বাহাতে এই “বদেহী আন্দোলন” জিয়-
স্বামী হয়, বাহাতে দেশের টাকা দেশে থাকে,
বাহাতে আমাদের অভাব মোচন হয়, বাহাতে
আমরা এই ভাবদৃষ্টিক দানবের করালগ্রাসি
হইতে অচিরে অব্যাহতি পাই। কারকমো-

বাক্যে তাহার চেষ্টা করি। এস, বিজ্ঞানের পর
আমরা ঐতিহ্যের আবদ্ধ হইয়া পরস্পর
প্রেমালিঙ্গন করিমা এক প্রাণে স্বদেশ-
হিত ব্রতে জীবন উৎসর্গ করি, আমরা যখন
দৈব বলে বলীয়ান হইয়া, এ কার্যে প্রতিজ্ঞা-
বদ্ধ হইরাছি, তখন আমাদের তরু কিসের ?
দৈব আমাদের অকুলে দণ্ডারমান হইরাছেন
এস তাই প্রাণ তরিয়া বলি—বন্দেমাতরম্,
জয় ভারতের জয়। এই প্রতিজ্ঞা অটুট
রাখিতে পারিলেই আনিব জাতিগণ বথার্থই
বিজয়োৎসব করিতে শিখিয়াছি, আমাদের
বিজয়োৎসবে বথার্থ সর্বসিদ্ধি লাভ হইরাছে,
নতুবা কেবল মাত্র সিদ্ধিপানে উন্নত হইয়া
হেঁ হেঁ করিলে চলিবে কেন ?

মা ! আসিরাছিলেন পুনরায় চলিয়া বাই-
তেছেন—এই সময় এস আমরা তাহার পদে
চলি। যেনোগত ভাব নিবেদন করিয়া বলি—

মা ! তোমার প্রসাদে আমাদের লুপ্ত
চৈতন্য পুনরায় লাভ হইরাছে, তোমার
প্রতিমা বিজ্ঞান সজে সজে আমরাও বিজয়
লাভ করিয়াছি। মা ! বাও, বাইবার সমস্ত
তোমার দরিত্র সন্তানগণকে আশীর্বাদ করিয়া
বাও, যেন এই বিজ্ঞান তাহাদের চির বিজয়
লাভ হয়। বাও মা কৈলাশেশ্বরী, কৈলাশে
মঙ্গলময় ভবনের বামে উপবেশন করিয়া
আমাদের মঙ্গল বিধান কর। বাও মা !
অবদে, জয়দে, বিপদে, পূর্বদে, সারদে,

বরদে, জয়দে, বিপদে ঐ পদে আমরাগকে
আশ্রয় দিও মা ! যখন বিজীবিজয় ভব
সংসারের জীবন তরে তীত হইব, তখন অস্তর
দানে তোমার এই অকৃত্রিম সন্তানগণকে রক্ষা
করো, ঐ পদে ইহাই আমাদের আন্তরিক
নিবেদন।

সম্পাদক।

স্বদেশী আন্দোলন ও

বঙ্গ রুমণী।

শুভ সুহৃৎ বড় লাট কর্জন সাহেব বঙ্গ
বিভাগের কলন করিয়াছিলেন, শুভ লক্ষে
তিনি দেশের রাজা মহারাজা হইতে সাধারণ
সকলের দৃঢ় প্রতিবাদ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া
বীর সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে দৃঢ় ব্রত
হইরাছিলেন, তাই আজ আমরা এবদদেশে
এমন এক অভিনব দৃশ্য দেখিতেছি, বাহ্যে
আর কখন দেখা দূরে থাকুক, অন্তরে কলনা
করিতে পারি নাই। দেশবর—দেশবর কেন
অগতঃ রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল যে বাঙ্গালী
কেবল বাক্যে বীর, উত্তারা মুখে বখেট
বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু কার্যতঃ এক
পাণ্ডা অগ্রগত হন না। বাঙ্গালী কথা এক
কোটে হইয়া কার্য করিতে পারেনা, বাঙ্গালী
পরস্পরকে তাই তাই বলিয়া ভাবিতে জানে
না, এ অপবাদ বাঙ্গালীর অনেক ভূষণ হইয়া
গিয়াছিল—বাঙ্গালী নামের সঙ্গে এ কলঙ্ক

একেবারে অজ্ঞেয় ভাবে বৃত্ত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু আজ একি দেখিতেছি—আজ একি অপূর্ণ বৃত্ত, একি স্বর্গীর চিত্রপট আমাদের চোকের সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে! বঙ্গদেশের একপ্রান্ত হইতে অল্পপ্রান্ত পর্য্যন্ত একি এক ভয়ঙ্কর প্রবাহিত হইতেছে, এ তরঙ্গে মানের দর্প, উচ্চপদের অহঙ্কার, ধনের 'গৌরব' কুলের বৃথাগর্ভ সব ভাসিয়া গিয়াছে। রাগা মহারাজা ইতর সাধারণকে ভাই বলিয়া আনি জন দিতেছেন, হিন্দু মুসলমানকে প্রেমভরে আহ্বান করিতেছেন এবং একই একতার অলঙ্কারে দৃঢ়হৃদয় সকলের অন্তঃস্বর্গরল প্রবিষ্ট করিয়াছে। আজ এ বঙ্গদেশে স্বদেশ প্রেম দেবতা সপরিবারে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার মঙ্গল করম্পর্শে প্রত্যেক ক্ষয়ভরতী আন্দোলিত করিয়াছেন, আজ বাদ্যলীর জীবন কুলে তাঁহারই পুণ্য রাগিণী বাজিতেছে! বাদ্যলার কবিকুল আজ প্রেমের গীত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই জয় গান করিতেছেন; বঙ্গের শিল্পী আজ তাঁহারই চরণ পূজার উপযোগী পুষ্প সজ্জার আয়োজন করিতেছেন! লক্ষ্মীপুত্রী বঙ্গললনাপণ আজ তাঁহারই আবাহন করিতে বরণ ভাণ্ডা সজ্জিত করিতেছেন! কি আনন্দ! কি উজ্জ্বল! কি আবেগ! আমি যত, আমার এ ক্ষুদ্রাঙ্গি ক্ষুদ্র জীবন যত, যে আমি এ বৃত্ত দেখিতে পাইলাম। চিরদিন বেজন্ত কতই কল্পনা, কতই স্বপ্ন বিকলে গিয়াছে, আজ তাহা

পূর্ণ জাগ্রত ভাবে প্রবল উদ্দীপনার সহিত সমস্তে আমার সম্মুখে দেখাশান। এ যদি দুর্দিন তবে সুদিন আর কাহাকে বলিব? এ যদি কাঁদিবার দিন তবে হাসিবার দিন কোন্টো! বড় লাগি সাহেব করিলেন এক ভাবে কিন্তু ভগবানের একখানি মঙ্গল হস্ত সে কাঁদিবার গতি ফিরাইয়া দিলেন, অস্ত দিকে! হে মঙ্গলময়, তোমারই জয় হউক! বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এই শুভ মুহূর্ত্তের সর্বাঙ্গীন আলোচনা করিতেছি। এই "বদেশী-আন্দোলন" প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের রমণী কুলের কর্তব্য কি, সেই কর্তব্য তাঁহারা কি ভাবে পালন করিতেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব কতদূর এই প্রসঙ্গ অবলম্বন পূর্বক সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব!

আমাদের এই প্রবন্ধ প্রধানতঃ বঙ্গ রমণী গণের উদ্দেশ্যে লিখিত, এজন্য "বদেশী আন্দোলন" জিনিসটা কি তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যিক কারণ আমরা স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছি যে অনেক রমণী ইহার গুঢ়তাব জ্ঞানকর্য করিতে পারেন নাই; পরে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইলে সাগ্রহে ইহার প্রতি আন্তরিক সম্বাদিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

রমণীগণ একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন, আমাদের ঘরের জিনিসপত্র আশ-বাব প্রভৃতির মধ্যে অনেক বিলাসী অঙ্গী

বিদেশী জিনিস আছে। লবণ, দোবরা চিনি, কাচের চুড়ী; লোহার কলাই কলা গেলাস বাটা, খালা, রেকাবী ইত্যাদি, লোহার ঢালা কড়াই, পিতলের পাতলা গেলাস, আয়না, তিরী, বুরুস, সুগন্ধি দ্রব্য, সাবান, ষ্টীল ট্রাক অর্থাৎ বাক্স, উল, কার্পেট, চুলের কাঁটা, সাবান, কাপড়, জামা, বালতি, চিনেমাটির পুতুল, খেলানা, খেলাইবার বল, গাড়ী ইত্যাদি, চারের বাটা ও রেকাবী আর আর সরঞ্জাম, লঠন বাতি, ছাতি, গজি টিনের কোটা, বার্ণি বিদুট, সাঙ, এরাকুট ইত্যাদি ইত্যাদি পুঞ্জ পুঞ্জ বিদেশী জিনিসে আমার ঘর সংসার পরিপূর্ণ। এগুলি কিনিতে অবশ্য টাকা লাগে। আমরা টাকা দিয়া এই সব জিনিস খরিদ করি, বিলাত ওয়ালারা এই সব জিনিস তাদের দেশে তৈয়ার করিয়া জাহাজে বোঝাই করিয়া আমাদের দেশে পাঠায়; আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা তাই টাকা দিয়া কিনিয়া আমাদের কাছে বিক্রয় করে, সুতরাং আমাদের এই সব টাকা গুলো বিদেশী লোকেরা লইয়া যায়, এদিকে আমাদের দেশের জেলাভাতি, কামার, কুমোর, মালাকার, প্রভৃতি লোকেরা যে এই সব জিনিসের ব্যবসায় করিত, তাহাদের ভাত মারা বাইতেছে, তাহাদের তৈয়ার করা জিনিস আর আমরা খরিদ করি না। আমরা কেবল একটা বোঁক পড়িয়াছিল যে

আমরা দেশী জিনিস সব স্থগা করিয়া বিলাতী জিনিসেরই আদর করিতাম। সুতরাং জোলা তাঁতি, কামার ও অন্যান্য আতিরা নিজ আতি ব্যবসায় কোনই সুবিধা করিতে না পারায় ক্রমে ক্রমে অন্ন হীন হইয়া পড়িতে লাগিল, আর ওদিকে বিলাতী ব্যবসায়ীরা আমাদের টাকার খুব মোটা হইতে লাগিল, আমাদের দেশের কারিগরদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া তাহারা ছুখে মাছে খাইতে লাগিল। আমাদেরই দেশ থেকে মালমসলা সব লইয়া গিয়া তারই উপর কারিগরি করিয়া আবার আমাদেরই কাছে দুই তিন চার গুণ দামে বিক্রী করতে লাগল এবং আমাদের দেশের টাকা ছুহাতে সাপটিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, বিলাতী জিনিস গুলির বাহিরে সাঙ্গ সজ্জা এমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে তা দেখলেই কিনিতে লোভ যায় কিন্তু তাহার ভিতরে প্রায়ই ফাঁকি, দুদিন পরেই তা তাকিয়া, ফুটিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, অন্ত্যাসন্ন বশে আমরা আবার পরসা দিয়া তাই কিনিতে বাই, সুতরাং আমাদের পরসা অনর্থক ব্যয় করিয়া ঐ সব জিনিস আমরা ক্রমাগতই কিনিতে থাকি, এই অল্পই আমরা কিছুতেই আর কুলান করিয়া উঠিতে পারি না, আমাদের টাকা বা বিলাতীলোকেরা লয় তার আর তো ভাঙ্গা ফুটা নাই, তাহাতে তাদের মুখ সম্পন্ন হুইছে করিতে থাকে, এবং আমরা

দেখিতে পাই যে, আমাদের পূর্ব পুরুষ বাণ শিতামহেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক কম টাকা উপার্জন করিয়াও দশজনকে খাওয়াইতে, পালি পার্কিন ধর্ম কর্ত্ত করিতে ও আত্মীয় স্বজনকে পোষণ ও আত্মীয়তা রক্ষা করিতে অনেক বেশী পরিমাণে সক্ষম ছিলেন। অবশ্য সে সময় ধান, চাউল, তেল, বি প্রভৃতি এখনকার চেয়ে সস্তা ছিল তাহা ঠিক, কিন্তু তাহা ছাড়াও আরও এক প্রধান কারণ ছিল যে, তাঁহারা আমাদের মত তত বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিতেন না—বিলাতী জিনিষের নামও তাঁরা এত জানিতেন না। একজোড়া চটি জুতার তাঁদের ছবছর চন্দিয়াছে। এখন আমাদের বছরে চারিজোড়া জুতারই প্রয়োজন হয়। এইরূপ সব বিষয়েই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমরা এত বেশী বিলাতী জিনিষ কিনি বলিয়া আমরা দিন দিন গরীব হইয়া পড়িতেছি। আর এইরূপে অতিরিক্ত ব্যয় বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করাতে আমাদের দেশের কারিগরদেরও আমাদের মধ্যে পূর্বে যেমন একটা পরম্পর আশ্রয়ভার ভাব ছিল, সেটাও ক্রমে লোপ পাইতেছে। তাহাদের উন্নতি কি অবনতির দিকে আমাদের দৃষ্টিই নাই, কারণ আমরা তাদের তৈয়ারী জিনিষ ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়া তাদের কষ্ট

আমরা বুঝিতে চাই না বা চেষ্টাও করি না। তাহারও আমরা তাহাদের জিনিষ তুচ্ছ করি বলিয়া আমাদের প্রতি তেমন ভালভাবে তাকাইতে পারে না। এইরূপে আমাদের মধ্যে পরস্পরে যে এতটা প্রীতি ভালগামার বাধন ছিল, তাও ক্রমেই লোপ পাইতেছে।

বিদেশী লোকেরা আমাদেরকে এ জন্ত অনেকে তিরস্কার করিয়াছেন, ঠাট্টা বিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের চৈতন্য হয় নাই। আমরা এমনই বিলাত-ভক্ত হইয়াছি যে, আমাদেরকে সাহেব না বলিলে আমরা চটিয়া যাই। বিলাতী সাজ, সজ্জাতে নিজেরাও নিজের পুত্র কন্যা পরিবারদিগকে সাজাইতে একান্ত ব্যগ্র। আমাদের মধ্যে অনেকে একটা জামা কিনিতে হইলেও সাহেবের দোকান হইতে কিনিবেন, একজোড়া জুতা পরিতে হইলেও বিলাতী জুতা পরিবেন। তামাক খাওয়াটা অসত্যতাও চুকট সিগারেট টানাই সত্যতা।

বঙ্গালাভাষার চিহ্নিত লেখাটা সূর্য্যতা এবং বঙ্গালা পুস্তকগুলি কেবল স্ত্রীলোকদের পাঠ্য বলিয়াই বিবেচিত হইতেছিল। এইরূপে এই বিলাতী নেশার কোঁকে, অত্যধিক বিলাতী আশ্রয়িতার ফলে আমরা ক্রমেই আমাদের মাতৃভূমি বঙ্গদেশ এবং মাতৃ-ভাষা বাঙ্গালা তইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছিলাম। বিলাতী সত্যতা, বিলাতী সাজ

সম্ভার ভূমিকা বোঝানোর সুবিধার্থে করিয়া আবাদিগকে এখনই ফুলাইয়াছিল যে আমরা মাকুতুর উৎকৃষ্ট রত্নরাজি সোণ করিয়া তাহারই চরণে সমর্পণ করিতে-
 ছিলাম। এ ঘোষণার, এ নেশা আমাদের কিছুতেই উঠিতেছিল না। আমাদের দেশের কলসাকেরা তাবুকেরা আমাদের এই যত্নতা দেখিয়া কবিবাং ভাবিয়া ভীত হইয়া ইহার উপায় চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহারা অনেক চিন্তার পর নিয় করিলেন যে আমরা বিলাতী জিনিষ ব্যবহার পরিভাষণ করিয়া দেশী জিনিষ ব্যবহার করা আরম্ভ না করিলে আর দেশের ব্যক্তিরা বুড়িয়ার উপায় নাই—
 আমাদের মঙ্গলের আশা নাই। তাই এবিষয়ে উৎসাহ আমেরিকান হইতেই চেষ্টা করিতে
 যিমন। ভারতপত্র এ বাতাসা দেশ হইতাপ কর্তব্য করিয়া বন্ধন বতলাট বাহাদুর করি-
 সেন এবং দেশের সকল লোক তাহাতে দেশের বড় অনিষ্ট হইবে বনে করিয়া অনেক
 একাত্তর সরকার বাহাদুরকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া ফিলস মনোরথ
 হইলেন, তখন সকলেই মুকিতে পারিলেন, আমরা বতই কের বিলাতের চরণ পূজা করি
 না কেন, বিলাত আমাদিগকে একটা প্রাচুর্য
 প্রদেই আনে না। এই অপমান জান তপ-
 ক্ষ্ম আমাদের সনে অগাধইা যিমনই তক-
 ক্ষেৎ-বক্ষণ প্রেম আমাদের দ্বারা উদ্বীর্ণিত

হইল, সে প্রেমের বন্ধার আজ দেশ ভাসিয়া
 পিতাছে, সে বাতালী চুক্তি হইতে খাট
 বিদ্যনা পর্য্যন্ত কিছুই বিলাতী না হইলে
 চলিত না, আজ সে বাতালী সব বিলাতী
 জিনিষ বিবরণ দূরে পরিভাষণ করিতেছে ;
 ব্যারিটারগণ হাট কোট ফেলিয়া ধুতি চাদর
 পরিধান করিয়া বাতালী তাহার নদেশ-
 ঐতির উদ্বীর্ণনী বক্তৃতা করিতেছেন,
 দোকানী পশারী আজ সদর্পে নদেশী তাহার
 নাম দিয়া দোকান খুলিতেছে—বিলাতের
 ছাত্র আজ বাবুগিরি, বিলাসিতা দূরে ফেলিয়া
 বাতুলেবার শ্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছেন।

এ মঙ্গল আস্থানে আমাদের শক্তিরূপিনী
 লক্ষ্মী প্রতিমা গৃহলক্ষ্মীগণও উদ্বোধিত হইতে-
 ছেন। বাহারা হুস্ত বিলাতী সাতী না হইলে
 পরিতেন না, আজ অন্নান বদনে যোটা
 বোম্বাই ধুতি সাগ্রহে পরিয়া বেন গর্জিতা
 হইতেছেন। সানা রং বেয়াংএর বিলাতী
 চুড়ী না হইলে বাহাদের তৃপ্তি হইত না,
 আজ তাঁহারা বহুত সানন্দে সেই সব চুড়ী
 জালিয়া কোঁতেছেন এবং সেই সনাতন শত্ৰু
 বলের প্রাচীন পুণ্য আদর্শের পুনরাবির্ভাব
 করাইতেছেন। বিলাস সজ্জা দূরে নিক্ষিপ্ত
 হইয়াছে, অনেকে কাষার বস্ত্র পরিধান
 করিয়া বোগিনীবেশে মাকুতুর মঙ্গল মন্ত্র
 আমাদের কর্ণে ধ্বনিত করিতেছেন। এদৃষ্টে
 কাহার দ্বন্দ্ব না দৃষ্ট হয়। [ক্রমঃ।

ঐবহুনাথ চক্রবর্তী বি,এ।

বিশ্বামিত্র ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিশ্বামিত্র রাজনৈতিক বীর। তিনি রাজ্য ও যোদ্ধা ; কিন্তু তজ্জ্ঞ তিনি জগতে অশ্রদ্ধ লাভ করিতে পারেন নাই ; ব্রাহ্মণের বর্ণ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত ওণে অলঙ্কৃত হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, এই মহাশব্দ নির্দিষ্ট করিয়া ছিলেন বলিয়া এবং অজ্ঞান নানা কারণে অশ্রদ্ধ লাভ করিয়াছেন ।

বিশ্বামিত্র বৈদিককালে অবিভূত হইয়াছিলেন । জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদেও তাঁহার নামোল্লেখ দেখা যায় । তিনি যে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদে তাঁহার কোন বিবরণ প্রকটিত নাই । ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একস্থানে তিনি রাজপুত্র * বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে, বিশ্বামিত্র শতরু ও বিপাশা নদীর

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গুনশেক উপাখ্যানে ইহার বর্ণনা দেখা যায় । মহর্ষি বিশ্বামিত্র গুনশেকের প্রাণ রক্ষার প্রস্তুত হইয়া তাতাকে পুষ্পে স্বীকার করিলে গুনশেক বলিয়াছিল,—

“সহ উবাচ গুনশেকঃ স বৈ বধা নো জাপয়া রাজপুত্র তথা বদ । নৈবৈবান্দিগদঃ সয় পেয়াস্তব পুত্রহানিতি ।”

সংযোগহলে উপস্থিত হইয়া আপনাকে কুশিকের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন * । এক্ষণে এই কুশিকের পরিচয় জানিতে পারিলেই আমরা বিশ্বামিত্রের পরিচয় পাইব । ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও বিশ্বামিত্রের পূর্বপুরুষগণের আভাস পাওয়া যায় † । তদ্বারা স্পষ্ট

* সমধর্মসে বচসে সমাধা

অতাবরীরূপ মুহুস্ত মটোঃ ।

প্রাসিদ্ধমুচ্চ বৃহতী মনীর।

অবশ্যচরশে কুশিকস্ত যুঃ ॥ ৩৫ঃ ৩৩ অঃ

মহায়া সাধন উহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে একরলে বাগিয়াছেন “কুশিকো রাজা বত্ব” কুশিক বলিয়াছেন ।

† বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণকুমার দেবরাতের রক্ষা-বিধান করিয়া স্বয়ং পুত্রদগকে বলিতেছেন,—
“এব বঃ কুশিকা বীরো দেবরাতস্তমসি চক্ৰঃ
যুয়ান্ দায়স্মে উপেতা বিভাঃ যানুচ বিশ্বমিত্রঃ
তে সম্যকো বৈশ্বামিত্রাঃ সন্তে সাকং সরাতিরঃ
দেবরাতার তচিতরে যুটো প্রৈত্যাঃ গাধিনঃ ।

অধীরত দেবরাতো রিকৃপমোকতমোঃ অশ্রিতঃ
অকুনাকাধিপত্যে নৈবে বেদে চ গাধিনঃ ॥”

“তে কুশিকগণ ! এই দেবরাত তোমাদের অধিপতি হইলেন, তোমরা ইহার অঙ্গশয্যা কর । উনি তোমাদিগকে আমার দায়িত্ব-রূপে গ্রহণ করিবেন এবং আমাদের সমস্ত বিজয় পারদর্শী হইবেন ।” বিশ্বামিত্রের এই

ঐকীভ হইবে, বিশ্বামিত্র জঙ্ঘু ও গাধির
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে
জঙ্ঘু, কুশিক, গাধি (গাধি) ও বিশ্বামিত্র
ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণীত হইলেই
বিশ্বামিত্রের পরিচয় স্পষ্ট পাওয়া যাইবে।
মহাভারত আদিপর্বে বর্ণিত আছে কুশিকগণ
অমিত্তেজা জঙ্ঘুর বংশে উদ্ভূত হইয়া
ছিলেন *। এই জঙ্ঘু চন্দ্রবংশীয়। ইনি
অমাবস্ত্যর অধস্তন চতুর্থ পুরুষে অবতীর্ণ

কথা ঐবংশে গাধিবংশীয় বৈশ্বামিত্রগণ স্বেচ্ছা-
পূর্বক দেবরাতের অনুগত হইয়া রহিল।
ঐক্সণে ঐবি দেবরাত জঙ্ঘুদিগের আধিপত্য
এবং গাধিদিগের বৈষম্য প্রাপ্ত হইলেন।

* অমরাঃ কুশিকাঃ রাজান্

জঙ্ঘোরমিত্তেজসঃ ॥ তথাচ গাক্ষেডে

অত্রিঃ সামন্তত ভার্য্যা তায় সুরত্তরোঃ প্রিয়া ।

সৌমিত্ততাং বুধো জ্ঞেয়ঃ বুধপুত্রঃ পুরুষবাঃ ॥

বুধপুত্রাদিবোধিতাং বটপুত্রোক্ত প্রভাব্যবঃ ।

বিদ্যাবহুঃ শতাব্দ্যুচ্চ আবুর্জীমানসাবহুঃ ॥

অদ্যাবসোহতুতীমো তীমপুত্রোক্ত কাকনঃ ।

কাকনতঃ হুহোজোহিতুং জঙ্ঘুশাতুং হুহোজতঃ

জঙ্ঘোঃ হুহুজতবৎ হুহুজোঃ স্পর্শরাজকঃ ।

বলাকাবোধিত পুত্রোহিতুং বলাকাবাং

কুশঃ সূতঃ ॥

* কুশাখঃ কুশনাভশ্চামৃতিরনো বসুঃ কুশাং ।

গাধিঃ কুশাখঃ সংজ্ঞে বিশ্বামিত্রতদাশ্রয়ঃ ॥

হয়েন। ইহাঁর পর ক্রমান্বয়ে জম্বত, কপ-
রাজক, বলাকাখ, কুশ, কুশাখ ও গাধিরাজ
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র
গাধির পুত্র সূতরঃ বিশ্বামিত্র চন্দ্রবংশীয় *।

কস্তা সমাবতী দত্তা অটিকার বিজার সা ।

অটীকাসদমদধিচ্চ রামস্তুত্যা তবৎ সূতঃ ॥

গরুড়পুরাণ ।

* হরিবংশে লিখিত আছে, কুশের চারি-
পুত্র কুশিক, কুশনাভ, কুশাখ ও মৃতিমৎ
শৌক কুংসী কুশিকের বনিতা; উহারই
জ্যেষ্ঠ গাধি জন্মগ্রহণ করেন।

কুশপুত্রাঃ বহুবুধি চত্বারো দেববর্জসঃ ।

কুশিক, কুশনাভশ্চ কুশাখো মৃতিমাংস্তথা ॥

স গাধিরভবদ্রাজা মঘবান্ কৌশিকঃ স্বরম্ ।

শৌককুন্তভবদ্রায়া গাধিস্ততামজারত ॥

হরিবংশ

বিশ্বামিত্রজ দারাদং গাধিঃ কুশিকনন্দনঃ ।

জনরামাস পুত্রস্ত তপোবিত্ত সমাস্ককম্ ॥

কোন কোন গ্রন্থে কুশিক, কুশাখ ও
কুশাখ লইয়া বিধম গোলযোগের উৎপত্তি
হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে রাজা গাধি
কুশাখের পুত্র। বধা, তেযাং কুশাখ শঙ্ক-
তুল্যোমে পুত্রোভবেদিত তপশ্চচার। তত্কে-
ঐতশমবলোক্য নাতবহুজোহমৃত্যুনাবীঃ
ইত্যাম্মনেব অস্ত ইন্দ্রঃ পুত্রব্রহ্মগজ্জং । গাধি-
নাম স কৌশিকোহতবৎ ॥

বিখ্যাসিক্তের কোন পিতৃপুত্র সর্ব প্রথম রাজ্য হইরাছিলেন, তাহার প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তিনি “পৌরব” “ভরত” “কৌশিক” প্রভৃতি নামে অভিহিত হইরাছেন; সুতরাং তাঁহাকে এককালে পুরু, ভরত ও কৌশিকের বংশধর বলা হইতেছে। পুরু, ভরত ও কৌশিক চক্রবংশে উৎপন্ন হইলেও এক শাখাতেই উদ্ধৃত কি না, আমরা এক্ষণে তাহাই দেখিতেছি; এবং সেই সঙ্গে ভারতের তদানীন্তন রাজ-কৈতিক অবস্থা পাঠকদিগের সম্মুখে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

পূর্বে বলা হইরাছে যে, বিখ্যাসিক্ত প্রাসিক চক্রবংশে উদ্ধৃত হইরাছিলেন। তাহার পিতৃ

হরিবংশ ও মহাভারতে কৌশিকই গাধির পিতাক্রমে বর্ণিত হইরাছেন। তদ্বাচ্য—
“কৌশিকস্ত তপস্তপে পুত্রমিত্তসমমিত্তঃ।
লভ্যমিত্তি তং শক্রজ্ঞানাত্যোত্য জজ্ঞবান।
পূর্ণবর্ষসহস্রে বৈ তস্ত শক্রোহুপশ্রুত।
অত্যাশ্রুতপসং দৃষ্ট। সহস্রাক্ষঃ পুরুষরঃ।
সমর্থঃ পুত্রজননে স্বমেবামশবামশং ॥
স গাধিরন্তবজ্রাণা মমবান্ কৌশিকঃ স্বরম্।

হরিবংশ।

তদবান্ বান্দ্রীকি বলেন গাধি কুশনাভের

পুত্রঃ—

“কুশনাভস্তদ্বান্দ্রীকিগাধিরিত্যেব বিক্রতঃ।”

হাভোয় নাম মহোদয়। সেই রাজ্য কুশবাক কর্তৃক স্থাপিত হইরাছিল। কিছুকাল অতীত হইলে ঐ মহোদয়ের পরিবর্তে কান্তকূট নাম প্রচলিত হয়। কান্তকূট স্থাপিত হইবার পূর্বে উভ্যেদর রাজ্য কোথায় ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। হরিবংশে বর্ণিত আছে রাজ্য কৌশিক বনচরী পল্লবদিগের।। সহিত সম্বন্ধিত করিয়া ইজুগা পুত্রনাভের ইচ্ছায় উৎকট তপশ্চরণ

কবান্দ্রীকি রামায়ণ বাণকাণ্ড ৩২শ সর্গ ৪৪৮।

। যে সকল ক্ষত্রিয়জাতি ক্রিয়ালোপ ও আক্ষিপাদিগের দশনাভাব প্রাপ্ত পতিত হইরা ছিল, পল্লবগণ তাহাদের অস্তিত্ব ননৈকস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃশসং গতা লোকে আক্ষিপাদর্শনেন চ। গোপ্তৃকাক্ষোপ্তৃপ্রবিভাঃ কাথোজাঃ দবনঃ।

পক্ষাঃ।

পারদাঃ পল্লবান্দ্রীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খণাঃ”
মহু ১০ম সর্গে।

অপিচ মহাভারত পাণ্ডিপর্বে।

“দবনঃ কিরাতা গাক্ষারান্দ্রীনাঃ শবরবর্ষমাঃ।
শকাস্তারা ককাস্ত পল্লবান্দ্রীক্যমহকাঃ।
গোপ্তৃঃ পুলিনাঃ সমাঃ কাথোজাষ্টেন
দর্শনঃ।

অক্ষকস্ত প্রহৃত্যন্ত—

বিকৃপণ ও নারদীর পুত্রাণ্ড ৪৪৮।

করিয়াছিলেন। কুশিক রাজা হইয়াও বনজারী গল্পবদিগের সহিত কেন মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কুশিক কি রাজ্যচ্যুত হইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে গল্পবদিগের সাহায্যে নিজ রাজ্য উদ্ধার অথবা নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন?

বিখ্যামিত্রের জন্মসম্বন্ধে এই অদ্ভুত উপাখ্যানটী শুনিতে পাওয়া যায়। রাজা গাধার সত্যবতী নামে একটী কন্যা ছিল। কণ্ডুলোভূত মহর্ষি ঋচিকের সহিত তাহার পরিণয় হয়। ব্রাহ্মণগণোপেত উপযুক্ত পুত্রজন্মের বাসনার মহর্ষি ঋচক সত্যবতীর সহিত চক্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন; অনন্তর সত্যবতীর জননী মাহাতে যুদ্ধবিক্রান্ত পুত্র লাভ করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যেও তদুৎসাহে চক্র প্রস্তুত করিয়া দেন। এইরূপে মাতা ও কন্যার ভ্রাতৃ ভিন্ন গুণসম্পন্ন এই প্রকার চক্র প্রস্তুত হইলে মাতা কোণশ করিয়া নিজ চক্র কন্যাকে দিলেন এবং কন্যার চক্র স্বয়ং ভক্ষণ করিলেন। ইত্যবসরে ঋচিক গৃহে প্রত্যাপন্ন করিয়া দেখিলেন, সত্যবতীর শরীর হইতে রৌদ্রতেজ নিঃসৃত হইতেছে। তদদর্শনে দাতিশ্বর বিস্মিত ও ভীত হইয়া তিনি বনিতাকে বলিলেন, ‘হা পাপীরসি! কি কুকাণ্ড করিয়াছিস! তোর দেহকে অগ্নিব রৌদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে।’ ভূমি দিশ্চরই তোহ মাতার

ভ্রাতৃ সংকৃত চক্র ভক্ষণ করিয়াছিস। সেই চক্রেতে আমি শৌর্য, বীৰ্য ও বল আরোপ করিয়াছিলাম এবং তোর চক্র অধিল শক্তি, জ্ঞান, তিতিকাদি ব্রাহ্মণসম্পদে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। প্রভাবিতা সত্যবতী পতির পদপ্রান্তে পতিত হইয়া গলদশ্রবণে বাশ্পাক্ত কণ্ঠে বলিলেন, “প্রভো! না জানিয়া আমি সে চক্র ভক্ষণ করিয়াছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন এবং বাহাতে আমার পুত্র ক্ষত্রিয়গুণে অলঙ্কৃত না হইয়া পৌত্র হইয়ন, অনুগ্রহ করিয়া সেইরূপ উপায় বিধান করুন।” ঋচক “এবমন্ত” বলিয়া নিরস্ত হইলেন। যথাকালে সত্যবতী ব্রাহ্মণগণোপেত এক পুত্র প্রসব করিলেন; তাঁহার নাম যমদগ্নি। এ দিকে তাঁহার জননী কর্তৃক বিখ্যামিত্র প্রস্তুত হইলেন। যমদগ্নি ইক্ষাকু কুলোভূত রেণুর হৃদিতা রেণুকার পুত্রগ্রহণ করিলেন। সেই রেণুকার গর্ভে ক্ষত্রিয়কুলান্তক মহাবীর পরশুরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন *।

বিখ্যামিত্রের প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা জানবার কোনই উপায় নাই। হরিবংশের এক স্থলে বর্ণিত আছে, বিখ্যামিত্র বিশ্বরথ

* বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অধ্যায়, মহাত্ম্যস্তম-
বনপর্ব ও হরিবংশঃ।

নাথে প্রসিদ্ধ ছিলেন । কতদিন তিনি বিশ্বরথ নামে বিদিত ছিলেন, এবং কোন সময়ে ও কি কারণেই বা বিশ্বামিত্র নাম প্রাপ্ত হইলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন । কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ব্রাহ্মণত্ব লাভের পর বিশ্বরথ বিশ্বামিত্র নামে প্রসিদ্ধ হইলেন * ! কিন্তু সে অনুমানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারা যায় না ।

বিশ্বামিত্রের চরিত্র সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মহাভারতের শলা পর্বে বর্ণিত আছে । পুরাকালে গান্ধি নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় নরপতি ছিলেন । মহাপ্রতাপবান বিশ্বামিত্র তাহার পুত্র । রাজা গান্ধি মহাযোগী হইরাছিলেন । আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তাহার নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাওয়াতে তিনি রাজ্যপালন করিতে চেষ্টা করিলেন না এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বামিত্রকে সিংহাসনে অভিষেক করিয়া স্বয়ং দেহ ত্যাগে বনোনিবেশ করিলেন । তখন তদীয় রাজ্যে রাক্ষসের উপদ্রব বৃদ্ধি হওয়াতে প্রজাবৃন্দ

নিভাত্ত হৃৎখিত হইয়া বিনীতভাবে বলিল, “মহাপ্রাজ্ঞ ! আমাদেরকে এই মহাত্মর হইতে রক্ষা করুন ; এক্ষণে আপনি রাজ্য ভোগ করিবেন না ।” গান্ধি তাহাদের প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না ; বিশ্বামিত্রকে রাজ্যসনে স্থাপন করিয়া তিনি ত্রিদিবশ্যমে গমন কাবলেন । বিশ্বামিত্র বিশেষ যত্নবান হইয়াও পুণিবারে রক্ষা করিতে পারিলেন না । রাক্ষসদিগের উপদ্রব হইতে রাজ্যের অশান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে তিনি তিনি চতুৰ্দশ সেনাবল সহ নগর হইতে যাত্রা করিলেন এবং দূরগত অরণ্যে গমন করিয়া বসিষ্ঠাপ্রসে উপনীত হইলেন । তথায় তাঁহার সৈন্তগণ আপনাদের বাসোপযোগী অসংখ্য গৃহ নির্মাণ করণ । এক্ষণে বিশ্বামিত্রের সেনা কষ্টকৃত্তে পোষন ভোগ হইতে দেখিয়া সুনিগদম বসিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বীয় পাভীকে আদেশ করিলেন “তীব্র শব্দ-মিগকে শ্রব কর ।” দেখ তখনই তীব্রমর্শন শব্দদিগকে স্মৃতি করিয়াই তাহার চতুর্দিক হইতে বিশ্বামিত্রের সৈন্তদিগকে আক্রমণ করণ । তাহাদের প্রচণ্ড বল আভি-রোধ করিতে না পারিয়া রাজা বিশ্বামিত্রের সৈন্তগণ প্রাণতরে ইতঃপুতঃ পলায়ন করিতে লাগিল ।

স্বায়ং সৈন্তগণের পরাভব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র অতিশয় হৃৎখিত হইলেন

* বিশ্বামিত্রত্ব ধর্ম্মায়া নাম্না বিশ্বরথ স্তুতঃ

জজ্ঞে ভৃগুপ্রসাদেন কোশিকাবংশধ্বজনঃ ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিশ্বামিত্র শব্দের এই-রূপ ব্যুৎপত্তি করা হইরাছে ;—

“বিশ্বজ্ঞয়েণ যো মিত্রঃ কর্ত্ত্বঃ ন শকিতাঃ পুরা ।

বিশ্বামিত্রস্ত তে মৈত্রীমিষ্টকাকর্ষ্মিচ্ছতি ॥”

এক তপোবলই প্রেষ্ঠ কিং করিয়া সরস্বতী
বলীভীরে সমাহিত চিত্রে উৎকট
তপস্তার মনোনিবেশ করিলেন । দেবগণ
তাঁহার ত্রুতত্বমানসে নানা বিস্ময়াধা হৃদয়
করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই বিখা-
মিত্রকে নিবশিত করিতে পারিলেন না ।
এইরূপে পরম যত্ন সত্বেও বহুবিধ তপস্তা
যারা তাঁহাকে ভাষ্যের ভার তেজস্বী হইতে
দেখিয়া পরমেষ্ট পিতামহ তৎসমীপে আবি-
র্ভূত হইলেন এবং অর্ধ ট বর্ষপ্রার্থনা করিতে
জ্ঞাপন করিলেন । বিখামিত্র বলিলেন,
“আমি ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা করি।” সর্ক-
লোকপিতামহ ব্রহ্মা “তাৎস্বী হইবে” বলিয়া
অভিহিত হইলেন । এইরূপে মণ্ডাশা বিখা-
মিত্র উগ্র তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়া
কৃতকাম হুয়ের ভার কৃত্যম। পৃথিবীতে বিচরণ
করিতে লাগিলেন ।

মহাতারতের শল্য পর্য্যন্ত এই সজ্জপ্ত
বৃত্তান্তের অভ্যন্তরে মহাত্মা বিখামিত্রের
অতিমাত্রাব অবদান পরম্পরা নিহিত রহি-
য়াছে । আমরা ক্রমে ইহাকে বিস্তারিত
করিয়া তাঁহার অদ্বুত চরিত্র ব্যাখ্যা করিও
চেষ্টা করিতেছি । পূর্বে বলা হইয়াছে রাজা
বিখামিত্র চন্দ্রবংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন ।
চন্দ্রবংশ অতীব বিখ্যাত । প্রথিতনামা অধি-
কংশ আশ্যবীরই এই পবিত্র চন্দ্রবংশে জন্ম-
গ্রহণ করিয়া ভারতের নানা স্থানে রাজ্য-

স্থাপন করিয়াছিলেন । চন্দ্রবংশ পুত্র তগবান্
বৃহ চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা । বৃহ বৈবস্বত
মহুর হুহিতা ইলার পাণিগ্রহণ করিয়া তদগত
রাজ্যবি পুরুষবাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন ।
গৌরাণিকদিগের মতে পুরুষবাই চন্দ্রবংশের
আদি রাজা । পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে
পাওয়া যায় সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ জগতের মধ্যে
দুইটি অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ রাজবংশ । এই
দুইটি বংশ ঠিক এক সময়েই ভারতে প্রতি-
ষ্ঠিত হইয়াছিল । সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের পূর্বে
ভারতে কিংবা জগতের অন্য কোন দেশে অন্য
কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল কি না,
তাঁহার কোন বিবরণই জগতের ইতিহাসে
দেখিতে পাওয়া যায় না । চীন, আসিরিয়া
ও মিসরের যে তিনটি প্রাচীন রাজবংশের
বিবরণ তত্ত্বদেশের গৌরাণিক ইতিহাসে
প্রকটিত আছে, তাঁহারা ভারতে সূর্য্য ও
চন্দ্রবংশ-প্রতিষ্ঠার বহুকাল পরে তত্ত্বদেশে
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । বলতঃ এই দুইটি
মহাবংশই জগতের অন্ত্যস্ত প্রাচীন বংশের
মধ্যে প্রাচীনতম । তগবান্ সূর্য্যের তনয়
মহু সূর্য্যবংশের এবং তগবান্ চন্দ্রের পুত্র বৃহ
চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা । দুইটি মহাপুরুষ
ঠিক এক সময়েই স্ব স্ব বিশাল বংশের এক এই
পুণ্যভূমি ভারতে রোপণ করিয়াছিলেন ।
কিন্তু বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে বৃহ-
দেবকে তগবান্ মহুর একপুরুষ পরবর্তী

বসিয়া অবধারণ করিতে হইবে; কেন না তিনি তাঁহার এক পুরুষ পরে অবতীর্ণ হইয়া তদীয় ছবি তা ইলার পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন। শূরাগণদি এবে যে, ভারতীয় অভ্যন্তরীণ জীবনের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই এই দুইটা বিশাল বংশতরুর শাখা প্রশাখা মাত্র। কবিগুরু বান্দ্যকি সূর্য্যবংশীর এবং কবিকুলজিতক মচর্ষি কৃষ্ণ-বৈশাখ্যন চন্দ্রবংশীর নরপতিগণের পবিত্র চরিত সর্বপ্রথম গাথাবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাদের উভয়ের মধ্যেই বান্দ্যকিই আদি কবি। তাঁহার বহুকাল পরে মচর্ষি কৃষ্ণ-বৈশাখ্যন কর্তৃক সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীর নরপতিগণের ঐতিহাসিক বিবরণ গাথাবদ্ধ হয়। তিনি যে বান্দ্যকি রামায়ণের চারি অবলম্বন করিয়া রবিকুলকাহিনী লিখিয়াছিলেন, মধ্য-ভারত পাঠে তাহা স্পষ্ট বুদ্ধিগত পাবা যায়।

পূর্বে বলা হইয়াছে, ভগবান বৈদ্যনাথ মহা সূর্য্যবংশের এবং চন্দ্রকুমার বৃষ চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ। মহুর পুত্র ইক্ষ্বাকু এবং তদীয় অন্তিম পুত্র নিমি কর্তৃক সূর্য্যবংশীর দুইটা বিশাল শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই দুইটা শাখা ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ শাখা নামে প্রসিদ্ধ। আদিপুরুষ ভগবান রামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশে এবং লোকললাভূতা সতী প্রধানা সীতা বিদেহ কুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ এক সময়ে ভারত দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেও

ঠিক এক সঙ্গে এক জগৎ পদ্ধতিতেই পুষ্টিলাভ করে নাই। চন্দ্রবংশ বীর সূর্য্যভাবের পরিসুপ্ত হইয়াছিল;—অর অর করিয়া বিপুল বল অর্জন করিয়াছিল। একলা সেই মনের প্রচণ্ড প্রভাবের পরাক্রম হইয়া অর্ধেক আশিয়া-খণ্ড তাঁহাদের সহায়তা করিবার নিমিত্ত কঠোর কাণ্ডক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু সূর্য্যবংশ সেরূপ নহে;—তাঁহার লক্ষ্য জ্যোতি একবার উদ্ভিত হইবার পরে দেখিতে প্রথমতঃ হইয়াছিল; দেখিতে দেখিতে মানবমণ্ডলীর অসঙ্গ হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে বিদগ্ধ করিয়াছিল। একলা সূর্য্য লঙ্কাবীণ ও ইহার প্রচণ্ড তেজে তরুত হইয়া গিয়াছিল। সূর্য্যকুলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র এবং চন্দ্রবংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তদন্তীত ব্রহ্মাণ্ড, তরিতন্ত্র, ধর্ম্মমার ও জনক এবং ভবত, কান্তবীর্ষাঙ্গন, হৈহয়, কোবলগণ ও অনাসক প্রভৃতি বীরগণ উদ্ভূত হইলেও উক্ত মতাপুরুষদের অলৌকিক অবদান দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ পরীক্ষান হইয়া বহিরাগত।

বিখ্যামিত্র যে সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ভারতের অনেক কালে আধার্য্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—যাযা সত্যতা সূর্য্য বাক্যিনীতা ক্রমেও প্রবেশ করিয়াছিল। সেই সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের যে করেতী শাখা প্রশাখা ভারতের নানান্যানে ঘোণিত হইয়া

ছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে কৈকর, বিদর্ভ, বৈবেহর, অঙ্গ, কালিঙ্গ, পাঞ্চাল, দ্রাবিড় ও কৌশিকগণই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত শাখা কুলের মধ্যে অন্তঃবিবাহ প্রচলিত ছিল; ইহারা কখন স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিত, কখন বা রাজচক্রবর্তী পদনিষ্ঠা কোন বিজয়ী অধিরাজের অধীন থাকিয়া করর বা সামন্ত রাজরূপে পুঞ্জোপচার বোণাইরা দিত। এই সকল রাজ্যের অধিকাংশই আৰ্য্যাবর্তের ছিল। দণ্ডক, তুঙ্গবল্লী ও ক্রত্বার কচিং কোন রাজকুমার আৰ্য্যাবর্ত পরিত্যাগ করিয়া অনার্য্য দেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। সে যাহা হউক, সেই সকল নরপতি ও তাঁহাদের রাজ্য সমূহের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে :—সেই সকল শাখা রাজ্যে এবং প্রধান বংশতরুণের স্বর্গ্য ও চন্দ্রবংশের সহিত কৌশিকদিগের কিরূপ সম্বন্ধ দ্বারা বিশ্বাসিতের ইষ্টানিষ্ট কিরূপে কতদূর নিবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার চরিত্র কিরূপ ক্ষুণ্ণি পাইয়াছিল, এক্ষণে আমরা সজ্ঞে তাহারই অমূল্যলন করিতেছি।

“বীরভোগ্যা বহুব্রহ্মা”—অতি প্রাচীন প্রবাদ। সত্যতার প্রায় সকল অবস্থাতেই সকল দেশেই এই প্রবাদের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। একদা বীরত্ব কেবল সৌর্য্যবল ও সামর্থ্য দ্বারা পরিমাপিত

হইত; ক্রমে সত্যতারুদ্ধির সহিত মানসিক বল শারীর বলকে পরাধীন করিয়া দীরত্বের পরিমাপক হইয়াছে। এখন বাহুবল আর একত বল নহে,—মস্তিষ্ক বলই প্রধান বল। ভারতে চিরকালই বাহুবলের আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে বাহুবল বুদ্ধিবিরহিত সামান্ত পাশব বল নহে;—মস্তিষ্কবল দ্বারা সেই বাহুবল অনেক পরিমাণে নিবৃত্তি হইত। নতুবা আৰ্য্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী অনার্য্যমণ্ডিত ভারতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইত না;—নরমাংসাসী অসংখ্য রাকসের মধ্যে সুষ্টিমের কতিপয় বিচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণ উপনিবেশ দ্বির থাকিতে পারিত না। ভারতে স্বর্গ্য ও চন্দ্র বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যিনি উৎকৃষ্ট বাহুবলে বলীমান হইয়া অবশিষ্ট সকলের উপর জয়গাত করিয়াছেন, বহুবলী তাঁহারই অকণাশ্রিনী হইয়াছেন। তিনিই রাজত্ব যজ্ঞে স্বীয় সার্বভৌমিক সগমাণ করিত ক্রটি করেন নাই। ভারতের পুরাতত্ত্বে এক্ষণে অনেক সার্বভৌমিক অধিরাজের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাহাকে একত রাজচক্রবর্তী বা রাজাধিরাজ বলে, ত্রীরায ও যুধিষ্ঠিরের পূর্বে স্বর্গ্য ও সোম বংশে সেরূপ কোন বীর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি না, বলা যায় না।

[ক্রমশঃ]

ত্রীকোণের বঙ্গোপদ্রাঘ্য কবিত্ববর্ণন।

৩ আমাদের কর্তব্য ।

আমাদের কর্তব্য রাজ্য করিয়াছেন। বঙ্গ
জয় করিব বলিয়া রাজ্য। যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন, কিন্তু ৩০ সে আশিন সে প্রতিজ্ঞা
কার্যে পরিণত হইয়াছিল। এত বাদ প্রতি-
বাদ, প্রকারবর্ষের এত অল্পরোপ উপরোপ
উল্লেখ করিয়া রাজ্য-বাহ্য কর্তব্য বিবেচনা
করিয়াছিলেন—তাহা অত্যন্তের সঙ্গত
করিলেন, কোন বাধাই মানিলেন না। ঐ
কিন্তু—স্বাধীন বিধি—অনুসারে বঙ্গ ভঙ্গের
যৌগ্য পাত্র প্রচলিত হইলে আমরা অশেষ
একান্তের পদাশ্রয় করিয়া রাখি বঙ্গ
করিয়াছিলাম। ৩০ সে আশিন বঙ্গবাসীর
নিকট কে কি বিষাদের দিন হইয়াছিল—
তাহা আমাদের বিদেশীর রাজ পুরুষেরা কি
জানিবেন। কিন্তু সে দিবস বঙ্গ ভঙ্গ করিয়া
রাজ্য আমাদের পৃথক করিতে চেষ্টা করিলেও
আমরা যে কিছুতেই পৃথক হইব না, আমরা
সে পৃথক করা যে কাহার সাধ্য নাই, সেদিন
অল্প রাজপুরুষ কেন আপুণিই সকলেই তাহা
বুঝিয়াছিলেন, আমাদের একতা বন্ধন দেখিয়া
সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রত্যেকাঙ্গে
পদাশ্রয় করিয়া বঙ্গবাসী সকলে তাই তাহ
কুষ্ঠাই হইয়া রাখি বন্ধন করিয়া কলিকাতার
দিলক নিকরতিস্থলে অগ্রসর হইয়াছিল।

সেই অনন্তর, অনন্তর উক্তকর্তৃক সেই
গুরুভের বঙ্গের পৃথক পৃথক প্রবণ করিলে
কে বলিলে সে দিন আমাদের বঙ্গ ভঙ্গ করা
হইয়াছিল? কে বলিলে যে আমরা রাজ্য
আমাদের পৃথক হইয়াছি? বঙ্গ কর্তৃক
রক্ষিত এই বঙ্গদেশকে পৃথক করে লগ্ন
এমন সাধ্য কাহার? সমস্ত বঙ্গ হুজু
হয়—বলি ভাই হইয়া তাহাদের প্রতি আশ-
রিত টান থাকে; তাহা হইলে পৃথক করা
কাহার সাধ্য নহে। বঙ্গের পারিমা, ৩০ সে
আশিন বঙ্গ ভঙ্গ হইয়াছিল কি বঙ্গদেশ পুন-
রায় যোড়া গাথিয়াছিল। তাহা বাহ্য পুরুষের
বিচার করিবেন। সেজন্য এক প্রাণতঃ
সেজন্য আশ্রিতিক ঐকান্ত বঙ্গ আর কথা
হয় নাই। ঐ দিবস বঙ্গবাসীর একতা
বন্ধন দেখিয়া রাজ পুরুষগণ সকলেই মনে
করিয়াছিলেন নিশ্চয়ই কোনরূপ রাজবিদ্বেষ
উপস্থিত হইবে। এই জর তাহার সকলেই
সতর্কভাবে অবগত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে
দিনকার কার্য এত নির্ভয়ে ও নিরাপদে
সম্পাদিত হইয়াছিল যে, সকলেই দেখিয়া
নিশ্চয় হইয়াছিলেন। রাজ পুরুষগণ যে
নিভান্ত ভ্রমে গতিত হইয়া বিদ্বেষের
অশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর কণ-
মাংস সন্দেহ নাই। বাঙালী বিদ্বেষী হই-
বার ক্ষমতা সে দিন একরূপ মিলিত হয় নাই।
এই অকণ বঙ্গব্যবচ্ছেদ কার্যে ব্যর্থ হইতে

তাহাদের স্বাধৃত্য অক্ষর থাকে, বাহাতে তাহারা আর কোনও ক্রমে পৃথক না হয়। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা একত্র মিলিত হইয়াছিল। এতদিন তাহারা রাজার স্বার্থপন্থী হইয়াছিল, এখন হইতে তাহারা বাহাতে নিজ নিজই আপনাদের দুঃখ, বদেশবাসীর দুঃখ, জননী জন্ম-ভূমির দুঃখ দূর করিতে পারে; বাহাতে আপনায় পদ-তরে আপনি দাঁড়াইয়া কাজ করিতে পারে, সেই জন্ত তাই তাই মিলিত হইয়া প্রাণের দুঃখ জানাটরাভিল এবং বাহাতে আমরা এবার হইতে প্রাতৃত্বাবে বৃক্ষরূপে আবদ্ধ হই, বাহাতে বদেশ ও বদেশ বাসীগণের উন্নতি করে বদেশীর দ্রব্য ব্যবহারে প্রাণপণ করি, সেই জন্ত পরস্পর প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। ইহাতে রাজ বিজ্রোহিতা কি? এ আন্দোলনের সহিত রাজার কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা প্রাণোন্নতি করিব। বিদেশীর স্বার্থপর বণিকগণের হস্ত হইতে বদেশকে রক্ষা করিব। ইহাতে রাজার আপত্তি কি? রাজা যদি ব্যবসাদার না হইয়া স্বার্থ রাজা হইতে চাহেন, তাহা হইলে ব্যবসাদারী স্বার্থ টুকু তাহাদের হাড়িতে হইবে নতুবা স্বর্গীয় “রাজা উপাধীতে ভূষিত হওরা কি ব্যবসাদারের সাধ্য? রাজা যে পৃথিবীর দেবতা ব্যবসাদারের সাধ্য কি যে এ উপাধী গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়? রাজা আমাদের স্বার্থই রাজার কাজ করিরছেন। বদ

ব্যবচ্ছেদ রূপ বহাভাবে আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। তাই আজ বহদিনের পর আবার আমাদের নোহিন্দ্রা ঘুড়িয়াছে। তাই বদেশী আন্দোলনের সন্মোহন-মন্ত্রে আমরা পুনরায় সজীবীভ হইয়াছি, তাই আজ আমরা প্রত্যেকের অভাব বৃদ্ধিতে পারিরা তৎপ্রতিকারার্থে আবার বন্ধ-পরিকর হইয়াছি। সুবাতাস বহিয়াছে—আমাদের মতিগতির পরিবর্তন হইয়াছে। আজ বহদিন-বিস্মৃত একটা ক্ষীণশক্তি যেন এ দেশবাসীর শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া, পুনরায় তাহাদিগকে জাতীয় একতা বন্ধনে উত্তেজিত করিতেছে। সেই উত্তেজনার কণই এই “বদেশী আন্দোলন।” মহামারীর মহাশক্তিতে পরিচালিত হওয়ার আজ জাতীয়-মহাশক্তি ক্ষীণ কণপ্রভার দ্বার আমাদের জগরে শক্তিসংকার করিতেছে, তাহারই ক্রপার যে আমাদের শব্দপ্রায় জড় দেহ পুনরায় শক্তিমত্ত হইতেছে, তাহা কেনা স্বীকার করিবে? বদ ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়াই যে আমরা দীর্ঘ প্রাণোদিত হইরা এই “বদেশী আন্দোলন” কার্যে ব্রতী হইয়াছি।—ইহা যেন কাহার ধারণা না থাকে। “বদেশী আন্দোলন” এখন আমাদের একান্ত আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা আমাদের জীবন রক্ষার আর অন্য উপায় নাই। একটু দীর্ঘ ও দীর্ঘ তবে বিবেচনা করিলে সকলেই

সহজে বুঝিতে পারিবেন—আমরা কি হিলাফ কি হইরাছি, আর কিছুদিন পরে আমাদিগকে কি হইতে হইবে! আম কাল আমাদের চাকুরী ভিন্ন জীবিকা নির্বাহের আর অন্য উপায় নাই। সকলেই জাতীয় স্বাধীনতা ছাড়িয়া দিয়া, একমাত্র চাকুরী উপর লক্ষ্য করিয়া বসিয়াছি—কিন্তু তাহা আর কতদিন। সমগ্র ভারতবাসীর অন্ন সংস্থান করা তাহাদের সকলের অভাব বুঝিয়া চাকুরী প্রদান করা, পৃথিবীই অন্ন দেশ সমূহ আর কয় দিন পারিবে? আমরা যদি এখন হইতে আমাদের কর্তব্য কার্যে অগ্রসর না হইয়া চিরকাল ঠিক এইরূপ ভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আর কিছু দিন পরে আমাদিগকে নিশ্চয়ই অনশনে দিনপাত করিতে হইবে! দেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে এখন হইতেই আমাদের দেশে প্রায় অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ভিত্তর অন্ধাশন আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহা চক্ষের সমুখে দেখিয়াও তাহার প্রতিকারার্থে বস্ত্রবান হইতেছি। কেবল ভোগ বিলাসের বশবর্তী হইয়া দেশের কোটী কোটী টাকা বিদেশে পাঠাইয়া দিতেছি; দেশের পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ হইতেছে, তাহা একবার স্বপ্নেও ভাবিতেছি না। স্বদেশের অন্ধ্র শোণিত দানে বিদেশীয়ে পূজা

করিয়া কৃতার্থ হইতেছি, আপনার প্রতি আপনি করিয়াও দেখিতেছি না। ভাষিত কেবল রত্নগর্ভা বলিয়াই আমরা এত অগ্নি-বান দর্শনার কাণ করিয়াও এখন দেশে বসিয়া বহু কষ্টে উদরে চারিটা অন্ন দিতে পারিতেছি, পৃথিবীর অন্ত দেশ হইলে এক-দিন তাহাদের কিরূপ দুর্দশা হইত একবার ভাবিয়া দেখুন?

রাজা আমাদের বন্দিত জাতীয়, স্বাধীন করিয়া আমাদের সমস্ত স্বদেশে লইয়া যাইতেছেন, কিন্তু সে দোষ কাহার? রাজার না আমাদের? আমরা যদি দেশের ও দেশের প্রতি না ভাবিয়া তাহাদের দ্রব্য ক্রয় করি, তাহা করিয়া নিজের মুখের গ্রাস যদি পরের চোখে তুলিয়া দিই, সেত আমরা যেই দোষ। আমরা যদি বিদেশীর দ্রব্য ব্যবহার না করি, তাহা হইলে ত রাজা আর বিলাতী দ্রব্যাদি আমদানী করিতে পারেন না, দেশের দোকানদারগণও আর খরিদ করিয়া অর্থ নষ্ট করেন না। আমাদের মতি প্রতি এত দিন ধরিয়া বিলাতী ধরণে গঠিত হইয়া গিয়াছে; তাই ত আমাদের চক্ষুণার রাজা এত দুর্ভাগ হইয়াছে! এবার হইতে আমরা যে দিকে অগ্রসর হইতেছি, যে “বিশেষী আমদানীর” দুরা পরিণাম আমরা অগ্রসর হইতেছি। যদি আমরা এই আমদানী সনে সত্বতা লাভ করিতে পারি; যদি

কমিশনরীত হ্রদে আবার 'আবরা' আহাতিদি
হই, তাহা হইলে বেথিবেন পুনরায় আশিদি
লেই হ্রদের দিন কিরিয়া আসিবে, আলার
আবরা জননী অগ্ন-ভূমির শাস্তির ক্রোড়ে
বসিয়া হ্রদের তরঙ্গে ডাসিতে থাকিব ? আর
যদি এই আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া যায়, যদি
আবরা মিলের দোবে এই মহৎ আন্দোলনের
উপকারিতা উপলব্ধী করিতে না পারিয়া
পুনরায় ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে আর
আমাদের স্রষ্টা নাই। আমাদের ধ্বংস যে
সন্নিকটবর্তী তাহাতে আর কোনও সংশয়
নাই।

আমরা যদি বথার্থ শিক্ষিত হইয়া থাকি, যদি বথার্থই আমরা বদেশ ও স্বাভাতির উন্নতি কল্পে মনোনিবেশ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আর ভিলেকের জন্ত আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। কার্যের সময় হইয়াছে, কার্য কলা এখন আমাদের সকলেরই কর্তব্য হইয়াছে। সকলে মিলিয়া বাহাতে দেশের টাকা দেশে রাখিতে পারি, বাহাতে দেশের অটাক দ্রুতীভূত করিয়া স্বাভাতির বৃদ্ধিজন্য করিতে পারি, আহুন,—আমরা সেই বিষয়ে বদ্ধ পরিকর হই, তাহা হইলে দেখিবেন আর কিছু দিম পরে আমাদের সমস্ত বিবাদ, সমস্ত অবসাদ ঘুচিয়া বাইবে, আমরা আবার পৃথিবীর মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি।

আমাদের লক্ষ্যভািত ইংরাজ আমাদের
স্বদেশপন্থিত জীব্যের মহত্বের বিবরণ আমা-
দিশকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন,
কিন্তু বিগত-অভ্যাশে আমাদের বস্ত্তিক
এরূপ বিকৃত হইয়াছে যে ঐহাদের সেই
অমূল্য কথার ভাব আমরা (আমো) ভুলভুল
কবিত্তে না পারিয়া কেবল কাকুল ভ্রমে কাট
খরদ করতঃ নিজের সর্বনাশ সাধন করি-
তেছি। ইংরাজ আমাদের দেশের রাষ্ট্র
বটে কিন্তু স্বদেশীর নহেন, ঐহাদের নিকট
সম্যক উপকার লাভের আশা করা যুথ্যতা
নাই। কেনা নিজের জমজুমির উন্নতি
করিতে, স্বদেশ ও স্বজাতির ঐবৃদ্ধি করিতে
যত্নবান হন ? স্বদেশ-ঐতি ইংরাজের
শীয়ার শীয়ার ঐতিত ; আমরাই কেবল
ইংরাজী শিক্ষার কলে পণ্ড ঐকৃতি ভািত
করিয়া, জমজুমির মায়। পরিত্যাগ করিয়াছি ;
দেশকে ছারে খারে দিতেছি। আমরা বলি
আমরা ইংরাজ জাতির অনুকরণ করিতেছি।
কিন্তু ঐহাদের কোন ভলন রিবরণটির অনু-
করণ করিতে আমরা শিখিয়াছি ? বাহা
শিখিয়াছি, যে অনুকরণ আমরা অত্যন্ত হই-
য়াছি, যে অনুকরণ আমাদিশকে সর্বনাশের
পথে লইয়া কাইবে, বই ঐহাদের আমাদের
সুখের ল্যাকের কোনও আশা নাই।
আমাদের এই স্বদেশী, স্বদেশপন্থকের
রাষ্ট্রিক মতশিক্ষা করিয়া সবে করিতেছেন

অনেকে একে “বনেশী কাদামুগুনকে”
 বনেশী-কাদামুগুন-কলিরা-সবে কলিভেজেন,

বাহাৰা একুপ মনেক্ষেৰন—তাঁহাৰা নিতান্ত উ-
জ্ঞাত । আমাৰা-আমাৰেব স্বদেশজাতি ভবোব
আদৰ কৰিব, স্বদেশেৰে কৰ্ম্মসংহতিৰ প্ৰতি
প্ৰীতি স্থাপন কৰিয়া আয়োজি কৰিব,
ইহাতে রাজ্যৰ ক্ষতি কি এবং রাজ্যৰ প্ৰাণ-
কান্ধন ইহাৰ বিৰুদ্ধে কেমন কৰিয়া স্থান
পাইবে ? আমাৰা যদি বিলাতী ভ্ৰম বাবচান
না কৰিয়া দেশেৰ জিনিষ বাবহাৰ কাব,
রাজ্যৰ তাহাতে বাধা দিবাৰ ক্ষমতা কি ?
পুত্ৰ-বৎসল পিতা যেমন পুত্ৰেৰ আয়োজিত
কোনরূপ বাধা প্ৰদান না কৰিয়া বৰং সন্মত
হইয়া থাকেন । প্ৰজা-বৎসল রাজাও তদুপ
প্ৰজাৰ একুপ হিতৈৰ জন্তু স্বেচ্ছানন্দ প্ৰকাশ
কৰিয়া থাকেন । ইংৰাজ রাজা নিশ্চয়ই
নিজের স্বার্থ বলিদান দিয়া প্ৰজাৰ হিতাৰ্থে
যোগদান কৰিবেন । যে রাজা ইহাৰ
অন্তথাচরণ কৰিয়া থাকেন তিনি প্ৰজাবৎসল
নহেন, তিনি প্ৰজাপীড়ক । ইংৰাজ কি এট
শ্ৰেণীৰ রাজা হইতে চাহেন ? ইংলণ্ডেৰ
আদৰ্শ মহাৰাণী ভারতেবস্ত্ৰেৰ ঘোষণাবাদী
স্বৰণ কৰিয়া নিশ্চয়ই তাঁহাৰা প্ৰজাৰজন
কৰিতে চেষ্টা কৰিবেন ।

এখন আমাৰেব কৰ্ত্তব্যকৰ্ম্ম হইয়াছে,—
আমাৰেব ভবিষ্যৎ আশাৰ স্বৰূপ এট
“স্বদেশী আন্দোলনকে” দৃঢ় রাখা, ইংৰাজেৰ
সহিত বৰং বিৰুদ্ধাৰ কৰিয়া কোনন্ত কাজ
হটুবে না । আমাৰা ত বৰ্ত্তমান আন্দোলনী

হটুতেছি না, আমাৰেব নিজেব উন্নতিৰ
পথ উদ্ভাৱ কৰিতেছি নাজ, ইহাতে রাজ্যৰ
সহিত মনোমালিন্য কৰিলে “স্বদেশী আন্দো-
লন” বিফল হইবে, বৰং দেশেৰ লোক-খাহাৰা
ইহাৰ বিপক্ষ, বাহাৰা সুখ-সুখা অস্ত্ৰে
গৰল লইয়া একাৰ্ণা পত্ৰ কৰিবাৰ চেষ্টা
কৰিতেছে, তাহাদেব প্ৰতি প্ৰথম দৃঢ় রাখা
উচিত । সে সকল কুলাদাৰ কিছুতেই বজ্জতা
স্বীকাৰ কৰিতে চাহে না, তাহাদিগকে
সবলে আনিবলৈ জন্তু সমাজেৰ কঠিন শাসন
আবশ্যক হইয়াছে । তাহাদেব পুৰোহিত
খোণা, নাপিত এমন কি সেই স্বদেশ শ্ৰোত্ৰী-
গণেৰ সহিত বাক্যালাপ রহিত কৰিয়া,
যাহাতে তাহাদেব শাসন আমাৰেব সমাজেৰ
ব্যৱস্থাই সাধিত হয়, সে বিষয় আমাৰেব দক্ষ-
লেব চেষ্টা কৰা একান্ত কৰ্ত্তব্য হইয়া উঠি-
য়াছে, নতুবা এ “স্বদেশী আন্দোলন” কিছুতেই
হালী হটুবে না । গৃহ-শত্রু অগ্ৰে দমন কৰিতে
না পাৰিলে সমস্তই পত্ৰ হইবে । পুৰাণ
পুৰ্ণে কিনাতী ভ্ৰমাদি কৰ বিক্ৰম যেমত
হহুকাছিল, এখন আবার দেখিতেছি, বীৰে
বীৰে চলিতেছে, সবস্ত কিছু গুপ্ত ভাবে
বাহা হউক, রাজ্যৰ সহিত লড়াই আঁপিয়া
বাহাদত এই পুৰুষ শত্ৰুৰ শাসন হয়, আমাৰেব
নেতৃগণেৰ আৰ সে বিক্ৰেৰ সিলেট “খাৰু
উচিত নহে, পুনৰ্দ্ধাৰ ছাত্ৰগণকে এবিধে
নিয়োজিত কৰিতে হক্বে । ছাত্ৰগণ এ

কার্যে অতী হইলে রাজা কানাইদাসকে বিদ্যা-
লয়ে তান দিবেন না, এরূপ নিয়ম প্রচার
করিয়াছেন, কিন্তু যুবকগণই আমাদের দেশের
ভবিষ্যৎ আশাও তরসা হল, রাজা যদি
একাত্তই এবিষয়ে আইন বিধিবদ্ধ করেন,
তাহা হইলে নিশ্চয়ই কানাইদাসকে নিজের
বিশ্ববিদ্যালয় ও পরীক্ষা মন্দির স্থাপিত
করিতে হইবে। এখন ইংরাজী শিক্ষার নিয়ম
প্রণালী আর আমাদের কল্যাণ সাধন
করিতে পারিবে না, এখন আমাদের দেশে
পূর্বের ভার টোলার শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত
হইলে ভাল হয়। রাজা বাহা করেন করুন,
আমরা বিনা কারণে যেন রাজার সহিত
কলহ বিবাদ না করি, তাহা হইলে চির-রাজ-
তত্ত্ব ভারতবাসীর দুর্নাম ভিন্ন সুনাম হইবে
না। রাজা যদি অগ্র পঞ্চাৎ না বুঝিয়া
কোন কার্য করেন, সে বিষয়ের ফল-
তোপ তাহারাই করিবেন, পরিণামে আমরা
তাহার অভ্যদৌষী হইব না। এরূপে সকল
সিদ্ধরাজার রাখিয়া কার্য করিতে পারিলে
তবে “বিশ্বদেশী আন্দোলন চিরস্থায়ী হইবে ও
তাহার দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি পথ
পরিষ্কৃত হইবে, নতুবা হটকারিতার কোন
ফল হইবে না, ইহা সকলেরই মনোমধ্যে
স্থান দান করা উচিত।

সম্পাদক ।

গীত ।

বাঁহাজ—লক্ষী ঠাকুরী ।

বন্দে মাতরম্ ।

- ভেঙ্গেছে স্বপন, গাহ প্রাণ তরি,
১ অর ভারত ভারত, বদ ভূমি ।
ভেঙ্গেছে আবার, প্রাণেতে সবার,
২ এ জগতে সার, শুধু মাতৃভূমি ॥
সুজলা, সুফলা, শত শ্রামল,
৩ এবে দুঃখ বিভলা, সেই জননী ।
দুঃখিনীর বেশ, বাতনা অশেষ,
৪ ভুগিছে স্বদেশ, দিবস যামিনী ॥
বিদেশী বসন, আসন অশন,
৫ বিদেশী ভূষণ, বিদেশী কাহিনী ।
বিদেশীর তরী, শোভে সারি সারি,
৬ ভারত জননী, বিদেশী ডরনী ॥
বিদ্যা হিমাচল, স্বমেক অচল,
৭ গাহিত সতত, স্বদেশ বাধানি ।
আনত আনন, হয়েছে এখন,
৮ করিয়ে স্মরণ, অতীত কাহিনী ॥
বড় দরশন, ছিলগো বধন,
৯ সুখেতে তখন, তাসিত পরানী ।
সাম গান ববে, বনজারী সবে,
১০ গাহিত প্রত্যন্তে, আগাতে ধরনী ॥
কর্ণ, তীয়, জোণে, ববে ঘোর রণে,
১১ বিক্রমে কাপাল, আরা ভূমি ।
কালিদাস কবি, নৈঋত, ভারতী,
১২ সাজাল বধন, কমিতা কামিনী ॥

- সন্ন্যাসী প্রবর, বৃহৎ, শতর,
১৩ প্রবেশিল বখন, কর্ণভূমি ।
ছিল গো তখন, প্রাণের রতন,
১৪ সোণার ভারত, অগত জননী ॥
ফুরায়ছে সব, বিগত বিভব,
১৫ নাহিক সে সব, বিবশা জননী ।
এত দিন পর, তুলি ঘুম ঘোর,
১৬ জেগেছে বন্ধের, কোটী প্রাণী ॥
সবে প্রাণ খুলে, স্বদেশে পুজিলে,
১৭ ঘুটিবে আবার, তিমির রজনী ।
যদি এইবার, হয় গো অসার,
১৮ একতা বন্ধন, সত্য বাণী ॥
হাসিবে অগত, আবার ভারত,
১৯ ভুগিবে বিধম, অঙ্গহানী ।
হিন্দু মুসলমানে, প্রকৃষ্ট বদনে,
২০ বল সবে, ভারত রত্নযোনি ॥
হাতে, হাতে ধরি, গন্ত কীর্তি স্মরি,
২১ এস সবে পুজিছে, ধর্মভূমি ।
গভীর অরাবং, বন্দে মাতরম্,
২২ নিনাদয়, আগ্রত—মাতৃভূমি ॥
আলোচনা সমিতি হইতে সংগীত ।
আলোচনা সম্পাদক ।

পীত ।

খান্সাজ-২২ ।

জেগেছে জননী আজি
তোদের কাতর ডাকে ।
এসরে ভারতবাসী
সবে মিলে পুজি মাকে ।
করেছিল আবাহন
তাই বন্ধ এল প্রাণ
সমর দেবতাগণ
বন্ধের ঘোর বিপাকে ।
বিশেষীর মোহে তুলি
দিওনারে অলাঞ্জলি
সেখোনারে মুখে কালী
হাসারোনা আর লোকে ।
যদি পার রাখিবারে
এ প্রতিজ্ঞা চিরতরে
উঠিবে ভুবনত'রে
যশোগীতি ঝাঁকে ঝাঁকে ।
তোদের সম্মুখে আজি
'মহাকালী' বেশে সাজি
অসিরায়ছে মহাশক্তি
ডেকেছিল তোরা থাকে ।
নির্ভরে সকলে মিলে
আজি তোরা ডাক থাকে ।
ঐ জিতেজনাথ বন্দোপাধ্যায় ।

ক্রীড়া-স্বীকার—সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতা-নিবন্ধন এবার পত্রিকা প্রক শে কিছু
বিলম্ব হইল, তজ্জন্ত গ্রাহকগণ মার্জনা করিবেন ।

স্বদেশী সঙ্গীত

১। বঙ্গভূমি বন্দনা ।

ভৈরবী—কাওয়ালি ।

নমো বঙ্গভূমি জননী ।

শতশস্যদেবী সৌরভ শালিনী

চারু শিল্পকলা শোভিনী ।

বিভূতনন্দনদীবাহিত পণা ।

সলিল সেকোঁরকৈদার পদ্মা

পুষ্প কলার্কিত মাধুরী রমা,

শৈলমুখুট কিরিটিনী ।

কুবীৰল সঘন গৌরবমানিনী

অন্ন প্রদান রূপা রক্তিত ধরণী

কান্ত মনোহর প্রান্তর শোভিনী

অভিচূষিত পাদদর্জিনী ।

যুগে যুগে মা তুমি সুখীজন বন্দা ।

সুবনাকিত তব প্রভাত সন্ধ্যা

মলরাক্ষিত শ্রামলাকলা নিল্লা

বিজুলে তারাবালিনী ।

চৈতন্ত প্রেমপুত প্রাণতরুর্ভিত

কোটি কোথেকগীত করিত স্তুতি

বাঁধন ভৌমিক বাত বীরকীর্তি

জানদর্শন প্রদর্শিনী ।

ভৈরবী—কাওয়ালি ।

শতশস্যদেবী সৌরভ শালিনী

চারু শিল্পকলা শোভিনী

বিভূতনন্দনদীবাহিত পণা

সংসার লক্ষী রূপিনী ।

আগুন-পুঙ্খ ভস্মামৃত বন্ধা

হিন্দু মুসলমান-সন্তান কর্ণা

ব্রাহ্মপ্রবর-মহা-সংঘম রক্ষা

পুত মৈত্রী প্রেমময়নারিনী ।

বর্ণনাভীত তব শুণকোটি পরিমা

নির্জিত সুরপুর বরিত্ত মহিমা

শ্রান্ত সন্তানে দেহি প্রীতিভক্তি পরমা

শান্তিসম্মিলন সুখবর্জিনী ।

গীত ।

ললিত—আড়াঠেকা ।

ভারতের ছুঃখ নিশি পোহাইল এতদিনে ।

সুখ-ভাঙ্গু সমুদিল পুন সে ভাগ্য পশনে ॥

দেখ এবে যত পুত্রে, বাঁধিবে একতা সূত্রে,

নাশিতে মায়ের ছুঃখ, মাতিয়াছে মনে প্রাণে ॥

না'হ আর হিংসা ঘেব, ঘুচায়ে মসের ক্রেশ,

(হল) ভাই ভাই এক ঠাই প্রাণের বন্ধনে ।

কৈনা জননী আর, কৈনা মা অনিবার,

ভুলিয়ে বেদনা তার, আশীষ তব সন্তানে ।

যেন তব আশীর্বাদে, অসিকি লতি অবাধে,

এই বর মাগি যোরা তব রাজীব চরণে ।

স্বর্গাদপি গরিরসী, তব পুত ক্রোড়ে বসি,

আদর করি মা বেন, অমূল্য দেণীর ধনে ।

অভীত গোরব গাথা, বোণার বন্ধার যথা,

শ্রবণ বীবরে পশি হৃদয়ে বাজে সঘনে ।

ফাই হরে দৃঢ় ব্রত, মাথিতে আপন হিত,

স্বদেশের যশোগার করি এস একজামে ॥

সম্পাদক ।

আলোচনা।

“মস্তকের সাধন কিম্বা শরীর পতন।”

নবম বর্ষ

অগ্রহায়ণ সন ১৩১২।

অষ্টম সংখ্যা

বিশ্বামিত্র ।

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

তবে সূর্য্যবংশে মহারাজ সগর এবং চন্দ্রবংশে মহারাজ যযাতি ও তরতকে কিয়ৎপরিমাণে সার্বভৌমিক রাজত্বশোভিত বলা যাইতে পারে। কেননা ইহাদের বাহুবলে তদা-নীন্তন আর্য্য ও অনার্য্য রাজ্য সকল বিজিত হইয়া ইহাদিগকে পুঞ্জোপচার প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু ইহাদের প্রতিষ্ঠিত অধি-রাজত্ব অধিকদিন অক্ষুর থাকে নাই। একটা রাজ্য জয় পরাজয়ে প্রাচীন রাজভ্রগণের ভাগ্যনির্ণয় হইত;—মহাপ্রতাপশালী নর-পতি একবার রাজ্য পরাজিত হইলে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইতেন; তদীয় বিপুল প্রজাবল ও কোষবল তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত না। সে বাহ্য হউক, সার্বভৌমিক অধিরাজের জয়লাভে দেশের বৈরুপ অবস্থা

হইয়া থাকে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে তাহার বহুল বিবরণ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়বল চির-ক্ষোভন-শীল ভীমাবর্ত্তময় সলিলরাশির জ্বালা নিত্য উবেল হইতে উদ্ভাসিত;—যতক্ষণ তাহা বেলা অতিক্রম করিতে না পারে তত-ক্ষণ তীরস্থ উপবনরাশির উদারহাত্তময় সৌন্দর্য্য বিশ্ববাসীকে আমন্ত্রিত করে,—ততক্ষণ সৈকতবাসী ঋষিগণের সামগানে, পঞ্চবটের পেশল হাত চারিদিকে ফারিত হইতে থাকে; ততক্ষণ ধর্ম্মশাসন ও সমাজ-বন্ধনের দৃঢ়তা অক্ষুর থাকে। কিন্তু সেই সলিলরাশি একবার তীর অতিক্রম করিলে বন, উপবন, নগর, গ্রাম তর,—বিচ্ছিন্ন,—বিধ্বস্ত হইয়া শূন্যানে পরিণত হয়, সকল বন্ধন শিথিল—সকল বাধা দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। নূতন সৃষ্টির প্রাক্কালে জগ-তের যেকোন বৈষম্যময় অবস্থা সংঘটিত হয়, ক্ষত্রিয়বলের দিগ্ভ্রমে ঠিক সেইরূপ অবস্থা

দাঁতে বেথা বার। উপযুক্ত ঠাই হইলে সেই বৈবদ্যকে সামো পরিণত করিয়া তৎসম্বন্ধীয় ইত্যন্তঃ নিকট ও তৎপক্ষে উপ-করণনিয়মাদি নূতন সমাজ সংগঠিত করিতে পারিতেন। কিন্তু ইহা সামান্য শবসাধনা নহে। আর্থাত্ম্যতে তিনটি মহাপুরুষ এইরূপ উৎকট শবসাধনার জন্য বিকট চেষ্টা করিয়া-
ছিলেন,—বিখ্যাত, ত্রীকুণ্ড ও চাপকা। ইহাদের সেই মহতী চেষ্টা সফল হইয়াছিল কি না, জানিয়া ক্রমে ক্রমে যথাকালে তাহা দেখি।। মহাবীর বিখ্যাত সেই উৎকট শবসাধনার কতকগুলি কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে আমরা তাহাই আলোচনা করি-
তেছি।

মহাবীরের পবিত্র তীর্থভূমি মহা-
দেব হাট্টা অধিষ্ঠিত। চন্দ্রবংশীয় রাজা কুশের
দ্বিতীয় পুত্র কুশনাভ কর্তৃক তাহা স্থাপিত।
কুশনাভেরই রাজত্ব কালে বায়ুর অত্যাচারে
ভূমির কৃষ্ণাগণের কুজতা সংঘটিত হওয়াতে
মহাবীর বায় কান্ডকুজের পরিণত হইল;
কালে কান্ডকুজই বলবৎ হইল। সংবেষ্টক
অবস্থা দ্বিত্বের অতুল প্রভাব এবং রাজার
জ্ঞানসমুৎপাদে কান্ডকুজ রাজ্য সমৃদ্ধির উচ্চ
সোপানে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে
লাগিল। ক্রমে তাহার পরিসর বৃদ্ধি হইতে
লাগিল। অবশেষে তাহা একটা প্রধান রাজ্য-
রূপে পরিণত হইল। মহারাজ গাধি তখন

কান্ডকুজের সিংহাসনে আসীন। রাজা গাধির
স্বভাব সঙ্গতঃ প্রধান। মুরাভোর পৌরব-
বৃদ্ধি হইলেও, তিনি তাহাতে সন্তোষলাভ
করিতে পারেন নাহি,—আধ্যাত্মিক চিন্তাতেই
তিনি নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিতেত। রাজ্যের
সুখসম্পদ তাঁহার মনোহরণ করিতে পারে
নাহি। ক্রমে ঐহিক সুখে তাঁহার বিভ্রম
এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, রাজা গাধি সিংহাসনে
বীর জ্যোৎস্না পুত্র বিশ্বরথকে স্থাপিত করিয়া
যোগে তত্ত্বাগ করিতে উদ্যত হইলেন।
সেই সময়ে কান্ডকুজরাজ্যে রাক্ষসের অভিশর
উপদ্রব আরম্ভ হয়। যে সকল অনাৰ্য্যজাতি
ইতিপূর্বে গাধির প্রচণ্ড বিরুদ্ধে ময়ূরধি-
রুদ্ধবীর্য্য ভূম্বকের দ্বার শুবনত মন্তকে হুয়ে
পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে অবসর
পাইয়া রাজ্যে নানাপ্রকার উপদ্রব আরম্ভ
করিল। প্রজাকুল ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল,
—রাজ্যের শান্তি অনেক পরিমাণে নষ্ট
হইয়া গেল। রাজাকে সংসার ত্যাগে উদ্যত
দেখিয়া চিত্তাকুল প্রজাবর্গ নানা অমুনরবিনয়
সহকারে তাঁহাকে নিবর্তিত করিতে চেষ্টা
করিল। কিন্তু রাজা গাধি তাহাদের কাতর
পরিবেশনে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার
জ্যোৎস্না পুত্র বিশ্বরথ তখন উপযুক্ত। রাজা
সেই উপযুক্ত পুত্রকে সিংহাসনে অভিষেক
করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ
করিলেন।

বিশ্ববর্ষ শিউসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন ।
 প্রজাবর্ষ হইতপূর্বে তাহার বীরত্ব ও তেজ-
 বিস্তার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছিল, সুতরাং
 মহারাজ গাধির পরলোকগমনে তাহার
 বিশেষ কতিবোধ করিল না । বিশেষতঃ
 গাধি সংসার ত্যাগ করিবার সময়ে প্রজা-
 দিগকে বলিয়াছিলেন যে, বিশ্বামিত্র তৎ-
 প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া রাজ্যপালন
 করিবেন এবং রাজ্যাসনে অধিরোহণ করিয়াই
 অত্যাচারী রাক্ষসদিগকে দণ্ডিত করিতে
 উদ্যত হইবেন । বৃদ্ধ রাজার ঐ প্রকার
 সাধনা বাক্যে প্রকৃতিবর্গ অনেক পরিমাণে
 আশ্বস্ত হইয়াছিল । এক্ষণে বিশ্বামিত্রকে
 রাজসিংহাসনে সমাসীন দেখিয়া, তাহার
 আপনাদিগকে হতশত্রু বলিয়া মনে করিতে
 লাগিল । নবীন ভূগতি বিশ্বামিত্রও আপ-
 নাকে সর্বতোভাবে কৌবিকদিগের যোগ্য
 প্রতিনিধিরূপে পরিচিত করিতে চ্রটি করি-
 লেন না । রাজ্যাসনে অধিরূঢ় হইয়াই তিনি
 দেশবৈরী ও মানববৈরী রাক্ষসদিগকে সংহার
 করিতে অভিলাষী হইলেন । চূর্নবর্ণ নিশাচর-
 গণ প্রায় প্রত্যহই কানাকূজে অতর্কিতভাবে
 আপতিত হইয়া অসতর্ক প্রজাদিগকে নিগ্-
 হীত করিত । শত শত নিরীহ প্রজা তাহা-
 দিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ; লক্ষ লক্ষ
 ব্যক্তি গৃহশূন্য হইয়াছে । বিশ্বামিত্র এক্ষণে
 সেই রাক্ষসদিগকে সংহার করিবার মানসে

চতুরঙ্গিণী সেনা গহনা করণ হইতে বহির্গত
 হইলেন ।

আর্য্যাবর্তের যে অংশে মহোদর নগর
 প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পূর্বে সরস্বতী
 অনার্য্যগণ তথায় বাস করিত । আর্য্যসাম্রাজ্য
 পশ্চিমোত্তর হইতে ক্রমে ক্রমে পূর্বে ও
 দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছিল । মহুর অবোধা
 এবং পুরুষবার প্রতিষ্ঠানপুত্রী হইতে আরম্ভ
 করিয়া বিধিগা, কেশরী, মহোদর, ধর্ম্মরক্ষা,
 নিরিত্রয়, অম্ব, বৃহ, কলিঙ্গ, কৈকর ও ময়ূক
 প্রভৃতি অনেকগুলি আর্য্য রাজ্য স্থাপিত
 হইয়াছিল । তদ্ব্যতীত পঞ্চরদ্রপ্রদেশে পঞ্চ-
 লিকা ও কাম্পিলা, নন্দবাতীয়ে বাহেয়ভটী,
 শুক্লকরে আনর্ড বা কুশহলী এবং মধ্যপ্রদেশে
 বিদর্ভ প্রভৃতি কতকগুলি রাজ্য বিশ্বামিত্রের
 আধিপত্যের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।
 এই সকল রাজ্য রাজনৈতিক ব্যাপারে পর-
 স্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও একই প্রকার
 সামাজিক নিয়মাদি পালন করিতে ব্যস্ত
 হইত । ধর্ম ও সমাজ সবক্ষেত্রে ইহারা সকলে
 এক অভিন্ন সংস্কৃতি বৃত্তে আবদ্ধ ছিল ।
 আর্য্য জগতের এক প্রান্তে কোল অত্যাচার
 হইলে অমন তদ্বিৎসেবে তাহার বিরোধ
 সর্বত্র প্রচারিত হইত । সকল রাজ্যেই
 তাহার আলোচনা হইত ; সকল রাজাই সেই
 অত্যাচার ও তাহার বিহিত দণ্ডের কথা
 প্রজাদিগকে জানাইতেন । এইরূপে প্রাচ্য

এমনে ইহঁদের স্বাভাবিক শতদুঃখে বিচরণ করিতে থাকিত। কিন্তু রাজনৈতিক কোন অভাব-
শীল উপদ্রব বা বিপদ ঘটিলে, অভাব রাজত
কিন্তুই কতিবোধ করিতে না।
স্বাধীন রাজ্যে সেইরূপ উপদ্রব বা বিপদ
গণতন্ত্র হইত, তিনিই তাহার কলভোগী
হইতেন; অগ্রে বিশেষ কোন কারণ না
থাকিলে, তাঁহাকে সাহায্য বা বিপদ হইতে
উদ্ধার করিতে আসিতেন না;—নিজের
রাজ্যে বাহ্যতে সেরূপ উপদ্রব না ঘটে,
তদুপযোগী সতর্কতা অবলম্বন করিতেন।
এইরূপে কত রাজা আর্ঘ্য বা অনার্য জাতীয়
পক্ষ অত্যাচারে রাজ্যচ্যুত বা বিনষ্ট হইয়া-
ছিলেন, কত সমৃদ্ধ আর্ঘ্য রাজ্য অসভ্য
সর্বস্বদ্বিগের করতলগত হইয়াছিল, কিন্তু
তাঁহাতে অন্য কোন ক্ষত্রিয় রাজা কতিবোধ
করেন নাই; হয় ত কেহই তজ্জন্ত অগ্ন্যুত্তাপ
স্থাপিত করেন নাই। সূর্য্যবংশীর রাজা বাহক
অনার্য পক্ষদ্বিগের অত্যাচারে রাজ্যচ্যুত
হইয়া নিরাক্ষর মনোবৈরনার প্রাণত্যাগ
করিয়াছিলেন। কোন ক্ষত্রিয় রাজাই তাঁহা-
দের উদ্ধারের চিন্তা অগ্রসর করেন নাই,
কেহই তাঁহাদের দুঃখে একবিন্দু অশ্রুমোচন
করেন নাই। প্রাচীন আর্ঘ্য-রাজ্যনাগণের
এইরূপ শোচনীয় অনৈক্যই ভারতের সর্ব-
সাধারণমূল কারণ। যদি তাঁহাদের আপনা-
সেই সময়ে বলবতম রাজ্যকে চক্রবর্তীরূপে

স্বীকার করিয়া তাঁহাদের আত্মবহনে নিরত
থাকিতেন, তাহা হইলে সমগ্র ক্ষত্রিয়বলের
নিয়মিত কেন্দ্রীভবন দ্বারা তাহার দুর্ভাগ্য
প্রচণ্ডতা বহল পরিমাণে হ্রাস পাইত, সে
প্রচণ্ড বলের দিগ্‌দাহী তেজে অনার্যগণ
পতনবৎ বিদগ্ধ হইত এবং ভারতের ভাবী
ইতিহাস কিরূপ সৃষ্টি ধারণ করিত, তাহা
কে বলিতে পারে? কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য-
বশতঃ তাহা হয় নাই; সামাজিক ও ধর্ম-
বন্ধনে ভারতীয় আর্ঘ্যরাজ্যনাগণ দৃঢ়রূপে
আবদ্ধ হইলেও রাজনৈতিক একতা তাঁহা-
দিগকে বন্ধন করিতে পারে নাই। দুঃখের
বিষয় এ কঠোর শব্দসাধনার অনেকেই প্রবৃত্ত
হয়েন নাই, দুই একজন প্রবৃত্ত হইয়াও
সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন নাই।

নরমাংসানী দুর্ভাগ্য রাক্ষসদিগকে দগ্ধিত
করিবার অভিপ্রায়ে বিখ্যামিত্র সৈন্তে নগর
হইতে বহির্গত হইলেন। নৃশংস অনার্যেরা
তাঁহার আগমন বার্তা শুনিয়াই গৃহদ্বার পরি-
ত্যাগ পূর্ব্বক দুর্গম পরিগ্রহনে আশ্রয় গ্রহণ
করিল। সেই সময়ে কীকটদেশে প্রমথদত্ত
নামে এক দম্পত্য ছিল; তাহার
দুর্ভাগ্য অমৃতচরণ পার্শ্ববর্তি দেশ সমূহে আপ-
ত্তিত হইয়া নগর গ্রাম লুণ্ঠন করিত। দম্পত-
্য প্রমথদত্তের নাম শুনিলে অনেক
গৃহস্থই ভয়ে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িত।
বিখ্যামিত্র সেই প্রমথদত্তের ঘরন করিবার

নিরিত অত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কি না, তাহার কোন পরিচয় কুত্রাপি পাওয়া যায় না; তবে ঋগ্বেদে প্রমগল সম্বন্ধে বারং বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে এই মাত্র জানা যায় যে রাজা বিশ্বামিত্র নিজ ভূত্ববলে বাহা পারেন নাই, ঋষি বিশ্বামিত্র তাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ইন্দের পুত্রীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন • ।

দম্ভাঙ্গলনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে না পারিয়া বিশ্বামিত্র স্কন্ধচিহ্নে বরাহ্যে প্রতি-
ক্ষুণ্ণ করিতে মনস্থ করিলেন । তাহার জয়ভিলাষ পরিভূত হইল না । তিনি বরাহ্যকে নিষ্কণ্টক করিবার অভিপায়ে প্রচণ্ড অকৌহিলী লইয়া দম্ভাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন : তাহার সমভিব্যাহারী বিশাল সেনাদলও উৎকট জিগীষা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল ; কিন্তু দ্রুত দম্ভাঙ্গণ তাহার সন্ধান পাইয়াই নিবিড় গিরিগহনে লুকাইত হইল । সে দুর্গম প্রদেশে বিরাট-
বিক্রম প্রবেশ করিতে পারিলেন না ; অগত্যা তাঁহাকে প্রতিগমন করিতে হইল । কিন্তু

• কিং তে কৃণুতি কীকটেণু গাবো

না শিরঃ কুহে ন তপন্তি বর্ষম্ ।

অনোত্তর প্রমগলস্ত বেহো

নৈনচাশং মবনু কুরান ॥ ১৪ ।

ঋগ্বেদ, ৩ অঃ, ৩ মং, ৩ অঃ ।

তাঁহার সৈন্তগণ প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহিল না । তাহার যুদ্ধের জন্য গমন করিয়াছিল, বনভ্রমণের জন্য নহে, সুতরাং তাহার যুদ্ধ করিবার প্রতিগত হইবে । চতুর বিবামিত্র তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া তাহাদিগকে কার্য্যান্তরে ব্যাপ্ত রাখিতে মনস্থ করিলেন । সে কার্য্য সহজ নহে, তাহা বিপুল আয়োজন ও বিক্রম সাপেক্ষ ;—তাহা দিখিঅই ।

পিতৃ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধ বিশ্বামিত্র ভগ্নতের তদানীন্তর রাজনৈতিক অবস্থা একবার সম্বীক্ষণ করিয়াছিলেন । তাঁহার অদ্বুত প্রতিভা রাজনীতির গাঢ় আবরণ ভেদ করিয়া রাজ্য সমাজের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল । তারতের অনেক স্থানেই আৰ্য্য রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত,—সমগ্র আৰ্য্যবর্ষ, মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ, দাক্ষিণাত্যের দুই এক স্থান—সর্বত্রই আৰ্য্য নৃপতির বোধিত প্রতাপ ; আৰ্য্যের সত্যতাব্যোভ সর্বত্রই তরতর বেগে প্রবাহিত । বর্ষবিষয়ে প্রায় সর্বত্রই এক অভিন্ন সম্বন্ধকৃতি-রূপে প্রথিত, কিন্তু রাজনৈতিক বিবরে কাহারও একত্ব নাই, প্রায় সকল রাজাই পরস্পরের বিরোধী । অনেকের কোবল অগম্য, প্রতাপ অসহনীয়, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, একতার অভাবে সেই কোবল ও প্রতাপ বেশবৈরীর সম্মুখে একবার পূর্ণাঙ্গ হইলে আর সহজে

পুনরুজ্জ্বলিত হইত না; অপর কোন মূণ-
 তিই তাহার উদ্যোগনে চেষ্টা করিতেন না।
 সকলেই আগনার নইয়া বাত, পরের দিকে
 চাহিয়া দেখিতেন না। ভারতের নানাব্যানে
 আর্থের জাতীয় জীবন পরিচ্ছিন্ন অবস্থার
 ইত্যন্তঃ বিকিণ্ড ছিল, এক একটা তেজো-
 বহুিকণা ভিন্ন ভিন্ন দূর্গে অগ্নে অগ্নে ধীরে
 ধীরে সমুদ্রিত হইতেছিল; উপযুক্ত ব্যক্তি
 চেষ্টা করিলে সেই বিচ্ছিন্ন জাতীয় জীবনকে
 একত্রিত করিয়া এক প্রচণ্ড মহাপ্রাণের
 সৃষ্টি করিতে পারিতেন, বিকিণ্ড অগ্নি-
 কণাকে একত্র মিলিত করিয়া বিশ্বদাহী
 প্রণব দাবানলের আয়োজন করিতে সক্ষম
 হইতেন। চতুর বিশ্বাসিত এই সকল বিষয়
 চিন্তা করিয়া দেখিলেন; তিনি যত চিন্তা
 করিতে লাগিলেন, ভারতের তদানীন্তন
 রাজনৈতিক অবস্থা ততই অবিকতর হারী-
 তাৎ তেঁহার মানস-দর্পণে প্রতিফলিত হইতে
 লাগিল। তিনি কি চেষ্টা করিলে সেই
 নবম বিচ্ছিন্ন জাতীয় জীবন ও বিকিণ্ড
 অগ্নিকণা একত্রিত করিয়া এক প্রচণ্ড মহা-
 প্রাণ ও প্রণব দাবানল সৃষ্টি করিতে পারি-
 যেন না? বিশ্বাসিত বৃষ্টিতে পারিলেন যে,
 ইহা সিদ্ধান্ত সহজ ব্যাপার নহে,—ইহা
 কঠোর শ্রমসাধ্য,—ভীষণ মহাক্রান্ত। এ
 কঠোর শ্রমসাধ্যতার সিদ্ধ হইতে হইলে, এ
 ভীষণ মহাক্রান্ত উদ্ভাষন করিতে গেলে বহু

পাতিয়া শত বহুপ্রহার সহ করিতে হইবে,
 সহ্য বহুবারে হৃৎকায় উচ্চাধরা দিতে
 হইবে। বিশ্বাসিত কি তাহা পারিষেন না?
 সমুদ্রে অমরত্বলাভের মহাপ্রাণে,—তিনি
 কি ইহা উপেক্ষা করিতে পারেন? তিনি
 প্রতিজ্ঞা করিলেন, হর এই মহাপ্রাণে সর্বল
 আক্রমণ করিয়া আপনাকে অমর করিবেন;
 নতুবা নগণ্য জগৎবুদ্দের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া
 অগণ্যে কালক্রোড়ে মিলিয়া যাইবেন।

পূর্বে বলিয়াছি যে ঐরাবত ও বৃ-
 শ্চিরের পূর্বে একমাত্র সগর ব্যতীত আর
 কোন আর্য নরপতি সার্বভৌমিক অধিপতি
 হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কি না, পৌরাণিক
 গ্রন্থে তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।
 অমর মহারাজ বসতি ও ভরতকেও কিং
 পরিমাণে সার্বভৌমিক রাজশ্রীশোভিত বলা
 যাইতে পারে বটে, কিন্তু মহাবীর বিশ্বাসিত,
 শ্রীকৃষ্ণ ও চাণক্য যে মহতী শ্রমসাধ্যতার
 প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাদের ও পূর্বোক্ত
 নরপতিগণের মধ্যে কাহারও সম্মুখ ভীষণ
 প্রবর্তনা দেখা যায় না। বিশ্বাসিত দেখিলেন
 যে, ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিক রাজচক্রবর্তী
 হইতে না পারিলে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি
 হইবে না। কিন্তু সহজে রাজচক্রবর্তী হওয়া
 যায় না;—এই শূন্যের অতুলিত সম্মান লাভ
 করিতে হইলে অগ্রে ভারতের আর্য ও
 অনার্য সকল নরপতিকেই পরাস্ত করি

অধীর করিতে হইবে। সেইজন্য তিনি নিখিলারে মনোনিবেশ করিলেন। আৰ্য্য ও অনাৰ্য্য ভারতের কোথায় কোন রাজার স্বিকল্প সেনা ও কোষ বল, কাহাকে পরাস্ত করিতে রক্তচুর্ক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে, তাহা তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন না। স্তম্ভনাং অগ্রেই সেই বিষয়ে স্তম্ভিত। লাক্ষ্যের আবশ্যকতা বুঝিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে সকলের রাজ্য ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন।

বিখ্যামিত্রের উদ্দেশ্য স্মরণ; তাহা সিদ্ধ হইলে ভারতের এক মহোপকার সাধিত হইত, ভারতীয় রাজতন্ত্রে এক প্রচণ্ড বণ প্রৌদ্ধিত হইত; কিন্তু ভারতবাসীর সৌভাগ্য ও স্বতন্ত্রাধীনতা তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তিনি রাজচক্রবর্তীর পদ-লাভের আশার ও ভারতীয় আৰ্য্য রাজতন্ত্র-গণের একীকরণের বাসনার যখন নগর ও পল্লনাদি বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময়ে অদৃষ্টবশে অলক্ষ্যে বসিয়া তাঁহার কৃত্ত কি অদ্ভুত ভবিষ্যত্বাভার সূচনা করিতেছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। একটা রাজনৈতিক উৎকৃষ্ট মহা সমস্তার সীমাংসা করিবার নিমিত্ত তিনি সর্বাঙ্গতঃ করণে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড সামাজিক শব্দাধারা যে, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছিল, তাহা বিখ্যামিত্রের তখন স্বপ্নমুখ্য হয় নাই।

বিখ্যামিত্রের আবির্ভাবের বহুবৎসর পূর্ব হইতে ভারতীয় আৰ্য্য সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিবাদের সূচনা হয়। সেই সামাজ্য বিবাদের ক্ষীণ ছায়া নির্দেশ করিয়া মহর্ষি চাণক্য একদা রাজা কুশিককে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ভীষণ বিরোধ এবং তাহা হইতে কুণসঙ্গর উপস্থিত হইবে। চৌহান গোত্র সেই ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হইতে উদ্ধৃত হইয়া তেজোবীৰ্য্য সমন্বিত হইতে পারিবে। কি কারণে ব্রাহ্মণের বিরোধ সংঘটিত হয়, ইতি-পূর্বে সংক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইয়াছে; মহাত্মা বলিষ্ঠের জীবনী আণোচনা করিবার সময় তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। বিখ্যামিত্র যে ভীষণ সংঘর্ষ হইতে কালানল-রূপে উদ্ভূত হইলেন, রাজ্য বণ ও নিমি সর্গ-প্রণয় তাহার সূচনা করেন; তাহার পর নহুধ, স্তম্ভনাং ও স্তম্ভনাং প্রভৃতি নরপতিগণের চেষ্টায় সেই বিরোধের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাঁহার স্তম্ভনাংরূপে ও নিমিত্ত উদ্যোগে সেই বিবাদবাহু উত্তেজিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চেষ্টা নিতান্ত বৃহ, সীমাবদ্ধ ও অপ্রগাঢ়; তাহা তাঁহাদের নিজ নিজ স্বার্থের সহিত ভিত্তি। কোন বিশেষ বিশেষ স্বার্থের অগ্রসরণে তাহার উত্তেজনা এবং সামাজ্য ব্যাঘাত বা প্রতিরোধেই তাহার নিমিত্ত হইয়াছে। তাহার পর সমাজের বিরাটদেহে তাহার কোন নিদর্শনই স্থান

পারি নাই। কিন্তু বিধর্মিত্বের চেষ্টা সম্পূর্ণ অতিবাহারী কঠোর শব্দসাধনা। ভীষণ বজ্রা-
নল ও তরঙ্গ বাতবায়ির জ্বার তাহা সমাজের
স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া বিরাট সমাজ-
শরীরকে আমূল আলোড়িত ও প্রদাহিত
করিয়াছিল। সেই বিধ্বাদাহী ভয়াবহ কাল-
ঘির প্রচণ্ড তেজে দেবতারাজ্য তাপিত হইয়া-
ছিলেন; সহস্র সহস্র বংশের ধরিয়া তাহার
প্রচণ্ডতা সমভাবে ছিল; লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি
তাহাতে বিদগ্ধপাণ হইয়া অপূর্ণ পবিত্রতা
লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

বর্ণভেদ প্রথার ক্রমিক পরিপুষ্টির সহিত
ব্রাহ্মণ্য পরম্পরাপ্রাপ্ত কোলিক স্বরূপে
পরিগৃহীত হইলে সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা
ঘটিতে লাগিল; তৎ ও বার্ষপরের শতাব্দীর
সম্মুখে অকপট ও উদার ব্যক্তির ধর্মাত্ম-
মোদিত উন্নতিশীল প্রতীকিত হইয়া পড়িল;
বেচ্ছাচারের আবির্ভাব প্রাতে প্রাতের কাটিক
স্বজ্ঞাতা নিমগ্ন হইল; প্রজ্ঞাতার অযথা পরি-
চালনে, অধীনস্থ উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের মঙ্গ-
লোপায় সন্মুখ নিম্পিষ্ট, দগ্নিত ও সঙ্গীর্ণ
হইতে লাগিল। বাহ্যার সক্ষম, কঠোর
প্রতিবাদ করিল; কিন্তু অক্ষম ব্যক্তি সকলে
সীরবে সহ্য করিয়া স্বাধীনতার উপযুক্ত
স্বাধীন প্রতীক করিয়া রহিল। এইরূপে
নগ্নে নগ্নে সন্মুখ আরম্ভ হইল; ক্রমে তাহা
বর্জিত ও বলবত্তর হইয়া অধীনস্থ উল্লেখ

করিতে লাগিল। সেই সমস্ত বিশৃঙ্খলান
অনলকণা ক্রমে ক্রমে একত্রিত হইয়া ভয়া-
বহ অ লক্ষণে পরিণত হইল। তাহার প্রচণ্ড
তেজে হিন্দু সমাজ দগ্ন এবং আচার্য গৌরব
গরিমা তন্মীভূত হইবার উপক্রম হইল।

ব্রাহ্মণ্যগণই তৎকালে সর্বাধিক উচ্চতম
সম্মান সঙ্গম সম্ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহা-
দের অপ্রতিম আধিপত্যের সম্মুখে ইজের
ইজস্বত্ত্বও অবনত হইয়াছিল, দেবতাদিগের
অমর স্বত্বাধিকারও ক্রমশঃ বিলাসলীলার
অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। গৌরব ও সম্মানে
তাঁহারা তুদেবদিগকে অতিক্রম করিতে
পারেন নাই। বরং অনেক দেবতা ব্রাহ্মণের
সম্মুখে উৎপাদনের নিমিত্ত বিবিধ উপায়-
নের আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য
ব্রাহ্মণের এই অসীম উচ্চতা তাঁহাদের নিজ
অদম্য অধ্যবসার ও অলৌকিক স্বার্থত্যাগের
সাহায্যেই অর্জিত হইয়াছিল। সত্য বটে,
ব্রাহ্মণই জগতে সভ্যতার প্রথম পথপ্রদর্শক,
জ্ঞানের আদিম প্রচারক, ধর্মের আদ্য
প্রবর্তক, কিন্তু জ্ঞান ও সত্যের অল্পরোধে
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদের
মহীয়সী প্রতীকিতা অজ্ঞের যুগধর্মকে পরাস্ত
করিতে পারে নাই। বিবেকের চরণতলে
স্বার্থের পূর্ণ বলি দিয়া বিশ্বের মঙ্গলোদ্দেশ্যে
তাঁহারা অতি লোভনীয় ভোগলালসা অমান-
বদনে উপেক্ষা করিয়াছেন, সমাজব্যবস্থার দৃঢ়

রাখিবার জন্ত নামা কঠোর বিধি প্রণয়ন
করিয়াছেন, ভারতের পৌরাণিক ইতিবৃত্তে
তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু
মরদেহ ধারণ করিয়া তাহার মহাকাব্যের
অপ্রতিবিম্বের অমর লীলাব গতিরোধ করিতে
পারেন নাট। ভারতীয় আর্ষাসমাজে লোক-
সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনসংগ্রামী বৃদ্ধি
পাওয়াতে ক্রমে নানা প্রকার অর্থ-
প্রয়োগ লাভ করিল, বিশেষ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত
মহত্তর তাগাদেরই সম্ভবসম্মতিগণের চির-
স্তন স্বরূপে নির্দিষ্ট হওয়াতে কোন কোন
ব্রাহ্মণবংশের স্বার্থক্ষির ক্রমে স্রোত
অব্যাহত রহিল, ইতিপূর্বে তাগ সঙ্কল্পে
বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এখন তাগ
পুনরালোচনা নিম্নয়োজন বিশেষতঃ
বিশ্বামিত্র-জীবনের এই অংশ ধর্ম্ম অবদানের
অঙ্গীভূত; এইজন্য তাগ সবিস্তারে বর্ণনায়
আলোচিত হইবে। বিশ্বামিত্রের রাজনৈতিক
জীবনী এই স্থানে পরিসমাপ্ত হইল; তিনি
যে অলৌকিক বীর্য ও লোকবিশ্বাসকে
অভিমানবীর্য প্রতিভার সাহায্যে লগ্নে
অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, সম্রাট
বিশ্বামিত্রের জীবনীতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
তাহার অভূতলন করা যাইবে। এ অংশটুকু
সেই মহাপুরুষের অমরজীবনের ছন্দা নাত্র।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিকৃষণ।

স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গ-রমণী।

[পুণঃপ্রকাশিতের পর।]

আজ বঙ্গরমণী সংঘিনি নামের স্বার্থ-
কথা সম্পাদন করিয়াছেন। স্বামী পুজের
এ আন্দোলনে তাগা যেরূপ উৎসাহ ও
আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়াছেন এবং
এ এই পালন কাব্যের কথা, এ সমস্ত অষ্ট
অটল রাখিবার জন্য যেরূপভাবে তাগাদিগকে
উদ্বীপিত করিতেছেন, তাহাতে প্রকৃতই
নিকংসাহের উৎসাহ সঞ্চর হয়, স্বদেশ-
দ্রোহীর প্রাণে আত্মহানি উপস্থিত হয়।
আমার জ্ঞাতসারে যে সমস্ত মহাপাণ্ডা রমণী
এইরূপে স্বামী পুজকে নিজ দেশে স্বদেশ
সেবানামার সাক্ষ্য করিয়াছেন, নিজ উৎ-
সাহ তেজে তাগাদের অদ্বৈত শক্তিসম্ভার
করিয়াছেন, আমি তাগাদিগের চরণে প্রণাম
ভাবে নত হইয়াছি। আমার একজন বন্ধু
এই আন্দোলনের সময় একজোড়া বিলাতী
চুড়ী নিজ গৃহিনীর জন্ত লইয়া গিয়াছিলেন।
তাগার স্ত্রী পুজে এই চুড়ী বন্ধুই পছন্দ করি-
তেন। যখন বন্ধু চুড়ী নিজ গৃহিনীর হস্তে
প্রদান করিলেন, তখন তিনি চমকিত হইয়া
বলিলেন,—এ কি! তোমরাই স্বদেশ সেবা-
ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, আবার তোমরাই সে ব্রত
ভঙ্গ করিতেছ? 'ছি'! বন্ধু কিসে অগ্র-

তিত হইয়াও বলিলেন, “তুমি উহা বন্ধ পছন্দ কর, আর হাতেও কিছু নাই তাই!”—
গৃহিণী উত্তর করিলেন, “বন্ধন বুদ্ধি নাই, বন্ধন জানি নাই—তখন পছন্দ করিতাম বটে, কিন্তু অন্যত্মের পক্ষে উহা দিরাছি! হাতে কিছু নাই কেন? শাখা আছে, লোহা আছে, এই আমার জন্ম জন্ম থাকুক। তুমি ওচুড়ী কিরাইয়া দাও।” এইরূপ আরও অনেকবাবুর জীগতপূজার সময় বিলাতী কাপড়, জামা কেরং পাঠাইয়াছেন, নিজ নিজ সন্তানকে পূজার কাপড় দেন নাই, তথাপি বিলাতী কাপড় পরান নাই! তাঁহারা আপাদমস্তক বিলাতী সাজসজ্জার সজ্জিত হইতেন, আজ তাঁহারা একেবারে বিলাতী পরিচ্যাপ করিয়া আমাদের কাছে দেখাইয়া দিতেছেন, “কঠিন ও কোমলের কেমন আশ্চর্য্য সাম্রাজ্য-রমণী-হৃদয়।” তাঁহারা তাঁহাদের দৃঢ়তা দ্বারা আমাদের কাছে লজ্জিত করিতেছেন। তাঁহারা বেন বলিতেছেন, “তাই! তোমরা আমাদের অশলা, হুর্দলা, কুবণগ্রিয়া, বিলাসিনী ইত্যাদি বল, কিন্তু এই দেখ, আমরা সব ছাতিরাছি, আর তোমরা পারিবে না।”

বাস্তবিক আমি এই সব রমণীগণের মহা-প্রাণতায় একান্ত মুগ্ধ, কিন্তু আমি বিশ্বাস নাই। রমণীগণের পক্ষে একাগ্রতা ও দৃঢ়তা বিশ্বাসের বিষয় নহে। এমন রমণী দেখিয়াছি

যিনি ৮৮গল্পাথকেজে কলবিশেষ উৎসর্গ করিয়া বর্জন করিয়াছিলেন, তারপর রোগের সময় সাংঘাতিক অবস্থাতে বন্ধন চিকিৎসক সেই ফলের রস ব্যবস্থা করিলেন, তখন তিনি পরীক্ষার ভাবে বলিলেন, উহা আমি বর্জন করিয়াছি, যদি উহা দ্বারা আমার জীবন রক্ষিত হয়, তবে স্বহস্তে সে জীবন বিসর্জন দিয়া ব্রততত্ত্বের প্রায়শ্চিত্ত করিব।” এরূপ দৃঢ়তা হিন্দুধর্মের রমণীতেই সম্ভব। যে সমুদয় রমণী এইরূপে এই পুণ্য স্বদেশী ব্রতগ্রহণে আমাদের সঙ্গীয় হইয়াছেন, আমাদের কাছে শক্তিমান করিতেছেন, আমাদের ক্রটি, বিচ্যুতি দেখাইয়া দিয়া আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞার পথে ঠিক রাখিতেছেন, তাঁহাদিগকে যে আমরা কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, তাহা তাহারা পাই না! তাহা প্রকাশ করিবার মত ভাষা নাই। অথবা তাঁহাদিগকে বলিব, “মাতৃগণ, তোমরা মহাশক্তির অংশভূতা—আমাদের সংসারের অধিতাঈ দেবী, আমাদের শ্রম-জন্ম-হারিণী, হৃদয়ের শক্তিধারা-বাহিনী, তোমাদের শক্তি অনন্ত, তোমাদের প্রভাব অসীম, আমাদের উপযুক্ত করিয়া দেওয়ারই তোমাদের কার্য্য। তোমরাইতো আমাদের হৃদয়ে প্রেম, দ্রোহ, দয়া, মারার উদ্দীপনা কর, —তোমরাইতো আমাদের শক্তি, অন্তঃপ্রাণ তোমরা বাহ্য করিতেছ, তাহা তোমাদেরই কাজ, তাহা তোমাদেরই নিষ্কট

আশা করিতে পারি, তোমরা এতরূপই করিতে থাক, এইরূপ উৎসাহ উদ্বীপনায় আমাদের হৃদয়ে শক্তি জাগ্রত রাখ, প্রতিজ্ঞা অটল রাখ !

আর 'ম' মহাশক্তির অংশভূতা সংসার-শ্রীলসিঙ্গী কল্যাণধারা-বহিনী, অমৃতধারা-পূর্ণ হৃদয়া গৃহলক্ষ্মী মাতৃগণ, তোমাদের চরণে এই নিবেদন—তোমরা সকলেই এই শুভ সংকল্পের মহৎ উপলব্ধি করিয়া ইহার সাধন করে আমাদের সহায়, আমাদের উৎসাহ-দাত্রী হও ! ধাঁহারা এখনও ইলা বুঝিতে পারেন নাট, তাঁহারা বুঝিয়া দেখুন ! মা, তোমরা আমাদের অনেক শিক্ষা নিছ নিছ জীবনের কার্যেই দিতেছ ! তোমরা সহস্ররূপে অলঙ্কৃত চিতার হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জন দিয়া আত্মোৎসর্গের পবিত্র মহিমা আমাদের শিক্ষাইয়াছ,—বৈধবা-অবতার আত্মজীবন কঠোর সংযমের সহিত পুত্রব্রতচর্চাব্রত পালনে আমাদের পবিত্র প্রেমের আদর্শ শিক্ষা দিতেছ—রাত্রিদিন অবিস্রান্ত খাটরা এবং নিজ নিজ আহার বাবহারের বিষয়ে একান্ত উদাসীন থাকিয়া পরার্থপরতার চরম দৃষ্টান্তে আমাদেরকে মুগ্ধ করিতেছ, অস্তের হৃৎপের নরন-অশ্রু সিক্ত করিয়া আমাদের সহাত্মকৃতির পবিত্র ময়ে বীজিত করিতেছ, কত বলিব, কত দেখাইব মা ! অতএব তোমাদিগকে একথা দেশী

বলিতে হইবে কেন ? এস মা, তোমরা সকলে মিলিয়া আজ একপ্রাণ হইয়া এই শুভ স্বদেশী সংকল্প ও আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সফলতা প্রদান কর ! তোমরা মা কত ব্রত নিয়ম উপলক্ষে কতই না কঠোরতা অবলম্বন করিয়া থাক, 'সর্বজনা' ত্রাতাছটানকারিণী তোমাদের অসাধ্য কঠোরতা আর কি আছে মা ! এস মা ! যদি তোমাদের 'বাসীগণ, পুত্রগণ তোমাদের কোমলাঙ্গে মোটা বস্ত্র দিতে দ্বিধাোধ করে, তোমরা প্রহর বধনে সাগ্রহে সে বস্ত্র তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লও, বল মা তাহাদিগকে "তোমরা চট আনিয়া ধাও, তাহাও সানকে পরিধান করিব ! কোন দ্বিধা, কোন চিন্তা করিও না ! বল মা, বল, "তোমরা যন্ত্র কাপড় আনিও না, 'করাশডালা, শাক্তিপুরী চাই না, দেশী কলের মোটা কাপড় আন—বাখার তুলিয়া লইব !" আমাদের হৃদয় তোমাদের এ উৎসাহ বানীতে দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন হউক, মা, শিশুগণের হৃদয়ে স্বদেশ ও স্বদেশী প্রীতি তোমরাই উদ্বীপিত করিবে—যাহাতে আমাদের সন্তানগণ মাতৃভূমির নামে মৃতক শ্রদ্ধা-ব্রত করে, স্বদেশী বস্ত্র অতি আগ্রহে সহকারে গ্রহণ করে, বিদেশী সাজ, বিদেশী সজ্জা লজ্জাকর বলিয়া জ্ঞান করে ; তাহা তোমাদেরই চাহে ! তোমাদের পুত্রবন্ধের অমৃত ভক্তকবিতা কীরে পাঠ্যাবে সেন স্বদেশ

প্রেমাবৃত্ত নিঃকৃত হইয়া শিশুগণের হৃদয়ের
 রক্তে মিশ্রিত হয়! ‘বন্দে মাতরম্’ যেন
 তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়! বাহাতে
 জাহাঙ্গীর এ মন্ত্র না ভুলিয়া যায়, তাহার কল্প
 তোমাদের প্রতি নিত্যাঙ্ক গীতিতে সে
 প্রতি অনিন্দিত হউক, তোমাদের প্রতি স্নেহ
 আত্মানে সে মাধুরী ছুটিয়া উঠুক, তোমাদের
 স্বর্গীয় স্ফোতি বিভাসিত বদনমণ্ডলে স্বদেশ
 প্রীতির পূণ্যপ্রভা বিকশিত হউক—সে বিমল
 দাপ্তিতে আমাদের চিরশাস্ত্রের গৃহ উদ্ভাসিত
 হউক! ফেল না, ফেলে দাও দূরে তোমাদের
 লক্ষীর ভাঙার হইতে ঐ সব দারিদ্র্যবিধায়ক
 অলক্ষীর অগ্রচর সাজ সজ্জা তৈজস-অল-
 ক্ষার। তোমাদের পূণ্যভবন হইতে ঐ সব
 অপবিত্রতাকে সার্জন করিয়া ফেল! তোমা-
 দের পবিত্র অঙ্গ হইতে ঐ সব অনাবশ্যক
 অর্থনাশক, বহু অনিষ্টবিধায়ক অঙ্গালগুলি
 বসিয়া পড়িয়া তাহার প্রকৃত শোভা আমা-
 দিগকে দেখিতে দিউক! তোমাদের উৎ-
 সাহবানী আমাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করুক,
 তোমাদের মঙ্গল হও আমাদের ললাটে
 স্বদেশ-প্রেমের পবিত্র তিলক পরাইয়া দিউক
 —তোমাদের পূণ্যকর্ত্তে আমাদের গৃহকুটীরে
 শান্তি, সুখ ও মঙ্গল আবাদ করিয়া অনবরত
 অনিন্দিত হউক—‘বন্দে মাতরম্’।

শ্রীযত্ননাথ চক্রবর্তী বি, এ।

স্বদেশী সঙ্গীত।

২। উদ্দীপনা।

(ক) গৌরী মিশ্র—একতালো।

দিন চলে’ যায় মাস চলে’ যায়
 বরষা মিলার বাতাসে।

পড়ে’ থাকে যারা, মরে’ থাকে তারা
 কাদিতে লুপ্ত হতালে।

বৃথা করনার কাটালে সময়

কিনা কলোদয় বলনা।

দিন হবে যাক্ গারে লেখা থাক্
 জীবনের দৃঢ় সাধনা।

অংশিত নয় জীব কর্মস্বর

তবে কেন আর অলসে

অমূল্য জীবনে করম সাধনে

উদার বিহীন অবশে।

কর্তব্যের তার লহ করি সার

তবু আশুরান্ হরবে।

মরোদামে মাতি উন্নতির ভাতি

দেখাও বরষে বরষে।

(চান্দ্রনাথ ছাত্রসভার অধিবেশনে গীত)

(খ) রামপ্রসাদী স্তর।

তোরা আর ঘুমাবি কত।

সেই জেতার কুন্তকর্ণের মত।

ভাঙ্গবে না কি মোহনিত্রা

পাকাবে তরে অবিরত।

দেখরে জেগে সাঁকা দিচ্ছে
সবাই ঘুমিয়ে ছিল মানুষ বস্ত ।
চোরে লুটে নিলরে সব ধন রত্ন ছিল যত
(মাঝের সোণার ভাণ্ডারে রে)
(ঐ দেখ্) মাঝের বুকের রক্ত শুবে নিল
বিদেশী অলৌকা শত ।
(ভোমা) ঘুমের ঘোরে গরব ভরে •
স্বপ্ন দেখিস্ অবিরত ।
(সে যে) স্বপ্ন স্মৃতি জাগিয়ে নিতি
ভায় দোচাই আর দিবি কত ।
আর ঘুমের জাগরে ভাই
দেখি একবার জাগার মত ।
(একবার) মা, মা, বলে কোমর বেঁধে
কাজে লাগো দিন যে গত ।

সাহানা—ঝাঁপতাল ।

ঘর থাকতে কেন পরে দ্বারে
বসন ভূষণ মাগুতে বাই ।
(ওরে) কল্ললতা মা যে মোদের
বখন বা চাই তাইতো পাই ।
মাঝের ক্ষেতে সোণা কলে
হীরার শ্রোত ওটখায়ের জলে
মাঝের পংছের মিটি ফলে
কি স্মৃতির স্তর তুল্য নাই ।
মাঝের কাপাস মাঝের পাটে
মাঝের বাজার মাঝের হাটে

কিন্তু নিরে বসেন পাটে
দেখেও তা দেখিনা ভাই ।
(মোরা) মাঝের ঘরের সোণা কেনে
বিদেশী রাং পরি গলে
ছি, ছি, ছি ! ভাই দেরে ফেলে
দেখে লাজে মরে বাই ।
ওই দেখ ভাই ডাকেন মার
“আররে বাপ্ সব ঘরে আর, •
কলক লেপিসনে আর পার
মেখে সব বিদেশী চাই ।”
আররে ভাই সব ফিরে ঘরে,
মাঝের কোলে চরব ভরে
মাঝের ছেলে মা, মা, বলে
মাঝ নামে জগৎ মাতাই ।

প্রার্থনা ।

ভৈরবী মিশ্র—একতালা ।

অজান সন্তান অথ হুং কিছু জানিনা
ভননী জ্ঞান কেবল ।
তার মলিন মুখ দেখলে কাঁপে বৃক
চোখ্ ফেটে বর ধারা অবিরল ।
উৎসব আমোদ কিছু নাই
ভালতো লাগে না পূজার উপহার
মাঝের মুখ চেয়ে বেড়াই মলিন হয়ে
মা, মা, বলে কাঁদি ধরিয়া অকণ ।
কবে আমরা সব হয়ে সুসন্তান,
মাঝের হুং বৈজ্ঞ কোরবো অংশনি

সাধার তুলে লব মারের খন্ড দান,
 সে পদে অর্পিব জ্ঞান, বুদ্ধি, বল ।
 কৃণামরে নমি তক্তি নতশিরে
 এ দীন বাচনা যেন গো অচিরে
 মারের স্মৃথে হাসি, দেখে স্মৃথে তাসি
 শিরে ধরি' যেন কল্যাণ বজল ।
 শ্রীবচনাথ চক্রবর্তী ।

ভক্তির জয় ।

প্রথম অধ্যায় ।

অকণ্ট অমুরাগ ভিন্ন, ভগবদ্ করুণা
 লাভ হয় না । মানসিক বৃত্তিনিচয় বিবরাস্তরে
 বিনিবিষ্ট রাখিয়া, বক-ধার্মিকের ভায় মুখ
 কেবল “হরিবোল, হরিবোল” বলিলে, অনন্ত
 জীবনেও উদ্ধারের আশা নাই । ভগবদ্-
 সাধনমার্গ সমূহ মধ্যে তত্ত্বমার্গই সর্বাপেক্ষা
 সুগম ও বিয়-বিরহিত,—তাই সকল শাস্ত্রে
 এবং সকল সাধকস্মৃথে উহার চূরনী গুণ
 কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে ।

জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির-আসন বহু উচ্চে
 অবস্থিত । যেহেতু, প্রকৃত জ্ঞানলাভ, বড়ই
 দুষ্কর এবং দুঃস্বাদীয় । এ সংসারে প্রকৃত
 জ্ঞানী বড়ই বিরল । পক্ষান্তরে, ভক্তির
 সহজ-সাধ্য সুগম পথ অবলম্বন করিলে,

সাধক বহু অল্পায়াসে অতীষ্ট সাধনে সৰ্ব্বথা
 হইতে পারেন । জ্ঞানের সিদ্ধান্ত সৰ্ব্বথা
 অপ্রাপ্ত হয় না ; তাই অনেকে বলিয়া
 থাকেন,—“জ্ঞানকে কখন বিবাস করিও
 না ।” সিকতাময় ক্ষেত্রোপরিহ নৌখের
 হারিষ যেমন অনিশ্চিত, জ্ঞানের সিদ্ধান্তেরও
 প্রায় লেইরূপ নিশ্চয়তা নাই । কল্য কোন
 জ্ঞানী, যে বিষয় অপ্রাপ্ত সত্য বলিয়া প্রচার
 করিয়াছিলেন, অদ্য অস্ত্র একজন জ্ঞানী
 তাহা প্রকটস্থল বলিয়া প্রতীপাদন করিলেন
 এবং তৎপরিবর্তে আর একটি নূতন সত্য
 আবিষ্কার করিয়া বুঝাইলেন যে, এইটিই
 প্রকৃতপ্রভাবে অপ্রাপ্ত । কিন্তু অদ্যকার
 সত্যটিই যে নিরক্ষুণ্ণ, এমন কথা কে সাহস
 করিয়া বনিতে পারে ? কে বলিতে পারে,
 এই সত্যটিও আর একদিন অস্ত্র কোন জ্ঞানী
 কর্তৃক অসার প্রতীপন্ন হইয়া পরিত্যক্ত
 হইবে না ? ফলতঃ জ্ঞানের এই ক্ষণভঙ্গুরতা
 দর্শনে জ্ঞানাত্মশীলনকারীদের অনেক সময়ে
 জ্ঞানবাদের উপর বিবাসবিহীন ও বীতশ্রদ্ধ
 হইতে হয় ।

যে বহুক্ষর্য সেট অনন্ত জ্ঞানময় বিরাট-
 পুরুষ সৃষ্ট অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভূমনার
 বালুকাকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং এই পরি-
 দৃশ্যমাণ ক্ষুদ্র বহুক্ষর্য্যর একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র
 তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি, এখন বাহাদুরের
 কল্পনামার্গের স্মরণ প্রাপ্তে সমুপস্থিত হইতে

নিভান্ত অশক্ত, এই ক্ষুদ্রতম বস্তুবতীর ক্ষুদ্র-
দশি ক্ষুদ্র মানবীর শক্তি কোন্ শক্তিবলে সেই
বিরাট মহীরসী শক্তির মহত্ত্ব অবধারণে
সমর্থ হইবে? বাহার অনন্ত জ্ঞানবলে অনন্ত
আকাশমার্গে অনন্ত গ্রহ পরম্পরা অসুক্ষণ
অনন্তপথে ধাবমান রহিয়াছে, বাহার অনি-
র্কচনীয় মতিমাছুটার জাজ্ঞ্যমান সিদর্শন-
বরূপ অদ্বুত তেজাধার দিনমণি, অমুদিন
আকাশমার্গে বিরাজমান থাকিয়া সৃষ্টি-
জগতের অপূর্ণ বৈচিত্র্য বিধান করিতেছেন,
বাহার অলভ্যা আজ্ঞার এবং অপ্রতিহত
শাসনশুণে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর
দিন বথাক্রমে ও বথানিয়মে গমনাগমন করি-
তেছে, বাহার নিদেশক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষাদি বড়
ঋতুসম্ব পর্ষ্যায়ক্রমে সমুপস্থিত হইতেছে,
বাহার আদেশ অনুসারে বারিধি বক্ষ হইতে
অপূর্ণ কোশলে এবং অলক্ষ্য শক্তিবলে বাষ্প-
রাশি উদ্ভব হইতেছে এবং সেই বাষ্পরাশি
আবার মেঘাকারে পরিণত এবং দিগনিগন্তে
বিস্তারিত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে অজস্রধারে স্রা-
রাশি সিকন পূর্বক জীব, উদ্ভিজের জীবনী-
শক্তি সংরক্ষণ, সংপোষণ ও সংবর্দ্ধন করি-
তেছে, সেই অশেষ-মল্লিনয় মহামহেশ্বরের
মহিমা-সীমা কীটাতকর ক্ষুদ্র মানব, কোন্
জ্ঞানবলে নির্ণয় করিবে?

ভাই জ্ঞানগর্বি, বল দেখি, তোমার
জ্ঞানের মাজা কতটুকু? বল দেখি, সৌর-

জগতের সকল গ্রহের কথা বলিতে চাহি
না,—বল দেখি, তোমার আধারত্বতা এই
ধরিত্রী সম্বন্ধেই বা তুমি কতটুকু তথ্য নির্ণয়
করিতে পারিরাছ? শুনিতে পাই, উন্নত
পর্কত-শিখর হইতে গভীরতম রত্নাকরগর্ভের
কিকিং মাত্র বিবরণ তোমার জ্ঞান-বেজের
বিষয়ীভূত হইয়াছে। কিন্তু উন্নত পর্কতচূড়া
হইতে স্রুগভীর সমুদ্রগর্ভের পরিমাপ করেক
মাটল মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব
যদি পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ আট সহস্র মাটল
অবধারিত হইয়া থাকে, তবে স্পষ্টই প্রতী-
মাণ হইতেছে, তোমার কাদামাথা মাত্র সার
হইয়াছে—শ্রুত জ্ঞাতব্য বিষয় এখন
তোমার বহনুরে পড়িয়া আছে।

ভাই জ্ঞানী, তোমার অস্থান স্বয়ং পরি-
ভাগ করিয়া বল দেখি, কি কোণে অনন্ত-
কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে? কি
কোণে কি ভ্যাপ্তেজোমরুধ্যোম এই পঞ্চ
মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে?—কি কোণে
ঐ পঞ্চ মহাভূতের যোগ বিরোধে অসংখ্য,
অনন্ত, অগ্রমের জীব, উদ্ভিজের সৃষ্টি, চিতি
ও বিলয় হইতেছে?—কি কোণে অজ-
প্রমাণ বীজ হঠতে অস্রম্পর্কী মহাক্রমের
উৎপত্তি হইতেছে এবং কি কোণেই বা
জড়ময়-বস্তু দেহোদিগের কলেবরে, বিচিত্র-
জ্ঞানময়ী চৈতন্ত-শক্তির আবির্ভাব হইতেছে?
হে ভাই জ্ঞানি! যদি তুমি এই সকল বিষয়ের

প্রকৃত সভা আধিকারে সমর্থ হও, তবেই ত
তোমার জ্ঞানবস্তুর গৌরব করিব ? নচেৎ
অবশ্য বলিব,—এই ক্ষুদ্রতম পৃথিবীর গোটা-
ছুট অধিকিকরও তথা নির্ণয় করিতেই যখন
তোমার জ্ঞান-বস্তুর এত দুর্দশা, তখন সেট
দ্বিরাট জ্ঞানময়ের বিচিত্র-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে
বাওয়া তোমার পক্ষে নিতান্ত বাতুলতার
পরিচয়ক। তাই বলিতেছি, হে জ্ঞানগর্ভি !
তোমার জ্ঞানের পরিমা পরিচয় কর,
সম্ভবপর দ্বারা সিদ্ধ অতিক্রমের অলীক প্রয়াস
প্রকাশে আর উপহাসাম্পদ হইও না।

জ্ঞানাত্মশীলন দ্বারা তুমি বহু জন্মেও
ঈশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিবে
না। যদি ঈশ্বরের রূপালাভে অভিলাষ থাকে,
তত্ত্বমার্গের পথিক হও, তত্ত্বিতরে তাঁহার
নাম অণ কর, জ্ঞানবিজ্ঞানের জটিল জঞ্জাল
পরিচয় করিয়া তত্ত্বিতরে তাঁহাকে
ডাকিতে থাক, মনে প্রাণে এক করিয়া,
কেবল তাঁহাকে ডাকিতে থাক, সেই অভয়
চরণ-সরোজে চিত্ত সংযোজন করিয়া, কেবল
তাঁহাকে ডাকিতে থাক, তলতপ্রাণ হইয়া,
তদ্ব্যবহিত হইয়া, অটল বিশ্বাসভরে ডাকিতে
থাক,—যে থবে, তোমার জ্ঞানগবেষণা,
প্রমাণ পর্থাৎবেষণা, বিজ্ঞান অবিজ্ঞান কিছু-
রই প্রয়োজন হইবে না, একমাত্র তত্ত্ববলে
তুমি অন্যায়সে সেই জ্ঞানাত্মক, বোধাত্মক,
কল্পনাত্মক ভাববন্ধনহারা হরিকে হৃদয়ে

ধারণ করিয়া, চরণে পরম পরমার্থ লাভে
সমর্থ হইতে পারিবে।

হৃদয়ে ঈকপট ভক্তি থাকিলে, অবশ্যই ঈশ্ব-
রের রূপা আকর্ষণে সমর্থ হওয়া যায়। এ
সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প, আমরা আমাদের
আলোচনার ধর্মশিলায় পাঠকবর্গকে অন্য
উপহার প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধের উপ-
সংহার প্রদান করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।
জ্ঞানার্জনের লালসা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী
ছিল। সংস্কৃত ভাষার প্রগাঢ় অমূল্যলনে
তিনি উক্ত ভাষার অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ
করিয়াছিলেন। বেদ, পুরাণ, কাব্য, অল-
কার, তন্ত্র, স্মৃতি এবং দর্শনাদি অশেষ শাস্ত্র,
সর্বদা তাঁহার তৃণাণ্ড্রে বিস্তার করিত। নানা
শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াও কিন্তু
তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন শিলাসার শান্তি হইত
না—সর্বদা অভিনব শাস্ত্র-সমুদ্রে ডুবিয়া
থাকিতে বড়ই ভালবাসিতেন।

নানা শাস্ত্র আলোচনার মধ্যে থাকিয়া
যে, ব্রাহ্মণ ঈশ্বর-চিন্তার বিরত থাকিতেন
এরূপ নহে, বরং ঈশ্বর-চিন্তাই তাঁহার জীব-
নের সার ব্রত ছিল—ঈশ্বর-চিন্তাই তাঁহার
—জীবনের প্রধানতম লক্ষ্যস্থল ছিল। তাঁহার

পাঠাশাস্ত্র গ্রন্থসমূহ মধ্যে যে সকল শাস্ত্রে
ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সংবাদ অধিক দেখিতে
পাইতেন, সেই সকল শাস্ত্রের অগ্রশীলনেই
তিনি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিতেন।
কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এষ্ট শাস্ত্র-
ধার্ম্যনেও তাঁহার মনে কিছুমাত্র আশ্রয়
প্রসাদ জন্মাইত না। নানাশাস্ত্রের অটল
মত বাদ ঈশ্বর তত্ত্বের মীমাংসায় তাঁহার
মনে নানারূপ সংশয় আনিয়া দিত—নানা
শাস্ত্রের নানা কূটতর্কে, ঈশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ব
নির্ধারণে তাঁহার পক্ষে প্রবল পরিপন্থী
হইয়া দাঁড়াইত। কোন শাস্ত্রে লিখিত
আছে, ঈশ্বর সাকার, কোন শাস্ত্রে লিখিত
আছে ঈশ্বর নিরাকার; কোন শাস্ত্রে মীমাং-
সিত হইয়াছে, ঈশ্বর অদ্বৈত, কোন শাস্ত্রে
মীমাংসিত হইয়াছে, ঈশ্বর দ্বৈত; কোন
শাস্ত্রকার বলিতেছেন, ঈশ্বরকে প্রকৃতিরূপে
ভজনা কর, কোন শাস্ত্রকার বলিতেছেন
ঈশ্বরকে পুরুষরূপে ভজনা কর; কোন শাস্ত্রে
বর্ণিত আছে,—ঈশ্বরের রূপ, অসীম অনন্ত;
প্রকৃতি পুরুষ এ দুইটি তাঁহার সেই অনন্ত-
রূপের অভেদ মূর্ত্তিমাত্র, অতএব সাধক ইচ্ছা
করিলে রূপ বৈষম্য বা দ্বৈততাব পরিবর্জন
করিয়া, প্রকৃতি ও পুরুষ রূপের বাস্তবিকভাবে
কিছা উভয়রূপ সমষ্টির একত্রে উপাসনা করিতে
পারেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকার ভিন্ন
শাস্ত্রে আপনাপন মতের ব্যাপন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ শক্তিমত্রে দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু
নানাশাস্ত্র কূটজালে নিপতিত হইয়া তিনি
ইষ্ট মত্রে ভিন্ন বিশ্বাস হইতে পারেন নাই।
কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া স্রোতেনিকিঞ্চ ভ্রম-
বস্তুর ভ্রাম্য কেবল নিরুদ্বেগ নানামতের
অনুবর্তন করিতেন। এইরূপে বিনের পর
দিন বাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ বার্কিকা
দশায় উপনীত হইতে লাগিলেন, মহাকাশের
করাল মূর্ত্তি ক্রমশঃ পুরাবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে
অস্তিমের ভাবনার আকুল করিয়া তুলিল।
অতঃপর এই ভীষণ ভাবার্ণব কিরূপে উত্তীর্ণ
হইবেন, এষ্ট চিন্তা প্রবলা হইয়া শাস্ত্রাধার-
নেও তাঁহাকে বীতরাগ করিয়া তুলিল।
ব্রাহ্মণ দারুণ হর্ভাবনার কাতর হইয়া বলিতে
লাগিলেন,—“হায়, আকৌবন জ্ঞানানুশীলন
ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া আমার কি ফলোদয়
হইল? এতদিন আমি কাহার উপাসনা
করিলাম? কিন্তু জ্ঞান কট? কোণার
জ্ঞানের অস্তিত্ব? জ্ঞানকে কি আমি
দেখিতে পাইয়াছি? ভ্রম,—মহাভ্রম;
জ্ঞানকে কে কবে দেখিতে পাইয়াছে?
জ্ঞানের আরাধনায় কে কবে সিদ্ধিলাভ করি-
য়াছে? কোন মূর্খ দর্প করিয়া বলিতে
পারে,—আমি জ্ঞানী? জ্ঞান সমুদ্রে নিমগ্ন
হইয়া, তন্মধ্যার অহারণ করা সুদূরপরা-
তত, আমি জ্ঞানসিদ্ধ তীরস্থ সামান্য উপল-
বৎ সংগ্ৰহেও সমর্থ হই নাট। হায়!

জানচর্কার মরীচিকার প্রলুব্ধ হইয়া এতদিন
আমি ভুলত মানব জীবন বুধার বাশন করি-
য়াছি, “জান, জান”—করিয়া সারা জীবনটা
বুধার ক্লেপণ করিয়া হুকুণ হারাইয়াছি।
একশ্রেণী অন্তিম, এই অকুণ ভব-জগতি
কিরূপে অতিক্রম করিব ভাবিয়া যে কুণ
পাইতেছি না। শাস্ত্র কুট লইয়া বিতর্ক
করিবার আর এখন সময় কই? হার হার!
জানমদে অন্ধ হইয়া, ভ্রমেও একদিন শুক-
ময় উচ্চারণ করি নাই। বুঝিলাম এখন,—
শাস্ত্রের বিতর্ক সব ভূয়াবাজীমাত্র,—কিছু-
তেই কিছু নাই,—বিখ্যাসই পরম পদার্থ,—
বিখ্যাসই সুলভাত্র,—আপনাপন ইচ্ছাময়ে
নিষ্ঠুর করাই সুবিস্তার কার্য। হে দয়াধরি!
হে দীন তারিণি! হে জ্ঞান গন্ধ খর্ষক কারিণ
কালীকে! এই অধম জ্ঞানাত্মকের মনের
থক্ অপমোদন কর মা! বুঝিলাম! তুমি
জ্ঞানের অপগোচর,—শাস্ত্র ঘাটিয়া তোমার
তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলের কার্য।
হে অজ্ঞান নাশিনি! আবার জ্ঞানের গর্ভ,
পাণ্ডিত্যের গর্ভ সব চূর্ণীকৃত হইয়াছে, একশ্রেণী
অবোধ সন্তান—অজ্ঞান তনয়, কি উপায়ে
তোমার অন্তর চরণ সরোজে স্থান পাইবে
যদিয়া দাও?

ত্রিবিজপদ চট্টোপাধ্যায়।

সুখ ও দুঃখ ।

সুখ কি, এবং দুঃখই বা কাহাকে
বলে,—এতদ্বয়ের সম্বন্ধই বা কিরূপ, মানব
একদিনের জন্যও সে চিন্তা করে না, অথচ
সুখের জন্যই লাগান্নিত সুখের দিকেই
সর্বদা প্রধাবিত। দুঃখের নাম গন্ধ তাহা-
দের সচেতনা, দুঃখের কটেকাকীর্ণ পথে এক
দিনের জন্তও বিচরণ করিতে চাহেনা,
অশিচ “সুখ সুখ” করিয়াই বিব্রত এবং
সুখাদেহেই তাহার লক্ষ্য ব্রষ্ট। তাই
তাহাদের কষ্টের ফল ও জীবনের শেষ
লক্ষণ, মহা দুঃখ,—অনন্ত নরক। সুখ-
দুঃখের প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিয়া যদি আমরা
সুখাবেশে কষ্টের পথে অগ্রসর হই এবং
সুখের আশায় দুঃখরূপ মহাব্রতে জীবন
উৎসর্গ করিতে ও প্রকৃত কষ্টক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হইতে পারি, তাহা হইলেই আমরা দেখিব,
আমাদের ঐ দুঃখমূলক কষ্টের শেষ পরিণাম,
—অনন্ত সুখ ও অপার আমন। তাই বলি,
সুখ দুঃখের বিষয় একটু বিশেষ চিন্তা করা
প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্তব্য।

সুখ কি?—না, শারীরিক ও মানসিক
অবস্থার আভ্যন্তরিক প্রভুত্ব। দুঃখ তাহার
বিপরীতার্থের উল্লেখক। কিন্তু তাহাইলেও

হুঃখই বিবর্তনে মানবের ক্ষমতাকালে স্বপ্ন স্বর্ঘ্য। হুঃখের পরিণামেই মানবের স্বপ্ন-স্বর্ঘ্য। কিন্তু তথাপি ভ্রান্ত মানব হুঃখ মূলক স্বপ্নের আশায় হুঃখ ছাড়িয়া স্বপ্নের জন্তই উদ্ভ্রান্ত। স্বপ্নেচ্ছ মানব! এরূপ অবস্থায় তোমাকে “স্বপ্ন স্বপ্ন” করিয়া উদ্ভ্রান্তের জায় কেবল ঘুরিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। তোমার কাজিও স্বপ্ন-চক্রেয় দ্বিগুণ ও শান্তিপ্রাপ্ত সুশীতল জ্যোৎস্নার পরিবর্তে নিদ্রাঘের মধ্যাহ্ন মাস্তকের প্রভুত্ব করিলে তোমার দম্ব হইতে হইবে। তুমি বাহার দিক দিয়া ঘেসিতে কাপুক্ষণের জায় আপন ক্ষমতার দুর্বলতা অভিভাব্য করিতে, শেষে সেই হুঃখই তোমার ক্ষমতার রক্ত শোষণ করিবে এবং হুঃখ ছাড়িয়া স্বপ্নের অন্বেষণে গিয়া “হা স্বপ্ন! হা স্বপ্ন!” করিয়া অনন্ত হুঃখ্যাগরে ডুবিয়া মরিবে। তাই বলি মানব! স্বপ্নের আশা করিতে হইলে হুঃখকে ছাড়িও না; হুঃখই • তোমার ভাবী উন্নতির মূল!

• সর্ববিধ আকস্মিক বিপদ বা হুঃখ কখনও স্বপ্নের নিদান হইতে পারে না। যেমন কাহারও পুঙ্খের প্রাণবিরোগ হইল, কাটা-রক্ত বা বহুর বিরোগ ঘটিল। এই প্রেক্ষার হুঃখ কখনই স্বপ্ন মূলক হইতে পারেনা। পরন্তু তাহা মজা হুঃখেরই মূলীভূত কারণ।

জন্মের সকলই স্বপ্নের অতিশায়ী, স্বভাব স্বপ্নাশ্রয়ী। পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ সম্প্রদায় ভূত প্রত্যেক মানবজন্ম একে একে অন্বেষণ কর দেখিবে তাহাদের প্রত্যেকেই স্বপ্নী হইবার বা স্বপ্ন পাইবার ক্ষমতা স্বপ্নের অঙ্গসন্ধানে জীবনের প্রান্তবর্ত্ত বহু-বিধ কষ্টক্ষেত্রে নিরোজিত রাখিয়াছে। কিন্তু যেরূপ পক্ষী স্বপ্নের অঙ্গসন্ধানী করুক না কেন, আমরা দেখি স্বপ্নের পথ একটী, তাহার নাম হুঃখ। এই হুঃখ পথ আবার সত্য কটকাকৌণ, বিবিধ অন্তরায়ের সম্মুখ সম্মুখ। স্বপ্নের অন্বেষণে এপথে পদে পদে বিপদ সম্ভব। এবিধ অবস্থার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার দৃঢ়তা সম্পাদনে কিংবা ঐর্ষ্যা অপমানের ও জ্ঞানানুভূত বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরিচালনে অসমর্থ হইলে, অথবা গন্তব্যপথের বিবিধ অন্তরায় দূরীকরণে বহুপর্য্যক হইতে না পারিলে স্বপ্নের আশা আকাশ কুসুমের পরিণত হইবে। পক্ষান্তরে স্বপ্নের আশা ক্ষমতায় পরিণত এবং সাধনার কঠোরতম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ঐর্ষ্যা, বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরিচালনা দ্বারা হুঃখের পথে স্বপ্নের অন্বেষণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া — বিপদের পর বিপদে পড়িয়া, কষ্টের পর কষ্ট সহিষ্ণু ও হুঃখের পর হুঃখ পাটকা উঠা স্বপ্ন সম্প্রদায়ের প্রধানতম উপায় জানে লক্ষ্য।

হ্রস্ব রাধিতে পারিলে এবং সুখ স্নাত্তোর পরিপাকী সন্তুষ্টির নিকট একবার হইবার এমন কি সহস্রবার পর্যন্ত পরাশ্রিত হইয়া ও বিচলিত ভ্রমোদ্যম বা পদত্পনিত না হইয়া বিজিত হইবার উদ্দেশ্যে বদ্ধ পরিকর হইতে শিখিলে তখন আশার প্রদীপ্ত আলোকে বিমল সুখের নির্গন্ধাভি মিশিয়া অনাগত অদূরবর্তী সুখের মন্দির আলোকিত করিয়া ফুলিবে। সেই আলোকে তোমার হৃদয়ে অন্ধকার দূরে পলাইবে, শেষ সুখের অস্তিত্ব-বধারণে সমর্থ হইবে, তখন তুমি আপনাকে সুখী বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিবে।

সুখ সাধনার কিনিষ—সাধনার কিনা হয়! দরিদ্র রাজা হয়, মুখ পণ্ডিত হয়। এবং সংসারে অতি যুগ্ম ঘোর নারকীও সাধন সুত্র ধরিয়া স্বর্গের দ্বারে উপনীত হয়, অমরত্ব লাভ করে। তবে সাধনার সুখ পাইবে না কেন? জীবনের প্রথম-ভাগে পাপাচারে নিরত ও ঘোর নারকীর মতিভ্রমে উদ্ব্যক্ত যে রত্নাকর অর্থের লোকে সামান্তর লভ্য নরহত্যা করিতে অগ্রহাভি-প্ৰীত হইতেন না, সেই রত্নাকর সেই কঠিন জন্ম, নির্ধন দহ্য রত্নাকর শেষে গাধনার বলে বাণীক নামে অভিহিত হইয়া কিরূপে পরমাধ লাভে সমর্থ হইয়া ফলেন, তাহা একবার ভাব দেখি? আর সেই সঙ্গে মহারাণা বিখ্যামিজের বিষয়ও

একটু চিন্তা করিয়া দেখ, তিনি প্রবল প্রতাপ-শালী রাজা ছিলেন, বাহু সুখ সম্পদে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য প্রতিভাত হইত, লোকে তাঁহাকে পরম সুখী জ্ঞান করিত। আর ইহাও নিশ্চিত যে, যুগ দৃষ্টিতে যাহা অপরি-মেয় সুখের সম্পদ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, মহারাণা বিখ্যামিজের তাহার কিছুই অভাব ছিল না। তবে কেন তাঁহার চিত্তের বিকার খটিয়াছিল? কেনই বা তাঁহার সমুদয় বাহু সুখ সম্পদে—মংলিন্য পড়িল? না, যখন তিনি দেখিলেন একটা বন্ধপহারী, সামান্য কুটিল নিবাসী বনবাসী ব্রাহ্মণের নিকট—ব্রাহ্মণের মানসিক শক্তির নিকট, তাহার তুচ্ছ শারীরিক ও মানসিক শক্তি ফুৎকারে উড়িয়া গেল; তখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সুখের পরিমাণ ততটুকু। তাই তিনি আশা ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিলে ও বিমল সুখের অধ্বংসেই সমুদয় বাহু সুখ সম্পদ ছাড়িয়া কঠোরতম তপশ্চর্যায় নিরত হইলেন। তপ ও কঠোরতম সাধনার বলে অদম্য আশা ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতে বৈরাগ্য-অপার আনন্দ ও অতুল সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা তাবিলেও আশ্চর্য্যাবিত হইতে হয়। আর মনে হয় সাধনার কিনা হয়? সেই ভ্রমাই বলি হইবে, তুমি দুঃখ করিওনা, সুখ তোমার জন্য প্রস্তুত করিতেছে। তুমি সুখের জন্য হঃস কর,

সাধন মন্ত্রে হৃদয়ের হুর্দগতা দূর কর স্বপ্ন তোমার স্বাধিকারগত হইবে। জ্ঞানহীন স্বাণক বাল্যকাল হঠাতে যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষভাবে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নত করে সাধনার অঙ্গ স্বরূপে বিবিধ কষ্ট-ভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে অজ্ঞান অন্ধকার হইতে জ্ঞানের শুভ্র ও নির্মল আলোক প্রাপ্তে অগতির সমুদ্র রহস্ত একেত্মপটাকরে দেখিতে পায়, হে দুঃখি! তুমিও সেইরূপ বালকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বপ্নের সীমার পা দাও, তোমার দুঃখের অবসান হইবে।

দুঃখ সাধকের সাধন মার্গ, দুঃখ ধর্মার্থ কাম মোক্ষ লাভের অব্যর্থ সাধন মাত্র, দুঃখই বিবিধ দুঃখমূলক বাধা বিপত্তি নাশের শাণিতাত্র। দুঃখ বিনা সাধনার সিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূরপর্যন্ত। তাই বলি, স্বপ্ন তুমি দুঃখ বিনা হ্রস্ব, দুঃখের সহিত তোমার সংশ্রব নিরন্তর বিমিশ্রিত। সেই অন্তর্ভুক্তই কোন কবি স্বকীয় জীবন তন্ত্রীতে বন্ধার তুলিয়া মধুর স্বপ্নে গাহিয়াছিলেন,—

“এ সংসার সরসীর ঘাটে

এক বৃন্তে পুষ্প হয়, ঠোকাটে স্বপ্ন দুঃখময়,

কেহনা তুলিতে পারে একটা কমলে।

একের আশয়ে নীরে গিয়া, উঠে হাতে হুটী

অকাইয়া,

ক্রমে উত্তরের হাত পরে গোকে গলে।”

কবির এই উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, বোধ হয় স্বপ্নাশয়ে পাঠকবর্গ হিরণ্যচৈতন্য একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তাহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন। বাহ্য হউক, এখানে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে স্বপ্ন,—দুঃখ বিনা হ্রস্ব। এক্ষণে দেখা যাক যে স্বপ্ন কোথায়?—

ধনীর প্রাসাদে, কুবেরের ঘন অরণ্যে, বিলাসার প্রিয় নিকেতনে, পণ্ডিতের প্রশস্ত মনে, কোকিলের বাসস্তি গানে, দান্তিকের আত্মাভিমান, ধনীর ঘন গর্ভে, তাকিকের তর্ক কোণে, দরিত্রের তপ ভবনে, মূর্খের অন্ধজ্ঞানে একে একে অবশ্যেণ কর; স্বপ্নের সন্ধান পাইবে কি না সম্ভেদ। তবে স্বপ্ন কোথায়?—না, মানবের অন্তরে অন্তরে,—মানস মন্দিরে, এই মন্দিরের পঞ্চদ্বার। এই প্রত্যেক দ্বারের নাম জ্ঞানেশ্বর। স্বপ্নের সন্ধান একে একে ঐ সকল দ্বার উন্মোচন কর, মানস মন্দিরে স্বপ্নের সত্য অনুভব করিতে পারিবে,—স্বপ্ন কোথায় দেখিতে পাইবে, অতঃপর আমরা যখন পঞ্চ জ্ঞানেশ্বর দ্বারের বিকাশ বা ক্ষুদ্রিত অথবা পরি-তৃপ্তিতে মনের ক্ষুদ্রিত অনুভব করি, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে,—স্বপ্ন জ্ঞানের দ্বারে মনের ভিতরে।—মনের অন্ত-তৃপ্তিতে পঞ্চ জ্ঞানেশ্বরের যে ক্ষুদ্রিত তথ্য-ভেদ স্বপ্নের পূর্ণ বা চরম বিকাশ। নহিলে

স্বপ্নের অস্তিত্ব কোথায় ? হুংখী, তুমি এ স্বপ্নে বঞ্চিত হইবে কেন ? তুমি জানেন্সিরের পূর্ণ বিকাশ করে আশা ও আকাঙ্ক্ষা সহযোগে নিম্পাপ কর্তব্য পালনে যত্নবীণ হও, মানস যন্ত্রিরকে নিরন্ত নির্মল যাপ, কুচিন্তা কালিমার আপনাকে কখনও কলঙ্কিত করিও না, স্বপ্ন তোমার কদাচ পরিভাগ করিবে না, তুমি হুংখের অবস্থাতেও স্বপ্নের যদুন্নিমিত্ত সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

জগৎ কর্ণের দাস এবং কর্ণের পরিণাম স্বপ্ন হুংখ। অতঃপূর্বে আপনা হইতে কোন কার্য্য করিতে অসমর্থ, স্তব্ধতা নিশ্চেষ্ট, ক্রিয়াকলাপে অসমর্থ মানসিক গতিতে অবিরত পতিত বিশিষ্ট। এত হেতু মনের অননুভূতি ক্রমে কর্ণ করিতেই সচেষ্ট। এই মানবক গতিক্রমে আমরা বিবিধ কর্ণের উদ্দেশ্যে নানা পথে চলিতেছি। আমরা সকলেই যখন কর্ণের দাস এবং মনের অবাধ গতিতে সন্নিহিত কর্ণ কারতে সচেষ্ট, তখন কেহ হুংখী কেহ হুংখী হয় কেন ? না, বাহ্যিক ভিত্তিহীন বা লক্ষ্যবিহীন কর্ণের উদ্দেশ্যে শূন্য মনে উদাস প্রাণে স্বীয় শক্তির অপব্যবহার করে, অথবা কর্তব্যের পথে বেশ চলিতেছে, লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া বেশ কার্য্য করিতেছে, কিন্তু ক্রিয়াকলাপে যিহা হঠাৎ লক্ষ্য স্রষ্ট হইয়া বিপথ-গামী হইল, কিম্বা বিশৃঙ্খল ভাবে চলিয়া হুংখেরই সংলগ্ন হইয়া পড়িল, যে সকল

মানবের কর্ণের অভিনয় এই ভাবে পরি-সমাণ্ত হয়, বিধির বিধানে তাহাদের অদৃষ্ট লিপি তাহাদের অনন্ত হুংখ ঘোষণা করে। পক্ষান্তরে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া লক্ষিত বিষয়-টিকে জীবনের ঐক্য ভায়া জানে এক মনে এক ধ্যানে কর্ণের অদৃষ্টানে নিবৃত্ত রাখিতে পারিলে এবং কর্ণের পরিসমাপ্তি কাল পর্য্যন্ত ঐ ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইলে, বিধি-তার অদৃষ্ট লিপি, তাহার অদৃষ্টে বাজক স্বপ্নের সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

জগতে দুই মতের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, একদল কর্ণবাদী, অন্য দল অদৃষ্ট পক্ষ-পাতী, কর্ণবাদী কৃত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সর্ব্ব কালেই অদৃষ্টের ফলাফল কর্ণ স্বপ্নের সঞ্চিত প্রণিভ হেথেন, আর অদৃষ্ট পক্ষপাতীর দল স্বকৃত কর্ণের প্রত্যেকটীতেই আগুন অদৃষ্টের ফলাফল দেখিতে পান এবং কেহবা নিজ কৃত কার্য্যের প্রত্যেকটীতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অবলোকন করেন, এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোক অতি ভয়ঙ্কর, তাহারা ঈশ্বরের গতি ভক্তির আদর্শ দেখাটতে গিয়া প্রকারান্তরে মঙ্গলময় জগদীশ্বরের উপর ভরানক দেখা-রোপই করিয়া থাকেন এবং ভগবানের নামে কর্ণের পথে কাঁটা দিয়া নিশ্চেষ্টভাবে অব-লম্বন পূর্ব্বক সচেষ্ট হুংখের পথ পরি-কার করিয়া লয়। জগতে ঈদৃশ অলস ও নিষ্কর্ম্মার পরিণাম অসৌম্য হুংখ, অনন্ত নরক।

বাহা হটক, এক্ষণে আমরা স্থখ দুঃখ সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা বলিয়া এ শ্রবকের উপসংহার করব।

স্থখ দুঃখের কিরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কতকটা চেষ্টা করা গিয়াছে, এক্ষণে দেখা যাউক, দুঃখের সহিত স্থখের আর কোনরূপ ঘনিষ্টতা আছে কি না।

দুঃখ, স্থখের মান দণ্ড।—স্থখ, দুঃখের তুল্য দণ্ডে নিয়ত তুলিত। দুঃখ ভোগ না করিলে স্থখের সমুদ্রমা সম্যক উপলব্ধি হয় না। দুঃখ না থাকিলে স্থখের স্ফুটন থাকিত না, দুঃখ আছে বলিয়াই স্থখের অবস্থার পরি-
তৃপ্তি এবং তাহাতেই আশার নিবৃত্তি। মানব! তুমি স্থখের অবস্থানে যে দিকে যাও সেই দিকেই দুঃখের নিদাক্ষণ বিভীষিকা দেখিতে পাইবে, যদি তাহাতে ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হও, তবে স্থখ প্রাপ্তির আশা দুরে থাক তোমার দুঃখের অবস্থান অনন্ত নরকে। স্থখ দুঃখের একপূর অবস্থা, বুঝিয়া যদি স্থখ ভোগের বাসনা করিতে চাও তবে দুঃখকে সঙ্গে লও, দুঃখের সহযোগিতায় প্রকৃত কষ্টের পথে অগ্রসর হও, স্থখ তোমার স্বাধিকারপত্ৰ হইবে।

আমাদের কথা।

আমরা আজ ৮ মাস হটল গ্রাহকদের নিকট নিয়মিতরূপে পত্রিকা পাঠাইয়া আসি-
তেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও অনেক গ্রাহকের নিকট মূল্য আদায় হয় নাই, সামান্য ১ টাকা মাত্র বার্ষিক লভ্যা প্রাপ্ত-
বাসে সকলের ভিকট পত্র লেখা সম্ভবপর নহে, আজকাল বাঙ্গালী স্বদেশবৎসল হই-
রাছে। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাহাদের আন্তরিক প্রীতি প্রকাশিত, স্বদেশীয় জব্যের উন্নতিকল্পে সাহায্য করিতে এখন তাহারা মুক্তহস্ত, কিন্তু আমাদের সামান্য মাত্র বার্ষিক ১ টাকা যে এখন পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়; বাহা হটক, স্বদেশ ও স্বজাতি তত্ত্ব গ্রাহক মহোদয়গণ সমীপে আমাদের করপুটে নিবেদন এই যে, এই সংখ্যা প্রাপ্তি মাত্র তাহারা যেন স্ব স্ব বার্ষিক সাহায্য ১ পাঠাইয়া আমাদের উৎ-
সাহ বর্দ্ধন করেন, নতুবা আমরা আগামা ব্যয়ে সকলের নিকট তিঃ পিঃ তে পত্রিকা পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিব।

কাব্যানন্দ।

স্বপ্ন ।

গভীর তন্দ্রার ঘোরে স্বপন মধুর
 কি শাস্তি ঢালিল আঁহা, কি স্মৃতি সংযোগ
 লভিল বিদগ্ধ প্রাণ বিরহ বিধুর,—
 স্বরগের কি সৌন্দর্য্য স্মৃতি উপভোগ !
 নিতম্ব চুম্বিত সেই দীর্ঘ কেশরাশি,
 প্রফুল্ল গোলাপী গণ্ড, রক্তিম অধর,
 কুন্দ শুভ্র দশনের সৌদামিনী হাসি,
 আবার মুহূর্তে যেন মোহিল অন্তর !
 কত বর্ষ, কত যুগ হেরিনি তাহার
 বিমল প্রতিভা দীপ্ত দেব দেহখানি,
 আজি আলিঙ্গনে বাঁধি, সে মূর্তি আমার
 দিয়াছে কতই স্মৃতি ঢালিয়া না জানি !
 কি মদিরা প্রেমময়,—প্রীতি প্রভাবণ,
 ছ'জনের বিনিময় একটি চুম্বন !

শ্রীঅটলবিহারী দাস ।

কলিকাতা,—১৩৩ নং মস্জিদবাড়ী স্ট্রীট, “হরি-যজ্ঞে”

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

আলোচনা।

“মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।”

নবম বর্ষ।

পৌষ সন ১৩১২

নবম সংখ্যা।

ভক্তির জয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের একটি চতুষ্পাঠী ছিল। অনেক-গুলি ছাত্র; তাঁহার সেই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিত। পাঠার্থী ছাত্রবৃন্দের মধ্যে অরবিন্দ নামক একটি আট নয় বৎসরের ব্রাহ্মণ বালক ছিল। অরবিন্দের বুদ্ধি বৃদ্ধি এবং প্রতিভা যেরূপ অসামান্য ছিল, প্রকৃতিও সেইরূপ নানা সদগুণে বিভূষিত ছিল। একাধারে মণি কাকনের সংযোগ হইলে যেরূপ প্রীতিকর দেখায়, বিদ্যাও গুণের একত্র সম্মিলনে তদ্বৎ তাহাকেও সেইরূপ প্রিয় দর্শন করিয়াছিলেন। বালক শিশু গুরুকে সাক্ষাৎ দেবতার স্তায় ভক্তি করিত, গুরুও তাহাকে হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করিয়া বিদ্যা রত্ন দান করিতেন।

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, এক্ষণে আর বুঝাচ্ছে

জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করা আশ্চর্যকর কাণ্ড। বহুদিন হইতে তিনি চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আর এরূপে কালহরণ করা কর্তব্য নহে, সমস্ত জ্ঞান সিটাইয়া এখন জীবনের চিন্তা করাই সমস্তোত্তম বিধেয়। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি একে একে সকল ছাত্রকেই বিদায় দিতে লাগিলেন। অরবিন্দকে তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন, সুতরাং তাহাকে বিদায় দিতে তাঁহার বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন, সে নিকটে থাকিলে পাছে তাঁহার বাহিত বিষয়ে কোন প্রকারে বাধা পড়ে, এই ভয়ে অবশেষে তাহাকেই বিদায় দেওয়া শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ অরবিন্দকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন,—“দেব বৎস! আমি ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য সীমার উপনীত হইতেছি, চিরদিন পার্থক্য বিষয়ের আলোচনার

যাপৃত থাকি অবিবেচকের কার্য ; অনিত্য জগৎ,—অনিত্যদেহ ; অনিত্য ভবসাগরে আমরা এক একটি অনিত্য জলবিধ,—“কখন আছি কখন নাই”—কে বলিতে পারে ? বৎস ! আমার অনিত্য জীবনের অসার লীলাখেলা ক্রমশঃ কুরাইয়া আসিতেছে, এই সময়ে পরকালের পথ দেখা শাস্ত্রানুমোদিত ; এজন্ত আমি ইচ্ছা করিয়াছি, এখন হইতে বধা সম্ভব পার্শ্বিক সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া অবহিতচিত্তে ঈশ্বর চিন্তায় জীবনের অংশিষ্ট কাল যাপন করিব। বৎস ! সত্য কথা বলিলে পক্ষপাত দোষে দূষিত হইতে হয়, নচেৎ আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, সকল হাজ অর্পেকা তোমাকে আমি অধিক স্নেহ করি। আমি একেই সকল ছাত্রের নিকটেই অবসর গ্রহণ করিয়াছি, অতঃপর। তোমার নিকটেও অবসর চাহিতেছি। ভগবানের কৃপায় তুমি আমার নিকট বাহ্য কিছু শিক্ষা করিয়াছ, তদ্বারা অবলীলাক্রমে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে। আশীর্বাদ করি,—তুমি তির্যকীবি হও, এবং ধর্ম পথে গম্য রাখিয়া পরম সুখে কালযাপন কর।”

অয়। ওরো ! আমার নিত্য হুতীয়া, তাই আজ তাপনার কাছে এই হৃদয় তেলী কথা শুনিতে হইল। শিতকাল হইতে ভগবান আমাকে পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু আপনার

নিকট আমিরা অবধি একদিনও আমার তাঁহাদিগকে মনে পড়ে নাই। আমি যে পিতৃ-মাতৃহীন, আপনার অকৃত্রিম-স্নেহে তাহা সুহৃৎের জন্তও তাবিবার অবকাশ পাই নাই ! হার ! আজ হইতে আমাকে বথার্থই পিতৃ-মাতৃহীন হইতে হইল। বাহাহউক ওরো ! সেজন্ত আর পরিতাপ করিয়া কল নাই। আমি আত্মসুখের জন্ত আপনার অভিপ্সিত পথে কণ্টক প্রদান করিতে চাহিনা। কর্মকল ভোগ অনিবার্য্য,—জগ-দীশ্বর আমার অদৃষ্টনিধি বেক্সেপে অঙ্কিত করিয়াছেন ; অবশ্যই তাহা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু অধম আমি, আশ্রয় আপ-নার অগ্রে প্রতিপালিত হইয়া,—অশ্রয় আপনার নিকটে অশ্রয় উপদেশরত্ন লাভ করিয়া, সাহস পরমাণেও আপন্য উপ-কার করিতে পারিলাম না, এই দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ওরো ! আপনার ত কিছুই অজ্ঞাত নাই,—আপনিত সকলই জানেন, আমার ভ্রাতা নিরাশ্রয়, অনাথ এ মহীমণ্ডলে হুল্লু। ওরো ! এদীন হীনের দ্বারা যে আপনার কোন বিশিষ্ট উপকার হইবে সে সম্ভাবনা বন্দুমান নাই। আমি, অনন্ত জীবনেও গুরুর গুণ অপরি-শোধ্য।—কে কবে গুরুর গুণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছে ? তথাপি ওরো ! আমার একান্ত অভিলাষ, অধর্মের প্রতি

কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার কার্যিক শ্রমলব্ধ
কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণে জীবন সার্থক করুন ।

ছাত্র অরবিন্দের অস্বাভাবিক গুরুভক্তি, ব্রাহ্মণ
পূর্ণাপরই বিদিত ছিলেন । এক্ষণে তাহার
ভক্তির অটলতা, লোকাভীত রুতজ্ঞতা এবং
অপূর্ণ সরল হৃদয়তা দর্শনে মোহিত হইয়া
গেলেন,—জানিনা, তাঁহার মনে কি এক
অভিনব তাবের আবির্ভাব হইল, অভাপন্যত
শশধরবৎ, তাঁহার চিত্তাক্রিয় বদন মণ্ডলে
সহস্রা তর্কের বিমলবিভা বিকীর্ণ হইতে
লাগিল । ব্রাহ্মণ মনেই ভাবিতে লাগিলেন,—
বুঝিবা এই ব্রাহ্মণ বটু দ্বারাটী জগদম্বা তাঁহা
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন । যাহাউক, অতঃ-
পর, তিনি মনোভিপ্রায় কিছুমাত্র পরিশুদ্ধি
না করিয়া বসিলেন,—“বৎস অরবিন্দ !
তোমার ভায় পুতচরিত্র বালক এ সংসারে
হুস্তাপ্য, তোমার সদ্ভিচ্ছা প্রাণোদিত নাহক
আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি । আশীর্বাদ
করি, জগদীশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ
করুন । যদি গুরুদক্ষিণা দানে তোমার
একাঙ্কই অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তুমি
আমার একটি কার্য্য করিতে পার । সেট
কার্য্যটি তোমার দ্বারা সম্পন্ন হইলে, আমি
বড়ই উপকৃত হইব ।”

অরবিন্দ ! বলুন শ্রোতা ! এ দাসকে কোন
কার্য্য সাধন করিতে হইবে ? আদেশ প্রাপ্ত
হইলে এদাস কৃতার্থ হয় ।

ব্রাহ্মণ । বৎস ! আমার কার্য্যটি বড়ই
গুরুতর, বড়ই শ্রম সাধ্য,—বালক তুমি,
তোমার দ্বারা তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর বিবে-
চনায় প্রকাশে ইতস্ততঃ করিতেছি ।

অরবিন্দ । অকুণ্ঠিতচিত্তে বলুন শ্রোতা !
সাধার অতীত চাইলে ও তৎসাধনকল্পে কথ-
নই পরাশ্রয় হইব না । অথবা যদি সেই কার্য্য
সাধনে আমার জীবন গ্রহণেরও আবশ্যকতা
থাকে তাহাও অগ্নান বদনে ব্যক্ত করুন,
এই কৃমি-কীট-ভোজ্য নবরজীবন গুরু
চরণে উৎসর্গীকৃত করিয়া জন্ম সকল করি ।

ব্রাহ্মণ । বৎস ! ধৈর্য্যাবলম্বন কল্প,
জীবন পণ করিবার আবশ্যকতা নাই । তবে
সেই কার্য্যটি সাধন করিতে, একটু কষ্টে-
রতা, একটু একাগ্রতা, একটু ক্রেশ সহিষ্ণুতা,
একটু বৈশাঙ্গীনতার প্রয়োজনতা দেখি-
তেছি এ সকল গুণ তোমার প্রচুর পরিমাণে
গ্রহিয়াছে ।—বোধ হইতেছে যেন, তোমার
দ্বারা সে কার্য্যটি সম্পন্ন হইলেও হইতে
পারে ।

ব্রাহ্মণ নিরুত্তর হইলেন । তাঁহাকে
নির্বাক দেখিয়া অরবিন্দ বলিল,—“গুরু-
দেব ! মৌন হইয়া রহিলেন কেন ? দক্ষ
করিয়া অভিলষিত বিষয় ব্যক্ত করুন ।”

ব্রাহ্মণ ! বৎস ! বলিও কি, সে কষ্ট
হৃদয় তেদী কথা । কোন মহাপুরুষের
কৃপায় আমি একটি কৃত্য্য লাভ করিষ্ক-

হিলাব, বছরদিন গত হইল আমি সেই কন্ডা-
রস্টি, সেই এক মাত্র প্রাণের—তনয়াটি
কপালদোবে হেলার হারাইয়াছি। আমার
সেই প্রাণাদিকা মন্দিরী অদৃশ্য হওয়ার
পর,—কতদিন; কত বৎসর গত হইল, আর
তাহার কোনই সন্ধান পাই নাই। বৎস!
তাহার অমুসন্ধান জন্ম, এই প্রাচীন বরস
পর্যন্ত চেষ্টা ও যত্নের ফল কিরী নাই, কত
এহ পূজা, শাস্তি স্বত্বারন করিয়াছি, তাহার
সন্ধানের আশা প্রদান করিয়া যে যাহা বলি-
য়াছে তাহাই করিয়াছি, কিন্তু হার! আমার
এমি দুঃখটুকিছুতেই কিছু হয় নাই। বৎস!
আশা করিয়াছিলাম, হরত কোন না কোন
সময়ে তাহার সাক্ষাৎ পাইব, কিন্তু এক্ষণে
ক্রমশঃ সে আশার নৈরাশ হইয়া পড়িতেছি।
প্রাচীনদেহ, ইঞ্জিরবৃষ্টি সমূহ দিন২ অন্নে
অন্নে শিথিল ও অবসন্ন হইয়া আসিতেছে,—
জামিমা কোন্ দিন প্রাণ পক্ষী দেহপিঞ্জর
পরিভ্রাণ করিয়া পলায়ন করিবে! তাই
বলিতেছি, বৎস! বুঝি এ জীবন আর
তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

অরবিন্দ! গুরুদেব! আমাকে কি আপ-
নার সেই নিকৃষ্টি কন্ডাটির উদ্দেশ্য করিতে
হইবে? গুরো! এত আমার পরম
সৌভাগ্যের কথা,—এ কথা প্রকাশে এত
ইতস্তম্ভ করিতেছেন কেন? দাসকে অমু-
সন্ধান প্রদান করুন, যদি আপনার শ্রীপা

পদে আমার যথার্থ ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চ-
য়ই তাহার উদ্দেশ্য করিব।

ব্রা। ই। সংস্রব! তোমার অমুসন্ধান যথার্থ
হইয়াছে, আমার সেই নিকৃষ্টি কন্ডাটির
অমুসন্ধানের ভার তোমাকে অর্পণ করিবার
মনন করিয়াছি।

অ। গুরুদেব! আপনার আদেশে দাস
আজ ধস্ত হইল। এখনই আমি তাহার অমু-
সন্ধান বহির্গত হইব,—যতদিন জীবিত থাকিব
প্রাণ-পথে অমুসন্ধান করিব, যদি কখন
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবেই আবার
ফিরিব, মচেন এটাই শেষ বিদায় জানিবেন।
কিন্তু আমার অমুসন্ধান সৌকার্যার্থে আপ-
নার কাছে তিনটি বিষয় জিজ্ঞাত আছে।

ব্রা। বৎস! তোমার যে যে বিষয়
জিজ্ঞাত থাকে, অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রকাশ কর।

অ। আপনার কন্ডার নাম, রূপ এবং
বরসের পরিমাণ জানিতে ইচ্ছা করি।

ব্রা। যথার্থ কথা বলিয়াছ! বৎস!
আমার অনেকগুলি নাম আছে, তন্মধ্যে
প্রধানতঃ আমি তাহাকে ‘কানী’ নামেই
ডাকিতাম। অতএব তুমিও ঐ নামেই তাহার
তাঁহার অমুসন্ধান করিও। তোমার অপর
দুইটি প্রশ্নের উত্তর একটু চিন্তা সাপেক্ষ,—
বহুদিনের কথা। বৎস! রূপটি যেন ঠিক
মনে পড়িতেছেন না, নিতান্ত শৈশবের দেখা;
তবে, তনিরাছি, তাহার রূপের নাকি সীমা

ছিলনা। ইদানীং যে সকল লোক দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহারা বলেন, যেহেতু নানারূপ ধারণ করিয়া রূপাক্ষর বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তাঁহাদের কেহ বলেন,—সে কৃষ্ণ বর্ণ, কেহ বলেন,—সে নীলবর্ণ; কেহ বলেন সে লালবর্ণ; কেহ বলেন,—সে খেতবর্ণ; কেহ বলেন,—সে পীতবর্ণ; এইরূপে তাঁহাদের নানাভাবে নানারূপ রূপের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বৎস! তাহার স্বরূপ রূপ কিরূপ আজ পর্য্যন্ত কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সকলেই বলেন যেহেতু বহু রূপিণী।

অ। তবেত বড় বিবম সমস্ত দেখিতেছি! আপনার কন্ঠার প্রকৃত রূপ না জানিতে পারিলে, কিরূপে অহুসদ্ধান করিব, তাঁহার কি একটা স্বাভাবিক রূপ নাই?

প্র। আছে বই কি বৎস! অবশ্যই একটু অপেক্ষা কর, আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিতেছি;—হাঁ হাঁ বৎস! এইবার ঠিক মনে পড়িয়াছে,—এইবার আমি তাহার প্রকৃত রূপটিই বলিয়া দিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বৎস! আমার কন্ঠার রূপ, স্বভাবতঃই কৃষ্ণবর্ণ; শারদ পৌর্ণমাসী রজনীতে নভোমণ্ডলের সুহরগ্রাস্ত হইতে বেরুণ মধুরোজ্জ্বল কমলীর কৃষ্ণাভ বিচ্ছুরিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ; অথবা ঘোরাককারময়ী

রজনীতে বিহ্বাদামবিলসিত বর্ণগোধূষ বারিক-বক্ষ হইতে বেরুণ অনির্কটনীরগ্রস্তা উল্লসিত হয় সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। নিবিড় কৃষ্ণ কাদম্বিনী কোণে যুগপৎ কোট্টিত বিক্সবিক্সুরিত হইলে তাহার রমনীয়তা যেমন অপূর্ণ তাব ধারণ করে, আমার কাল মেয়ের কাল আছে যেন সেইরূপ রূপরাশি অক্ষুণ্ণ বিরাজমান রহিয়াছে। তাহার নীল-নীলনির্মিত নিবিড় কুন্তলকলাপ আলুনারিত অবস্থার সত্তত ধরিত-তল স্পর্শ করিয়া থাকে। স্বর্ণগাদি রত্নালঙ্কারে তাহার কখনই স্পৃগ নাট,—সর্বদা মরকত-শির-নিকর-নির্মিত-আভরণ সর্বদা পরিধান করিয়া থাকে। শৈশব হইতে সে কখন বস্ত্র পরিধান করে নাট, সর্বদা লগ্নাবস্থায় থাকিত এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ তাহাকে দিগম্বরী বলিয়া ও সম্বোধন করিত। তুমিষ্ট হইবার সময়, তাহার চারিটি হস্ত এবং তিনটি নয়ন দেখা গিয়াছিল, শুনিতে পাট এখন তাহার সেইরূপ আকৃতিই আছে। কেহই বলেন, সে নাকি সেই চতুর্ভুজের দক্ষিণের দুইটিতে বরাতর এবং বামদিকের দুইটিতে উল্লস রূপাণ ও হিরণ্যময় ধারণ করিয়া থাকে। বৎস! এই আমার কন্ঠার রূপ; তুমি অনন্তচিন্ত হইয়া এইরূপ আকৃতি বিশিষ্টা কামিনী অবেষণ করিও।

অ। আহা শুকদেব! আপনার কন্ঠার রূপত বড়ই অসুত বড়ই বিচিত্র, মরি মরি! এতদ্ব্যতীত কি আর তুলনা আছে। শুভো!

একণে তাঁহার বয়সের কথা বলিয়া উৎসুক
দূর করুন।

ত্রা। বৎস! তাহার বয়সের পরিমাণটী
ঠিক করিয়া বলা কঠিন দেখিতেছি, বহুদি-
নের কথা, কিছু স্মৃতি পথে আসিতেছে না।
যাহা হউক, ইহার জন্য তোমার চিন্তার
কোনই কারণ নাই, বয়সের পরিমাণ জানা
না থাকিলেও তোমার আসল কার্যের কিছু-
নাছ ব্যাঘাত হইবে না, আমার কল্পার
রূপের এমি একটা অসুস্থ লাক্ষিত্য আছে যে,
যেখিলেই বোধ হয়, যেন তাহার বয়স বোড়-
শবর্ষের উর্দ্ধগত হয় নাই। এইত বৎস!
তোমার তিনটি পত্নের উত্তর শ্রবণ করিলে
একণে আর কোন বিষয় জানিবার প্রয়োজন
থাকিলে বলিতে পারে।

অ। না ঔরুদেব! আর আমার কিছুই
জান্ভব্য নাই, একণে আশীর্বাদ করুন যেন
বাসনা পূর্ণ হয়।

ত্ৰাশ্রম কারমনোবাক্যে আশীর্বাদ করি-
লেন। অরবিন্দ আচাৰ্য্য চরণে প্রণত হইয়া
বিদায় গ্রহণ করিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

কান্দিষাম। এখন বিভাবরীর অবসান
হয় নাই। স্বর্গীর নীপমালা স্বরূপ তারকা-
রাশি এখন সমুজ্জ্বল রশ্মিতে আলোকরাশি
বর্ণন করিতেছে। অবিদ্যুত ক্ষেত্রের অসংখ্য

নর নারী এখন জ্বলন্তেরীর সেবার
নিমগ্ন। বিরাট নৈশ অন্ধকার অবিচ্ছিন্ন কান্দি-
ক্ষেত্রের বিরাট কলেবর এখন আবৃত করিয়া
রাখিয়াছে। সমস্ত নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। বাধ
হেইতেছে যেন, বারানসীগরী বিবেকবজ্রের
বিচিত্র লীলা অধ্যয়ন করিতে করিতে
ঘোর সমীপিতে চিত্ত সমাধান করিয়াছে।
দশদশমেঘ ঘাটের অনতিদূর স্বর্গীয়খীতীর
সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র কুটির হইতে একটি মূল-
লিত সংগীত ধ্বনি নিঃসারিত হইয়া, নৈশ-
বায়ুর সুদূর প্রবাহ-বাহনে আরোহণ পূর্বক
গঙ্গাগর্ভ এবং উত্তর তীরস্থ বহুদূর ব্যাপী মূল-
ভাগ প্রভিন্দিত করিতে লাগিল। একজন
সন্ন্যাসী গাহিতেছিলেন,—

“এবার আমি সার ভেবেছি।

এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।

যেদেশে রজনী নাই মা,

সে দেশের এক লোক পেরেছি।

আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,

সন্ধ্যারে বক্যা করেছে ॥

ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমায়ে,

বুগে বুগে ভেঙ্গে আছি।

এবার বার ঘুম তাড়ত দিয়ে,

ঘুমেয়ে ঘুম পাড়িয়েছি ॥

সোহাগা গন্ধক মিশায়,

সোনাতে রং ধরায়েছি।

মণি মন্দির মেজে দিব, •
মনে এই আশা করেছি ॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি,
উভয়কে মাথে ধরেছি ।
এবার শ্রামা নাম ব্রহ্মজেনে,
ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি ॥ •

দেখিতেই রজনীর অবসান হইল। উগা
জ্বলন্তী বালাকর্ণের স্বর্ণ-কিরণ-মণ্ডিত-কিরীট
শিরোদেশে পরিধান করিয়া পূর্ব গগনে
দেখা দিলেন। বিহঙ্গমগণ কলরবহলে
নিম্জিত নরনারীকুলকে প্রভাতবার্তার প্রবুধ
করিবার জন্ত আগনাপন কুলার পরিত্যাগ
করিয়া দিগদিগন্ত প্রস্থান করিতে লাগিল।
সমস্ত রজনী জাহ্নবীবেকে কোনরূপ তরঙ্গো-
চ্ছ্বাস ছিল না, এক্ষণে প্রভাত বায়ুর মৃদু মৃদু
হিল্লোলে ক্ষুদ্র উর্ধ্ব উৎপত্তি হইয়া ঈষদ-
শুটধ্বনি সহকারে তটভূমি স্পর্শ করিতে
লাগিল, বোধ হইল, যেন দেবী সুরধুনীও
বাসিনীবেগে স্বামী সহবাসে সুখ নিম্জায়
নিমগ্না ছিলেন,—এক্ষণে প্রভাত হইয়াছে
বুঝিতে পারিয়া; সুখ-শয্যা পরিত্যাগান্তে
তরঙ্গলীলাচ্ছলে বারংবার মত্তক-দেশ অব-
লুষ্ঠন এবং হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি প্রকীর্ণন
পূর্বক আগপতি বিশ্ববরের বিবীরাধা
পদারবিধে প্রণাম করিতেছেন। অণকালের
মধ্যে উষাস্বন্দরীও অভিমদনা প্রাপ্ত হইলেন।
সকল ভূবন প্রকাশক নিধিল-বঙ্গল দিল

দেব অংগমালী বিপুল আলোকমালায় মণ্ডিত
কলেবর হইয়া, ক্রমেই উদয়াচলে প্রকাশমান
হইতে লাগিলেন। প্রাতঃ স্নানার্থীমাগরিক-
গণ, প্রথমতঃ একটি করিয়া আসিতেই,
অবশেষে বিপুল সংখ্যার আসিয়া দশাধমে
বাট পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। যোগী, ভোগী,
দত্তী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর নানা
লোকের কণ্ঠ সমবাহে এক অভিমব ধ্বনির
স্রুতি হইয়া গঙ্গাগুপ্ত শকারমাণ করিয়া তুলিল।
তখন সেই সন্ন্যাসীটি গাহিতেছিলেন,—

“ভূ দে মন কালী বলে ।

হৃদি-রত্নাকরের অগাধজলে ॥

রত্নাকর নয় শূন্য কখন,

হুচার ভূবে ধন না মেলে ।

তুমি দম সামর্থ্যে এক ভূবে বাও,

কুলকুণ্ডলিনীর মূলে ॥

জ্ঞান সমুদ্রের মাঝেই মন,

শক্তিরূপা মুক্তা কলে ।

তুমি তক্তিকর কুড়ারে পাবে,

শিবযুক্তি মতন নিলে ॥

কামাদিহর কুণ্ডীর আছে,

আচার লোভে সদাই চলে ।

তুমি বিবেক হৃদয় গারে যেখে বাও,

ছোবেনা তার গন্ধ পেলে ॥

রতন মাণিকা কত ; পড়ে আছে সেই জলে ।

রানপ্রসাদ বলে ঝাঁপদাওমন,

বিগবে রতন, ধলে কণে ॥

বেলা ক্রমশঃ অধিক হইয়া উঠিল, দশাঘ-
 রেখ ঘাটের বিপুল জন কোলাহলও ক্রমশঃ
 সন্ধীভূত হইয়া আসিল, সকলেই স্নানক্রিয়া
 সমাপনান্তে আপন আপন গন্তব্যস্থানে প্রস্থান
 করিতে লাগিল। কেবল একটি দরিদ্র বালক
 ঘাটের একধারে নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া
 রহিল। আহা! এতলোক আসিল গেল,
 এই হতভাগ্য দরিদ্র বালকটির প্রতি কেহই
 একবার চাহিয়া দেখিল না। হায়! এ
 সংসারে কয়জন লোক হুঃখীর হুঃখে দয়াজ-
 চিত হইবে? কয়জন লোক দরিদ্রের কাতর
 প্রার্থনার কর্ণপাত করে? কয়জন লোক
 শোকাভুরের শোকাগ্নিতে সান্দ্রনা বারি বর্ষণ
 করে? যে ব্যক্তি চিরসুখী, চিরদিন সুখের
 কোলে লালিত পালিত, হুঃখের দাবদাহন,
 কিরণ অসহনীয়, কেমন করিয়া সে তাহা
 অনুভব করিবে? সর্পদষ্ট ভিন্ন সর্প দংশনের
 আলা অন্তের বুঝিবার উপায় নাই।

দরিদ্র বালকটির কটদেশে একখণ্ড অতি
 মলিন চির,—তাহাও আবার স্থানে২ ছিন্ন
 হইয়া গিয়াছে; অঙ্গদেশে বিলম্বী ভ্রমর-কৃষ্ণ
 টাচর চিকুরদাম, অবশ্যে এটার আধানে পরি-
 ণত ভেলভাবে সন্ধ্যাে খড়ি উকিতেছে;
 ককাল মালা যেন গাত্রচর্চ ভেদ করিয়া,
 উহার অনাহার অনিত শোণীর অবস্থা
 অভিযুক্ত করিতেছে। আহা! দীনতার
 দাকন নিশীড়নে উহার সুযোজন পৌরকাতি,

যেন ভাস্কর্য্যাদিত বহির স্তার নিশ্চত হইয়া
 মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে। অস্ত্রের স্থানে২
 আঘাতের চিহ্ন, তাহা হইতে অল্পে২ কথির
 ক্ষরণ হইসেছে। খাট জনশূন্য হইলে, বালক
 রোদন করিতে লাগিল,—মস্তুর প্রবল
 প্রবাহ, গুণ্ড ও বন্ধঃস্থল অভিযুক্ত করিয়া
 ধরণীপৃষ্ঠে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রিয়ৎ-
 ক্ষণ এইরূপে ক্রন্দন করার পর, সে হতাশ
 নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মূহুশ্বরে
 বলিতে লাগিল,—“হা অদুঃ! এখানেও
 দর্শন-পেঙ্কম না? অনাহারের আশৌবিষ
 দংশন, অনিদ্রাব উৎকট অবসাদ উপেক্ষা
 করে কত দেশেই না ঘুরিলাম, কতগ্রামে,
 কতনগরে, কত রাজ্যেই না পথটান করিলাম,
 কোথাও অশেষণ পেলাম না। শেষে বড়
 আশা করেছিলাম, দেবাদিদেব মহাদেবের
 পবিত্রক্ষেত্র বারাণসীধামে নিশ্চয়ই তাঁর দর্শন
 পাবো;—কিন্তু হায়! আর সে আশা
 কোথায়? কয়দিন হলো, এখানে এসেছি,—
 দ্বিবারাত্র অমুসন্ধানের বিরাম নাই,—পাঁতি২
 করে প্রত্যেক স্থান খুঁজেছি, বাঁকে সমুখে
 পেয়েছি তাঁকেই গুরু কস্তার কথা নিজাসা
 করেছি,—কোথাও দর্শন পাই নাই,—কেহই
 তাঁর সংবাদ বলতে পারে নাই। আমার
 কথা শুনে সকলেই আমাকে পাগল বলে
 কত উপহাস করে, কাল কতকগুলি বাগ-
 কের হাতে কি লাগানাই না হয়েছে,—অমি

যাই তাঁদের গুরুকৃত্য ক'বা জিজ্ঞাসা
করেছি আমি তারা "হো হো" শব্দে হাত
ক'রে, পাগল! পাগল! ব'লে চিৎকার
ক'রে উঠল। উঃ কি কষ্টই না দিয়েছে—
সে অবস্থা মনে হ'লে, এখন যেন স্থংকশ
হয়,—দাক্ষিণ প্রহারে সর্বসরীর অর্জুরিত—
কষ্ট বিকৃত, এখনো শোণিতব্রাব হচ্ছে।
আহা! আমিও তাঁদের কোন ক্ষতি করি
নাই—একটিও ক'রক'র ক'বা বলি না, কাঙা-
লের ভায় কেবল গুরুকৃত্য ক'বাই জিজ্ঞাসা
ক'রেছিলাম,—হরি! হরি! তাতেই কি
তাঁদের অপমান বোধ হ'ল? তা'তেই কি
তাঁরা, আমাকে পাগল ঠাহর করে, শেষে
প্রহার পর্য্যন্ত করলে? হা জগদীশ্বর! যদি
এত কষ্ট ভোগের পরও গুরুর দেখা পে'তাম
তা'হলে কিছুমাত্র আক্ষেপ ক'রতাম না।
হা গুরুকৃত্য! তোমার মনে কি এই ছিল
মা? মাগো! কি দোষে এদাসকে দর্শনদানে
বঞ্চিত ক'র'ছ? হা বিশ্বেশ্বর! হা কৃপা-
নিধান! হা বাহ্য! কলতরু! তুমি'ছ নাথ,
যে বা মনে ক'রে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে,
তুমি তার সেই বাহ্যই পূর্ণ কর; দয়াময়!
আমার বাহ্য কি পূর্ণ হবে না? আশুতোষ!
কৃপা নিধো! কৃপা ক'রে আমার গুরুকৃত্য
দর্শনের উপায় ব'লে দাও? হা গুরুদেব!
হা জননীভা আচাৰ্য্য! বৃন্দাবন প্রভো!
এ পাশাপাশি হ'তে আপনার অতীত সিদ্ধি

হবে না,—এ অকর্ম্মভ নরায়ন হ'তে আপনার
কৃত্য উদ্ধারের আশা নাই। ওমো!
আপনার কাছে ব'লে এসেছি,—"যদি কখন
আপনার কৃত্যর সাফাং পাই—তবেই
আবার কিরিব, নচেৎ এইই শেষ বিদায়,"—
জগদাশ্বর জানেন ক্রটি করি নাই,—কপাল-
দোষে সকলই বিফল হ'ল। এখন আর কি
ব'লে আপনার কাছে কিম্বো? কি ব'লে
আবার আপনার কাছে এ মুখ দেখাব? তাই
আজ আপনার কাছে শেষ বিদায়ের প্রার্থনা
ক'র'ছি।" বালক সহসা উত্তিত হইল এবং হুঁ-
ধুনির সম্মুখবর্তী হইয়া আবার বলিতে লাগিল,
"মা পতিভোগ্যিনি জিতাপভারিনি জিগম্ষণে!
তুমি'ছ মা, কেবল তুমিই নাকি পাণ্ডী, ভাসী,
পূণাবান সকলকেই সমান মেহে—সমান
বস্ত্রে আপন অঙ্গে স্থান দাও, তাই মা আজি
এই অন্তিম কালে তোমারই আশ্রয় গ্রহণে
অভিনাবী হ'য়েছি। মা! আমি বড় পাণ্ডী,
এই দেখ মা, পাগলানের প্রেতও নিকার,
পলকে ২ স্বপ্নের প্রেত্যক ত্বর তদীয়কৃত
হ'রে গাচ্ছে? মাগো! আমার জুটাইবার
স্থান আর কোথাও নাই তাই আজ শেষে
তোমারই কাছে জুড়াতে এসেছি, তোমার
পুত শীতল কোলে স্থান দিবে সকল বস্ত্রপরি
অবসান করা।" এই সকল ক'বা বলিয়া,
বালক যেমন সজাগভাবে র'ল প্রদানে উন্নত
হইবে, অরি পল্লভ দিক দেহে একটি অপ-

সিদ্ধি লোক আসিয়া, সহসা তাহাকে ধরিয়া
কেনিলেন ।

পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে না
যে, ঐ বালকটি—অরবিন্দ । দুই বৎসরের
পর আজ উহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ
হইল । আচাৰ্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণের
পর নানা জন পদে গুরুকন্ডার অন্তঃস্থান
করিয়া অবশেষে কানীধামে আসিয়াছে ।
এখানে আসিয়া তাহাকে কিরূপ দুর্গতিভোগ
করিতে হইয়াছে, সে সকল কথা উহার নিজ
মুখে শুনিয়াছেন ।

অরবিন্দ জাহ্নবী জলে জীবন সমর্পন-
কালে যে লোকটি দ্বারা মৃত হইল, উনি সেই
সন্ন্যাসী,—যিনি রজনীযোগে এবং প্রভাত
কালে, অপূর্ণ স্নানহরী বিভার করিয়া,
লালক প্রবর রামপ্রসাদের মনোহর সঙ্গীতে
অমৃত সিকন করিয়াছিলেন । দশাষ্মেধ
ঘটি নির্জন হইলে, উনি কুটির হইতে বহি-
র্গত হইয়া, মুহূর্তকালে গঙ্গার তীরে ২
ব্রজ করিতেছিলেন । ঐরূপ অবস্থার উক্ত
ঘাটের নিত্য সন্নিহিত হইলে, অরবিন্দের
কখন কখন এবং কাতর উক্তি উহার কণ-
কূহরে প্রবিষ্ট হয় । তৎপরে তাহার বিমল
মুখকান্তি দর্শনে এবং অদ্বুত বিলাপ উহার
অবশে অন্তঃকরণে মূগপৎ কোতুল ও কক-
ণার উত্তেক হইলে ত্রমণে বিরত হইয়া উহার
অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎদিকে দণ্ডায়মান হইলেন ।

উক্ত অবস্থার বালকের আপাদ মৃতক নিরী-
ক্ষণ করিয়া উহার বিশ্বয়ের অবধি রহিল না
সন্ন্যাসী স্বকীয় অলৌকিক সাধন প্রভাবে
বুদ্ধিতে পারিলেন যে, ঐ বালক, বড় সামান্ত
বালক নহে । যে সকল লক্ষণ থাকিলে,
মাহুৎ ভগবদ্ সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়, যে
সকল চিহ্ন থাকিলে, মাহুৎ ভব বন্ধন ছিন্ন
করিয়া, মোক্ষমার্গে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এই
অদ্বুত বালকটিতে সেই সকল লক্ষণ, সেই
সকল চিহ্ন, প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহি-
য়াছে । এই সকল আশ্চর্য্য দৈব লক্ষণ
দর্শন করিয়া, উহার মনে বালকটির সবিশেষ
পরিচয় জানিবার লালসা বলবতী হইয়া
উঠিল এবং তজ্জন্ত উহার বিলাপের নিবৃত্তি
কাল পর্য্যন্ত স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করিয়া
রহিলেন । তৎপরে ঘটনা আপনার অবদিত
নাই ।

ঐষিকপদ চট্টোপাধ্যায় ।

কথাদাস্য ।

১

অগতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মাহুৎকে
সময়ে সময়ে নানাপ্রকার দ্বারে ঠেকিতে হয় ।
দ্বারের হস্তে পতিত হইয়া ক্ষণে বিফল
হইতে হয় নাই, এমন লোক অগতে অতি
বিরল । সামান্ত নীন দরিদ্র হইতে রাজাধি-

রাজ পর্বাক সকলকেই একবার না একবার
হর পিতৃদার না হর মাতৃদার অথবা কতাদারে
ঠেকিয়া অশেষ যত্নগাভোগ করিতে হইয়াছে ।
পিতৃ, মাতৃ ও কতাদার এই ত্রিবিধ দায়ের
মধ্যে শেষোক্ত দায়ই বর্তমান কালেই সর্বা-
পেক্ষা ভয়ানক । অর্থ থাকিলে সকল দায়
হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই ধনের
সংসারে ধনের দ্বারা সংশোধিত হয় না, এমন
কার্য্য নাই । কিন্তু কতাদারে তুমি বতই কেন
অর্থ ব্যয় করনা, লাহনাতোগ অনিবার্য্য ইহা
সহ্য করিতেই হইবে । বাহার অর্থনাই—পিতা
মাতার মৃত্যুর পর কেবল রোদন মাত্র সার
করিয়া, অকৃতিপূজ সে দায় হইতে অনায়াসে
উদ্ধার হইতে পারে সনাতন আৰ্য্য শাস্ত্রে
আমাদের এরূপ ব্যবস্থাও আছে । কিন্তু
কতাদার উপস্থিত হইলে, অধুনা যেসকল সময়
পড়িয়াছে তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন
ব্যাপার, এক্ষণে সামান্য পায়ে কতাদান
করিতে হইলেও পিতা মাতাকে প্রমাদ
গণিতে হয় । শিকিত, অবস্থাপন্ন পায়ে ত
কথাই নাই, দরিদ্রের এমন সাধ্য নাই যে
তাহার নিকট অগ্রসর হয়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ
বাহারা বহুকষ্টে সংসার প্রতিপালন করেন,
সামান্য আয়ে বাহাদিগকে সংসার পরিচালন
করিতে হয়, তাহাদিগকে একমাত্র কতাদারে
ঠেকিতে হইলেই চারিদিক অন্ধকার ! এরূপ
কত শত দুঃখ যে আমরা প্রতিদৈনিক চক্ষের

সম্মুখে দর্শন করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই ।
হায় ! বঙ্গসমাজ আজ অর্থের জন্য কি নিষ্ঠুর
আচরণ করিতেই অভ্যস্ত হইয়াছে ।

বর্ধমানের অন্তর্গত কাকিনপুর গ্রামে
ভজহরি বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত দ্বারা
সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন, সম্প্রতি তিনি
মুনানারী একমাত্র কতাদার দ্বারা লোকান্ত-
রিত হইয়াছেন । তাহার বিধবা পত্নী সাক্ষাৎ
চাষ বাসের আয়ে কতাদিকে লইয়া বহুকষ্টে
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন । ক্রমে মুনী
বড় হইতে লাগিল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার
রূপের জ্যোতি পূর্ণ মাত্রার হ্রাস পাইতে
লাগিল ।

কাকিনপুর গ্রামে অনেক বড় বড় লোকের
বাস । ভজহরির বাড়ীর নিকট বীরেশ্বর
মুখোপাধ্যায়ের বাস, তিনি কলিকাতায়
দালার কার্য্য করিয়া বেশ সম্পত্তি সম্পন্ন
হইয়াছিলেন । এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত তিনি
কলিকাতা ছাড়িয়া নিজগ্রামে আসিয়া বাস
করিতেছেন । পল্লীগ্রামে ছুই তিনশত টাকার
মাসিক আয় হইলে তাহার প্রত্যয়, তাহার
প্রতিপত্তি সহজেই বিবেচ্য । বীরেশ্বরকে
পাড়ার সকলেই মাতৃ করিত, গ্রামে কোন
কার্য্য কর্তব্য হইলে, কোনও মালি শোকদহী
হইলে বীরেশ্বরকে সকলেই সম্বোধন করিত ;
বীরেশ্বর নিজের বৃত্তি অনুসারে তাহার

বিফাল্য করিয়া দিতেন; সে মাঝামাঝি
আর কোন প্রতিবাদ চলিত না, বীরেশ্বর
বাবু বাহা করিবেন তাহাতে তিরস্কৃত করে
কর সাধ্য। তখনই পাণ্ডুর বার কলি-
কাতার অবস্থান কালীন বীরেশ্বর বাবুর
চরিত্র সম্বন্ধে অনেক, অনেক কথা কহি-
তেন, তিনি প্রায়ই কাকনপুরে আসিতেন
না, বাটীতে নাত্য; পুত্র পত্নী এবং বিধবা
কহিল অল্প কিছু কিছু পরচ পাঠাইতেনমাত্র।
বাটীতে না আসাতেই গকলে তাহার চরিত্র-
জ্ঞের প্রতি সন্দেহ করিত কিন্তু এক্ষণে তিনি
দেশে আসিয়াছেন তাহার অর্থ ভয়ঙ্কর,
এখন তাহার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ
করে কার সাধ্য,—অর্থ থাকিলে যে সমস্ত
জগৎ চাকিয়া বার, অথবা ঘোষ থাকিলেও
কেহ তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারে না।
অর্থের এতই ঐশ্বর্য! এখন বৃদ্ধ বয়সে তিনি
ভগ্নবীৰ্য্যেণ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার
অর্থও যথেষ্ট ছিল বলিয়া পূর্বদোষ কেহ
ধরিত না। বীরেশ্বর বাবুর পত্নী জাহ্নবীদেবীর
সহিত বমুন্যর মাতা বিন্দুবাসিনীর বড়ই সন্ধ্যা
ছিল। এই ভক্ত বীরেশ্বর বাবুর পুত্র ললিত
মোহনের সহিত বমুন্যর বড় ভাব হইয়াছিল,
তাহার মদ্য সর্বস্বাই একত্রে খেলা করিত,
আহার করিত, বেড়াইত। বমুন্য, শৈশবে
শিকড়ীয়া বলিয়া জাহ্নবীদেবী তাহাকে বড়ই
বড় করিতেন। ; কালক-বাণিক আদর

পাইলে পার কাছাকাছ হইতে চাহে না।
এই ভক্ত বমুন্য সদাসর্বস্বাই সুখোপাধায়
মহাশয়ের বাটীতে থাকিত। বিশেষতঃ ললিত
মোহন বমুন্যকে বড়ই ভাল বসিত তাহাকে
একদণ্ড না দেখিলে দিশা হারা হইত। ললিত
মোহন গ্রাম্য বঙ্গবিদ্যালয়ে পাঠাত্যাস
করিত, স্কুলের ছুটির পর বাটীতে আসিয়া
একত্রে বমুন্যর সহিত খেলা করিত, পরে
সন্ধ্যা হইলে বমুন্য কেবল মাত্র বাটীতে
আহার করিয়া পুনরায় ললিতের কাছে
আসিত; ললিত আহারাদির পর পাঠ-অভ্যাস
করিতে বসিত, বমুন্য তাহার নিকট বসিয়া
এটা ভটা সেটা নাড়িত, শেকিল লইয়া
খাতার আপন মনে কত কি লিখিত, এখন
বমুন্যর বয়স সাতবৎসর, ললিতের বয়স ছাব্বিশ
বৎসর। ললিত বেশ মেধাশক্তি সম্পন্ন ছিল,
ক্রমে সে গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে জুখ্যাতির
সহিত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।
জাহ্নবীও বিরেশ্বরের আনন্দের সীমা রহিল
না। পুত্র শিক্ষিত হইলে কোন শিতামাতার
না আনন্দ হয়? জাহ্নবীদেবী পুত্রের উন্নতির
অন্ত কত পুঙ্খাদি প্রদান করিলেন; করতল
তাহাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল
না। বিন্দুবাসিনীও এ আনন্দ প্রাবাহে বার-
বার নাই আনন্দ অস্তিত্ব করিলেন। আর
আনন্দ হইল বমুন্য, সে যথেষ্ট অত মত
কিছুই ভাল বুঝিতে পারিল না; তথাপি সে

প্রাণের বলিভের স্মৃতিতে ওনিয়া হৃদয়ে
বড়ই আনন্দ লাভ করিল ।

৩

প্রায় বিদ্যালয়ের পাঠ সাক্ষ হইল । বীরে-
শ্বর বাবু পুত্রকে কলিকাতায় পড়াইবার
মনস্ক করিলেন কিন্তু জাহ্নবীদেবী ইহাতে
বড়ই নারাজ, পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাতে
তাহার আদৌ ইচ্ছা নাই, তাহার মতে, গণিত
বাহা শিখিয়াছে তাহাই যথেষ্ট তাগকে ত
আজ রোজগার করিয়া থাকিতে হইবে না ।
বিশেষতঃ তিনি একমাত্র নরনের মণি প্রাণের
আনন্দ, হৃদয়াকাশের প্রব তাহা ললিতকে
দুরদেশে পাঠাইয়া কেনন করিয়া থাকিবেন ?
কিন্তু কি করিবেন স্বামীর অমতে ত হিন্দু
রমণী কোনও কার্য করিতে পারেন না,
অরশেষে পুত্রকে কলিকাতায় লেখা পড়া
শেখানই হিঁদু হইল । বীরেশ্বর বাবু গৃহি-
ণীকে অনেক বুঝাইয়া শুভ দিনে পুত্রকে
লইয়া প্রায়বাগারে তাহার কোষ্ঠ প্রাণকের
সিকট রানিয়া লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করিয়া
ছিলেন । ললিতমোহন বাতুলালয়ে অবস্থান
করিয়া অনাবোপের সহিত পাঠাভ্যাস
করিতে লাগিল । *ললিত কলিকাতায় গমন
করিলে পর যমুনার সহিত দেখা সাক্ষাৎ
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল । যমুনা এখন
আর মুখ্যোদয়ের বাটী আর বারনা, বাটীতে
থাকিয়া বটতার কাজ কর্ত্তের সহায়তা করে,

এর সময় পাইলে নির্জনে কলিয়া কেবল
ললিতের চিন্তা করিয়া থাকে ? কবে কবে
হুস হুসে কীট প্রবেশ করিলে তাহার
ঘেরুপ অবস্থা হয় যমুনার সেই দশা হইতে
লাগিল । ললিত যে একেবারে যমুনার
চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহা
বহু, তবে গল্পপ্রাণের বলক আজব সময়
কলিকাতায় আসিয়া, কলিকাতায় নগরী
শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া এক প্রকার চিত্ত
হির করিতে পারিয়া ছিল, মনে করিয়াছিল
কলিকাতায় পাঠ শেষ করিয়া দেশে গিয়া
পুনরায় যমুনাকে দেখিয়া সুখীর্ষ প্রভাবে
কষ্ট বিদ্রুত হইব । কাকনপুরে এই ছুটী
শিত্তর শৈশব সুখ বহনিন হইতে প্রগাঢ়
হইতে ছিল । যে দেখিত, সেই সুখী-বইত,
কেবল হইত না একজন । সে অলক্ষ্য তীত্র
হাসি হাসিত, তাঁহাকে তোমরা বড়ই কেন
ভাল বল না, বড়ই কেন তাঁহার কথামায়ার
কথায় বাধা কর না, আমাঃ কিন্তু তাগকে
দরাময় বলিতে পারিব না ; তিনি নিম্ন
অতীব নির্ভর । বাহুব বাহা মনে করে, তিনি
তাগা ভাবিয়া মেন । এ বিশ্বসংসারে তাহার
যোদ্ধিত্ত প্রতাপ, তিনি যেখেনা খেলিবেন
তাহার প্রতিবোধ করা লিঙ্গগতে তাহার
সাধ্য নাই । আরম্ভ তত্ত পর্বাৎ সে খেলু-
য়াড়ের দ্বারা খেলায় অভ্যস্ত ; আসিয়া ক্ষু-
জীব সেই ধারণাতীত নিখাতার নীলা কি

বুঝক ? আর সেই লীলামরের লীলার প্রণয়ী
বৃন্দ পয়শার বিচ্ছিন্ন হইয়া, অশেষ বস্ত্রা-
ভোগ করিতে লাগিল ।

৪

বীরেশ্বর বাবু পুত্রকে কলিকাতার রাখিয়া
বাটীতে আসিলেন । পুত্র পত প্রাণা মাতা
পুত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । বীরেশ্বর
বাবু বলিলেন—“ললিত বেশ সাধনের সঙ্গে
আহার বিহার করিতেছে, লেখা পড়া করি-
তেছে, তাহার তথায় থাকিবার কোনও অসু-
বিধা হইবে না । বলা বাহুল্য যে সাধন
তাঁহার ভালক পুত্রের নাম, ললিতের সম-
বয়স্ক ।

আহুদীদেবী বলিলেন, দাদাকে বেশ
ভাল করিয়া বলিয়া আসিলে ত ?

বীরেশ্বর বাবু বলিলেন, সে বিষয় আর
তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না, আমি
সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছি” ।

আহারাদি করিতে রাজি অধিক হইল ।
বীরেশ্বর বাবু সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর
শয়ন করিলে, আহুদীদেবী তাঁহার সেবা
ভাষণ করিতে করিতে বিন্দুবাসিনী কথিত
ললিতের বিবাহ সংক্রান্ত কথা উত্থাপন
করিলেন । বীরেশ্বর বাবু বড়ই লোভী অর্থের
প্রাণী তাহার কিছুতেই মিটে না, এত টাকার
অধিষ্ঠিত হইয়াও ভজহরির বিষয় টুকুর ভাণ্ড
তাঁহার বড়ই লোভ ছিল, আর তাহার বিষয়

টুকু সামান্য হইলেও ভজহরির ভ্রাতাসন বাণী
ও তৎসংক্রান্ত বিবৃত্ত জবী বীরেশ্বর বাবুর
বাটীর সংলগ্ন, কোনও রূপে তাহা হস্তগত
করিতে পারিলে তাঁহার নব-নির্মিত অট্টা-
লিকার কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই ভাণ্ড তাহার
বহুদিন হইতে লোভ ছিল, কিন্তু এক্ষণে
পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়, তাহা
হইলে তাহার লেখা পড়া হইবে না । লেখা
পড়া না শিক্ষা প্রথমে তিনি বড়ই কষ্ট
পাইয়াছেন, এক্ষণে না হয়, কোনও বন্ধুর
রূপার এবং তাহার ভাগ্য ক্রমে হুই পরসী
য়োজগার করিতেছেন, কিন্তু ভাগ্য ত চির-
কাল স্রষ্টার থাকে না । আমি বাহা কিছু
করিয়াছি, তাহার ত থাকিবার কোনও
নিশ্চয়তা নাই, অতএব এখন বিবাহ দিয়া
পুত্রের তবিবাহ নষ্ট করা উচিত নহে, এই
ভাবিয়া বলিলেন, দেখ, তুমি যখন মাতাকে
বলিও যে, তাহাতে আর ক্ষতি কি, এখন
উত্তরে ছেলেরা দুই বিবাহের উপযুক্ত হইলে
অবশ্যই বিবাহ দিব, এখন হুই চার বৎসর
বাক, ললিতের আরও একটু লেখা পড়া
হক । বীরেশ্বর ভজহরির পত্নীকে এইরূপে
আশ্বাস দিয়া রাখিলেন ।

৫

বিন্দুবাসিনীর আরও অভিভাবক নাই ।
হুই তিনখানি প্রামাণ্যের তাঁহার শিলালয় ;
তথায় তাহার মাতা ও আত্মবৎ ও কয়েকটি

পুত্র, ভ্রাতার অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে, যে সঙ্গী সর্বদা ভ্রাতার নিকট থাকিয়া তাঁহার কষ্ট করেন। আর বিন্দুবাসিনী জানিতেন যখন যুগোপাধার মহাশয় আশ্বাস দিয়াছেন, তখন কি, তাহার কথা মিথ্যা হইতে পারে! এই জন্ত তিনি কন্যার বিবাহের জন্য বিশেষ কিছু চেষ্টা করেন নাই। আর লগিতের সহিত বিবাহ দিবার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা; কোন পিতা মাতা কন্যার বিবাহ সর্ব-বিষয়ে সঙ্গুণশালী পাত্রে দিতে না ইচ্ছা করেন; অবস্থা ভাল হইলে এ বিষয়ে অর্থের মার্য্য কেহই করেন না। বিন্দুবাসিনী সর্বদা দিয়াও লগিতের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। কারণ লগিত ও বসুনা দুইটীতে যেন মণিক ঘোড়, এ দুইটী এক স্ত্রে প্রযুক্ত হইলে, বেশ সুখী হইবে, বিশেষতঃ ইহার উভয়েই উভয়ের অঙ্গরূপ, বিধাতা যেন একত্রে রাখিবার জন্যই প্রথম হইতে ইহাদিগকে একত্র মিলিত করিয়াছেন। বিন্দুবাসিনী কস্তার বিষয় চিন্তা করিয়া আর কোনও পাত্রের অঙ্গসন্ধান করিলেন না। মৃত ভ্রাতারি বাবু বীরেশ্বর বাবু অপেক্ষা জাতাংশে অনেক প্রেট হইলেও বিন্দুবাসিনী কস্তার সুখের জন্ত সে বিষয় লক্ষ্য করিলেন না। তাহািলেন আবার ত আর কেহই নাই যে একাধার জন্ত তাহার বিবাহ কষ্ট পাইতে হইবে। বসুনাই আমার সব,

বাহাতে সে সুখিনী হয় তাহা চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। বিন্দুবাসিনী লগিতের সহিতই বসুনার বিবাহ স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলেন, ইহাতে বীরেশ্বর বাবুও তাহার পক্ষীয় ও মত ছিল। এই জন্ত তিনি আপন অগ্রজকে কন্যার বিবাহ-সংক্রান্ত পাত্র স্থির করিবার জন্য কোনও কথা বলেন নাই; বিন্দুবাসিনীর ভ্রাতাও জানিতেন বীরেশ্বর বাবুর পুত্রের সহিত তাগিনেশ্বরীর বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক শটরা গিয়াছে পাত্রের সকলেও জানিত লগিত বসুনার বর, বসুনা লগিতের কনে কিন্তু হইলে কি হয়, বালা-প্রণয়ে যে বিধাতার চির অভিশাপ আছে। অর্থলোভী শিশাচের কথায় বিশ্বাস করিয়া কে কবে সকলকাল হইরাছে ?

৬

লগিতমোহন কলিকাতার থাকিয়া মাতুলের ঘরে বেশ লেখা পড়া নিষিতে লাগিলেন। লগিত কিয়দিনের মধ্যেই প্রবেশিকা পরীক্ষার সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এক, এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তখন ক্রমশঃ দুই এক স্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিছু ঘোটা টাকা পাইবার আশাও হইতে লাগিল। বিন্দুবাসিনী এখন আত্মবীকে দিয়া পূর্বের কথা উপাধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এখন আর পূর্বের মত কথা শুনিতে পাইলেন না। বিন্দুবাসিনী আর আর কথায় তাদৃশ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া

একদিন জাহ্নবাকে হাতে ধরিয়া সমস্ত কথা বুঝিয়া বলিতে বলিলেন। জাহ্নবী দেবী কি করেন স্বামীর মনোগত ইচ্ছা সমস্ত ব্যক্ত করিলেন; ওনিয়া বিন্দুবাসিনীর মাথার বজ্রাঘাত হইল। যমুনাকে আর বেশী দিন 'অবিবাহিতা' রাখা যায় না—ঊহার তাৎক্ষণিক অভিভাবক কেহ নাই যে সমস্ত কোন কাজ হিঁর করিয়া দেন। আর যমুনা ললিতের সম্ভাব দেখিয়া আর ঊহারও অন্তঃপাত্রে সম-র্পণ করিতে প্রাণে যেন কিঙ্গপ আঘাত লাগিল। সরলপ্রাণা বিন্দুবাসিনী কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আজ মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি জানিতেন ভক্তলোকের কথা ও কাজ একই কিন্তু আজ ঊহার অদৃষ্টে বিপরীত তার ধারণা করিল। বিন্দুবাসিনী বলিলেন সিঁদি! আর কেন আমাকে চিন্তা-নলে বদ্ধ কর, তোমরা দয়া করিয়া আমার কজাটিকে গ্রহণ করিলে আমার মহা উপকার করা হয়; আমাকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিলে ভগবান তোমাদের প্রতি সদয় হইবে। এই বলিয়া হাতে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জাহ্নবী দেবীর হৃদয় তাহাতে আর্দ্র হইরাছিল কিন্তু অর্থ শিশাচ স্বামীর নিকট ত কোন্ অগ্ররোধ দ্রব হইবে না। এই জন্য তিনি বলিলেন—সিঁদি! আমি কি করিব বল আমি অনেক বুঝাই-রাছি কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না। বিন্দু

বাসিনী ও জানিতেন জাহ্নবী দেবী ঊহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া স্বামীর খতভেদ করিতে পারেন নাই। শেষে বিন্দুবাসিনী কি করিবেন একমাত্র কন্যার স্তূপের জন্য আপনার সমস্ত বিধর জামাতার নামে নিষিদ্ধা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তবে ঊহার বিষয়ের আর হইত? ঊহার জীবদ্দশা অবধি মাসিক দশ টাকা করিয়া দিব। একটা হিরসিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। লেখা পড়া ঠিক হইয়া গেল। ভক্তহরি জীবিত থাকিলে বোধ হয় ঊহার কন্যার সহিত বীরেশ্বরের পুত্রের বিবাহ অসম্ভব হইত, উন্নত কুলনীর ভক্তহরি বোধ হয় এ পাত্রের কন্যা সম্ভ্রদান করিতেন না। কিন্তু অর্থহীন বিন্দুবাসিনী কন্যার ভবিষ্যৎ প্রতি দেখিতে গিয়া নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিলেন। তিনি যে নিজের জাত্যভিমান ভুলিয়া, নিজস্বার্থ বিসর্জন দিয়া এ কাণ্ডা করিলেন কেহ তাহা দেখিল না, সমাজ তাহার কোনও প্রতিবাদ করিল নয়শিশাচ বীরেশ্বরের হৃদয় সামান্য একজন স্ত্রীলোকের একদম তাগ স্বীকার দেখিয়া একটু বিচলিত হইল না। হায়! অর্থভূমি বাহুবলকে এইরূপই মহাব্যবহীর করিয়া কেহ।

৭

পাঠক হৃদয় মনে করিতে পারেন এ বিবাহে যমুনার মা বিন্দুবাসিনীর এত জেদ কেন। তাহার একান্ত ইচ্ছা আমার একটি দায়

কণ্ঠা বাহাতে চিরজ্বিনী হয়, যমুনা মাতা
তাহার গুণবতী কণ্ঠা যেন সংপাতে পড়ে।
এই জন্ত তাহার এত জেদ। শেষে বির-
শ্বরবাবু কিছুতেই স্বীকৃত হন না দেখিয়া
বিন্দুবাসিনী দশ টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত
করিয়া জামাতাকে সমস্ত বিষয় স্থানপত্র
লিখিয়া দিলেন। বিরেশ্বরবাবু স্বীর দ্বারা যে
কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা সিক্ত হইল
দেখিয়া বিবাহ কার্যে স্বীকৃত হইলেন।
পূর্বেই বলা হইয়াছে তজ্জহির ভদ্রাসন
টুকু হস্তগত করাই বিরেশ্বর বাবুর উদ্দেশ্য।
যাহার মত অর্থ তাহার অর্থাকাজ। যে তত
বলবতী বিরেশ্বরের কার্য্য কলাপে তাহা
বিশেষ প্রীতি জন্মিবে। একজন অনাথা
স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিয়া পুত্রের বিবাহ
দিতে বিরেশ্বরবাবু কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন
না। সমাজও এ বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ
করিল না। সকলেই একবাক্যে বলিতে
লাগিল অমন একটা বড় ঘরের শিক্ষিত পুত্রের
সহিত বিবাহ দিতে হইলে ইহার কমে কিছু-
তেই হয় না। বিরেশ্বরবাবু যেরূপ তাগ
স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে মহৎ
লোক না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না।
অন্তরে তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিলে নিশ্চয়ই
ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইত।

যমুনার রূপ ও গুণও সেইরূপ, রূপ ও
গুণের একত্র সমাবেশে যমুনা দরিত্রের আঁখরে

গৃহে উজ্জলতম রত্ন বিশেষ, কিন্তু আশাদের
সমাজে এ রত্নের আদর নাই; তাই ধনের
বিনিময়ে এই রত্নের আদর হইল। গোড়া
সমাজের চক্ষু নাই, তাহাদের বিচার বিবেচনা
নাই, তাই রত্নগড়া বিন্দুবাসিনীর রত্নস্বরূপা
কণ্ঠার বিবাহে তাঁহাকে ভবিষ্যৎ সুখে জলা-
জলি দিতে হইল।

শুভদিনে লগিতের সহিত যমুনার শুভ
পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। লগিত
ও যমুনার বহুদিনের একত্র সন্নিধান আজ
অক্ষুণ্ণ হইল। অদৃষ্টদেবতা বিপরীত পরি-
চালিত না করিয়া তাহাদিগকে অভীষ্ট পথে
লইয়া গেলেন। কিন্তু তাহারা জানিতে পারি-
লেন না এ বিবাহ কি প্রকারে হইল। যমুনা
জানিল যে, তাহার মাতা তাহার বিবাহে
উদরামের সম্বল টুকু হারায়েলেন। লগিত
জানিতে পারিলেন না সুখে তাহার পিতা
কিরূপে একজন অনাথা স্ত্রীলোকের সর্বনাশ
করিয়া তাঁহার বিবাহ দিলেন। কারণ
তাহারা এখন বালক এরূপ গুরুতর বিষয়ে
তাহাদের আবশ্যক কি? পিতামাতার কর্তব্য
কাজ পিতামাতা করেন। ভাগ্যদেবতা তাহা-
দিগকে সুখী করিলেন এই সুখেই তাহারা
সুখী। যমুনার মাতা বিন্দুবাসিনীও জানিতে
পারিলেন তাহার একমাত্র কণ্ঠাত ভাত
কাপড়ের কষ্ট পাইবে না, আর খামোছাখেও

তিরস্কারী হইবে। আমি আর কতকাল বাঁচিব, ঐ দশ টাকা মাসিক পাইলেই মুখেট হইবে। বিন্দুবাসিনী একরূপ হির সিদ্ধান্ত মনে করিয়া অখস্রোতে ভাসিতে লাগিল।

উপসংহার ।

যমুনা ও ললিতের বিবাহ ঠিক বয়সে হইল। ললিত কলিকাতায় পড়িতে লাগিল, আর সোহাগ প্রতিপালিতা, লাবণ্যলতা যমুনা দ্বাতার ও শ্রদ্ধার প্রতিপালনে সংবদ্ধিত হইতে লাগিলে সকলে বলিল এ বিবাহ রাজঘোটক হইয়াছে, ললিত শাস্ত্রশিষ্ট ছেলে শিতার অবাধ্য নয়। হিন্দুর নিয়মামুসারে সে শিতা মাতার মতের উপর মত প্রকাশ করিতে পারেনা আর করিলেও তাহা গ্রাহ্য করিবে কে? ললিত ত এখন উপবৃত্ত হয় নাই যে শিতার বিষয়ে কি প্রতিবাদ করিবে? বৎসরাবধি বিয়েধর বাবু কথামত বেহানকে মাসিক দশ টাকা করিয়া প্রদান করিলেন। এক বৎসর পরে দ্বিরাগমনের দিনহির করিয়া বিয়েধর বাবু যমুনাভিকে গৃহে আনিলেন। এখন হইতে বিন্দুবাসিনীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একরূপ শেষ হইল। তিনি বুঝিলেন আর ত বিন্দুবাসিনীর কিছু নাই যে গ্রহণ করিবে। এখন বেশী বনিষ্ঠতা করিলে বয়ঃ সময়ে সময়ে কিছু কিছু দিতে হইবে। বিন্দুবাসিনীর সর্বত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত মাসিক ১০ টাকা দেওয়া বিয়ে-

ধরের তত্ত্ব বোধ হইল। হার বিন্দুবাসিনী; তুমি নিজ দোষে কি করিতে কি করিয়া কেলিলে অর্থপিশাচ বিয়েধরকে ভাল জানিয়া নিজের অন্নসংস্থান পরের হাতে তুলিয়া দিলে?

বিন্দুবাসিনী কতাকে স্বত্ত্বরাগরে পাঠাইয়া তিনি আপনার দ্রাতার নিকট আনন্দপুরে চলিয়া গেল। এবং বৈবাহিককে বলিয়া গেলেন তাহার মাসিক ১০ টাকা বেন আনন্দপুরে পাঠান হয়। বিয়েধর তাহাতেই সীকৃত হইলেন। বিন্দুবাসিনীর দ্রাতার তাদৃশ জ্ঞান ছিল না; তিনি একপ্রকার অনশনে অর্জাশনে জী পুত্র লইয়া কাটাইতেন বৃদ্ধবয়সে তাহার অল্প কোনও উপায় নাই। তাহার উপর ভদ্রীর ভার পড়িল। বিন্দুবাসিনী তথায় থাকিয়া বৈবাহিককে টাকার জন্ত পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন, কিন্তু আর সে পত্রের কোনরূপ উত্তর বা টাকা পাইলেন না এদিকে তাহার বৃদ্ধদ্রাতা কিছু দিন পরে পরলোক গমন করিলেন। অভাগিনী বিন্দুবাসিনী দ্রাতাভায়া ও তদীয় পুত্রগণ সহ ঘোরতর দুঃখার্ণবে নিমজ্জিত হইলেন। আজ হইতে তাহাদের প্রকৃত অনশন আরম্ভ হইল। পাঠক বিন্দুবাসিনীর এ অনশন কিসের জন্ত, কেবল কতাদার কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? তিনি না হর কতাদার হিতের জন্ত বিয়েধর বাবুর পুত্রকেই ভ্রাতারূপে গ্রহণ

করিয়াছিলেন। কিন্তু হার বিরোধবান্ধু অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়া, অর্থের জন্ত অনাথা স্রীলোককে অনশনে দিনপাত করাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। কেবল পাপস্বার্থসিদ্ধিই তাহার এত প্রিয় ইহন? এ সকল সমাজও এ সকল অত্যাচার দেখিয়া দেখিল না বরং ঘনলোভে বিরোধের পুণ্ড্র-পোষকতা করিল। যতদিন না সমাজ হইতে পুণ্ড্রপনরূপ এই ঘৃণিত বৃত্তি লোপ পাইবে, ততদিন আমাদের বিজ্ঞানভাণ্ড ও জ্ঞানভাণ্ড সমস্তই বুথা। সাং সং।

মোণার পারিজাত।

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সুবতী সাহসে ভয় করিয়া সেই সিঁড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া গেল। অনেক দূরে গিয়া বাহা দেখিল, তাহাতে সে যুগপৎ বিস্মিত, ভঙ্কিত ও ভীত হইয়া পড়িল।

সে দেখিল, তিন চারিটা প্রেকোটে বিভিন্ন একটা অশ্লব গৃহ—গৃহের ভিত্তি স্ফুট,—কালের কালিদামর হস্তে তাহা এখনও কলুষ কালিতে পরিপূর্ণ হয় নাই—তাহার গাত্রস্থ চুপকালি এখন অশ্লব ও অস্তর অবস্থায়

আছে,—সেই গৃহ কয়টার জানেলা লোহ-দ্বারা বিনির্মিত, কিন্তু দুইটা গৃহের অর্গল অনাবদ্ধ,—একটার অর্গল দুচরূপ আবদ্ধ। সুবতী সাহসে ভয় করিয়া একটা প্রেকোটে প্রবেশ করিল, কিন্তু কাঁপিতেছিল।

যে গৃহে সে প্রবেশ করিল, তাহার মধ্যে দুইখানি খটা এবং অনেক পিতল কাঁসার দ্রব্য ইত্যন্ত বিকিপ্তভাবে পুড়িয়াছিল। তাহার অবস্থা দর্শন করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—অনেকদিন পূর্বে এই গৃহে কাহারো বস করিত,—যাহারা বাস করিত তাহারো নিত্যস্ত দরিদ্র এবং হুণী ছিল না,—কিন্তু কেন এবং কোন্ পথে তাহারো চলিয়া গিয়াছে, তাহা বিন্ন করিবার কোন উপায় নাই। তবে সে উপায় না থাকিলেও সেই ইত্যন্ত বিকিপ্ত দ্রব্যমাণি দর্শন করিলে স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারো যখন গিয়াছে, তখন নিত্যস্ত স্ফুটিতে এবং অস্বাভাবিক মানসে গাইতে পারে নাই। তাহারো ব্যবহার দ্রব্যভাণ্ড ও শুদ্ধাইতে পারে নাই।

সুবতী সেখানে দাঁড়াইয়া চারিদিক অবলোকন করিয়া গৃহমধ্যে বাহিরের আলোক আসিবার আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। তবে এমনভাবে গৃহনির্মিত যে, সেখানে নিরুদ্ধ-বাসে মানুষকে মারিতে হয় না। সুবতী সেই গৃহটিতে দাঁড়াইয়া থাকিল,—চারিদিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ সন্ধানের চেষ্টা নিক্ষেপ

করিল,—কিন্তু সেই বহু দিনের পরিত্যক্ত, অনাদৃত বাসনগুলি আর গট্টা দুইখানি ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

সেই গৃহ দিয়া আবার অপর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার পথ না থাকার সুবতী বাহির হইয়া আবার অত্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। যে প্রকোষ্ঠে সে প্রবেশ করিল, সে প্রকোষ্ঠে অত্র কোন দ্রব্যই দেখিতে পাইল না,—কেবল কতকগুলি ছিন্ন কাগজ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে পতিত রহিয়াছে, সুবতী কাগজগুলি দেখিবার অত্র হাতের প্রদীপটা যেমন মেঝের নামাইতে গেল, অমনি প্রদীপটা গড়াইয়া পড়িল,—তেল ঠনিয়া পড়িল, তড়াতাড়ি সে বর্তিকা তুলিয়া লইতে গেল, কিন্তু হাতে অগ্নির উত্তাপ লাগিয়াছিল,—বাতি নির্ঝাঁপ হইল।

প্রদীপ নিবিয়া গেল, কিন্তু গৃহ অন্ধকার হইল না। সমস্ত গৃহে চন্দ্ররশ্মির জ্বালা কিন্তু বর্ণোজ্জ্বল আলোকমালা বিকীর্ণ হইল সুবতী অভ্যন্ত বিশ্বর চকিত নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল,—তাহারই অদূরে একটা কোলোজির উপরে একখানি ক্ষুদ্র ক্ষটিকাধারে একটা গোলাকার পদার্থ সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই এই আলোক রশ্মি নির্গত হইতেছে। সুবতী চন্দ্রকান্ত অরবিন্দ প্রভৃতি মণির নাম শুনিয়াছিল,—এবং শুনিয়াছিল, সেই সকল মণি হইতে

এইরূপ আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া অন্ধকার বিদূরিত করিয়া থাকে। কিন্তু সে কখনও সেই সকল মণি প্রত্যক্ষ করে নাই, তবে উহা হইতে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করার সে মনে মনে স্থির করিল, ইহা নিশ্চয়ই সেই জাতীয় কোন মহামূল্য মণি, তাহা হাতে আর সন্দেহ নাই। তখন সে, সেই মণিটির নিকট গমন করিল, এবং ধীরে ধীরে তাহাতে হস্তার্পণ করিয়া দেখিল, উহা সূক্ষ্মতল। তখন ক্ষটিকাধার সহ সেই মণিটা লইয়া গৃহ চত্বরে যে বিস্তার বিক্ষিপ্ত কাগজের রান্ধি ছিল, তাহার নিকট আগমন করিল।

কাগজ গুলি অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত এবং তাহার অধিকাংশ মুষ্ণিক কর্তিত। তাহাদের অবস্থা দেখিলে স্পষ্টতই অলুভব হয় যে, এই কাগজের অধিকারী বা অধিভার্মিনীগণ বহুদিন ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং বহুদিন হইতে ইহাদের উপরে আরম্ভল্যা এবং সুবিকেরা অবাধ আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। সুবতী স্থির করিল, এইস্থান হইতেই বোধ হয় ইন্দুর সেই ছিন্ন ও পুরাতন কাগজ লইয়া গিয়া উপরে উঠিয়াছিল, সে তন্ন তন্ন করিয়া কাগজগুলি পাঠ করিল, কিন্তু সেই কাগজে বাহা লেখা ছিল,—সেইরূপ আর কোন লেখা কোথাও দেখিতে পাইল না। যে কাগজগুলি সেখান্ধে ছিল,—তাহার অধিকাংশ জমিদারি প্রভৃতি বহুদূর দলিল পত্র ও হিসাব

আছে। যুবতী যতদূর পারিল, ততদূর পরিভ্রম করিয়া কাগজগুলিকে একত্র সংগ্রহ করিল,—তারপরে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সেগুলিকে বন্ধন করিয়া রাখিবার উপযুক্ত কোন বস্ত্রখণ্ডাদি প্রাপ্ত হইল না। তখন তাহার মনে পড়িল, যে গৃহে সে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই গৃহে খট্টার উপর যে শয্যা দেখিয়াছিল, তাহা হইতে বস্ত্রখণ্ড ছিড়িয়া আনিয়া কাগজগুলি বন্ধন করিবে। মণিটা হাতে করিয়া সেগৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রথমে যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই গৃহে আবার গমন করিল।

খট্টার নিকটে গিয়া শয্যার উপরকার চাদর খানা টানিয়া তুলিল,—উপাধানের নিম্নে চাদর পাতিত ছিল, স্মরণ্য চাদর টানিতে উপাধানটাও উন্টাইয়া গেল,—তাহার তলদেশ হইতে একটা চাবি বাহির হইয়া পড়িল। যুবতী চাবিটা লইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল, তারপরে চাবিটা বসিহস্তে করিয়া চাদর তুলিয়া লইয়া অপর গৃহে গমন করিল,—এবং পূর্ব সঞ্চিত কাগজগুলি একত্র করিয়া সেই চাদরে বন্ধন করিল, তৎপরে, সেগুলি গৃহের একটা তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

বাহির হইয়া একবার ভাবিল, এই অহুজ্জল মণিটা যেখানকার সেইস্থানে রাখিয়া যাই। ইহা লইয়া ঘাইবার আশার কোন

অধিকার নাই,—কিন্তু এই অন্ধকারময় পাতাল পথে বিনা আলোকে যাইব কি প্রকারে? তখন মনে মনে স্থির করিল, এটা লইয়া উপরে উঠিয়া যাই, এবং উপর হইতে প্রদীপ জালিয়া লইয়া আসিয়া আবার যেখানকার মণি সেই স্থানে রাখিয়া যাইব। সেই স্থির হইল।

তারপর তাহার মনে হইল, উপাধানের তলে যে চাবিটা পাওয়া গেল, উহা কোথাকার চাবি, অথবা তাহার সন্ধানই বা আমার বিশেষ প্রয়োজন কি? কিন্তু যে সন্ধান করিতে আসিলাম, তাহার সন্ধান বিলি কৈ? যে পত্রখানি পাইয়াছিলাম, তাহার সন্ধান হইল কৈ?

তখন সে স্থির করিল, আরও কিয়ৎকণ অহুসন্ধান করিতে হইবে,—আরও কিয়ৎকণ ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

যে গৃহটা আবদ্ধ ছিল, যুবতী তাহারই দ্বারের নিকটে গমন করিল,—দেখিল, সে দ্বার ভিতর হইতে আবদ্ধ, তাহার মনে হইল, হয়ত এই গৃহেই মানদাস্ত্রময়ী আবদ্ধ ছিল, হয়ত এই গৃহে তাহার জীবনের অবসান হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু ইহা খুঁজিবার উপায় কি, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ কোথায়? সে তখন সেই গৃহের চতুর্দিকে অহুসন্ধান করিতে লাগিল।

সেই গৃহের পশ্চাদিকে একস্থানে

দেখিতে পাইল, ক্ষুদ্র একটা ঘর,—একজন
মাহুব অতিকণ্ঠে সেই ঘর দিয়া ভিতরে
প্রবেশ করিতে পারে। ঘরে একটা বৃহৎ
চাঁবি আবদ্ধ। বৃহত্তা সেই ঘরের নিকটে
গিয়া বসিয়া পড়িল এবং নিজহাতেই চাকি-
ঘরা সেই কুলুপ খোলে কি না, তাহা পরীক্ষা
করিয়া দেখিল,—সেই চাবিতেই কুলুপ
খুলিয়া গেল। তখন বৃহত্তা আনন্দিত হইল
এবং সেই ক্ষুদ্র নোহুদার টানিয়া খুলিয়া
কেনিল,—তারপর অতিকণ্ঠে সেই অপরিচর
পথে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

পূর্বে যে দুইটা গৃহে সে গমন করিয়াছিল
সে দুটি গৃহ বেরপ পরিসর এই গৃহটা তাহা
হইতে অনেক অধিক পরিসর। কিন্তু বৃহত্তা
দেখিয়া আশ্চর্যবোধিত হইল যে, সেই গৃহ-
মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র ও কুলুপ পর্দা খুলিতেছিল,
সে বেদিকে দণ্ডায়মান ছিল, সেদিকে অন্ধ-
কার ভাবে তাহার হস্তগত মণির আলোতে
উজ্জলীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু পরদার অপর
পার্শ্বে যেন আভ্যন্তর অলিতেছিল, তাহা সে
দৃষ্ট অলুভব করিতে পারিল, তাহার সর্বাক
দিয়া তাকিৎ একবার ছুটিতে লাগিল, এবং
তবে তাহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল।
কিন্তু সর্বজননিষেধ—সর্বত্র নিষেধ।

বৃহত্তা তাহার হস্তগত আলোক সাহায্যে
একবার সেই গৃহের বেকের দিকে চাহিয়া
দেখিল,—দেখিল, একটা শব্দ পড়িয়া আছে

এবং তাহার উপর একখানি নরককাল
বিরাজ করিতেছে। নরককালের মাংসাদি
বহুদিন উঠিয়া গিয়াছে কেবল শুধু অস্থিমালা
প্রকৃত এবং অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহি-
য়াছে। তাহার অনুরে এক কল্পকেশ
ইতস্তত বিক্লিষ্ট ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।
বৃহত্তা তদ্বর্ণনে শিহরিয়া উঠিল,—তাহার
বক্ষঃ পঙ্কর অতিদ্রুত বেগে কম্পিত হইল,—
তাহার মনে হইল, হরত মানদাহুন্দরীর ইহা
মৃত্যু শয্যা হরত তাহারই সেই ককাল এই
শব্দ্যার পড়িয়া রহিয়াছে। সে আর পর্দার
অন্তরালে চাহিতে ইচ্ছা করিল না,—একবার
তর বিরাম নেত্রের সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে চাহিয়া
বাইবার উদ্দেশ্য করিতেছিল,—কিন্তু সহসা
পর্দা নড়িয়া উঠিল,—তারপর পর্দার মধ্য
হইতে একখানি অতিশুদ্ধর গৌরবর্ণ হাত
বাহির হইল, দেখিতে দেখিতে দুইটা উজ্জল
চক্ষু দেখা দিল,—তারপর সর্বাস্তে গৈরিক-
বসনাবৃত একমূর্ত্তি পর্দার মধ্য হইতে বাহির
হইয়া বলিল,—“সোণামুখি তোমার ধন
সাহস।”

[ক্রমশঃ।

শ্রীহরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সংক্ষিপ্ত—সমালোচনা ।

প্রবাহ । আখিন । প্রথমেই তত্ত্ব অতি-
রামের “উদ্বোধন” অতি সুন্দর তত্ত্বগদ্য
কর্ত্তে এমন তত্ত্বপূর্ণ আবাহন আমরা অনেক
দিন শুনি নাই—যা ভগদদা ভক্তের বাসনা
পূর্ণ করুন “নিরতি শ্রীমতী যুগলিনী গুপ্তার
একটি অতি সুন্দর কবিতা—ইহার মধ্যে কিন্তু
কবিত্ব পাইলাম না—এমন কবিতা ত অনেক
পড়িয়াছি আর কেন ? শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবুর
ছুইডাই একটি সুন্দর কথা আমরা কর বারই
নারায়ণ বাবুর লেখার তত্ত্ব ও ভাবের
মিষ্টত্বের প্রশংসা করিতেছি কিন্তু তিনি বহু
দিন চর্কিত গল্পগুলির কাঠামোর ওঁহার
কৃতিত্ব না দেখাইয়া নূতন প্রটে (পরাংশ)
ওঁহার ক্রমতা পরিচালনা করিলে আমরা বড়
স্বাধী হইব কারণ ওঁহার লেখা বড় উচ্ছ্বসের
এই পুরাতন প্রটেও যে সুকুমার বৈহঙ্গিক
সুসজ্জিত প্রবাহিত করাইয়া দিল তাহা
অবর্ণনীয় । আখিন কবিতা মন্দ নহে । বাহা-
রামের পাঁচকথা আমাদের গৃহে গৃহে অধুনা
প্রচলিত কথাবাহার একখানি নির্ভূত কটো
উঠিয়াছে সম্পাদকের প্রতিজ্ঞা এবার সর্বোৎ-
কৃষ্ট হইয়াছে—যেমন জলর গভীর তাবা

ভেদবি ভ্রমভান এখনও যেন বোধ হয়
দামোদর বাবুর ক্রীমুত মন্ত আমাদের কর্ণ-
পটেই প্রতিধ্বনিত করিতেছে “যা” হয় শক্তি
দাও নয় তোমার এ অমর সন্তানগণকে তুমিই
লও অন্যত্র প্রবন্ধগুলিও মন্দ নয় তদ্ব্যতী
ভাষা ও ব্যাকরণ উল্লেখযোগ্য ।

উদ্য । ভাষ্য । উহার আর কি সমা-
লোচনা হইবে ; প্রবন্ধভাবে সম্পাদক বাহা
তাহা তুলিয়া দিতেছেন সুস্থলে প্রকাশিত তৎ-
পরে সেকালের কথা প্রকাশিত ডাইনার
তুলিয়া দিয়াছিলেন—বাহা একবার প্রকাশিত
হইয়াছে তাহা আবার কেন এবার উল্লেখ-
যোগ্য প্রবন্ধ একটীও নাই সকলি ভ্রমর বাল-
কের ভাষ্য তবে প্যারীবাবুর বাবু মন্দের ভাল
—ইহার ছেলে তুলাইয়া কাগজ চালাইতে
চাহেন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু
প্রবন্ধের ইচ্ছা পাঠ করিয়া কি ফল হইবে ?
উপাসনা জৈষ্ঠ । কার্ত্তিক মাসের উপা-
সনার সংখ্যা পাঠ্য ; আমরা কেমন একটু
নিমিত্ত হইবার কারণ চক্ষুসেবর বাবুর পৃষ্ঠ
পোষক থাকে সন্তোষ পাত্রিকা খানি একপ
বিশৃঙ্খলভাবে প্রকাশিত হওয়া বড় দুঃখের
বিষয়—বাহা হটক পত্রিকাখানি নামাধি
সুপাঠ্য প্রবন্ধে পূর্ণ দেখিয়া বড় আশ্চর্য
হইলাম । মল্লরাজ প্রতাপাদিত্য চরিত
৬৮মবাবুর গ্রন্থের সমালোচনা একপ প্রাচীন
পুস্তকের সমালোচনা ও পুনঃ সংস্করণ

হওয়া বড় বাঞ্ছনীয় । স্পর্শমণি একটি গল্প—তরুণরসে পূর্ণ বড় পাকাহাতের বলিয়া বোধ হইল । বেদান্ত বিষয় বেশ সরসভাবে লিখিত হইতেছে । “স্পিনহারিঙ্গোপ” নবাবিস্কৃত রিতিরম ধাতুর বিশ্লেষণ বেশ মধুরভাবে লিখিত হইতেছে স্বদেশ কবিতাটি বেশ সুন্দর হইয়াছে “আমি কারে চাই” আজ কালকার সে পাগলিনীমূর্তি নাই চাহিলেন—এখন অস্ত্র কিছু চাহিলে ভাল হয় না । এহুসমাশোচনা বেশ চলিতেছে ।

ভারতী । আশ্বিন । প্রথমেই ঐগলচরণ দাস গুপ্তের “মাতৃভূমির প্রতি” একটি কবিতা উক্তিটা মন্থযোচিত হইয়াছে তৎপরেই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নির্মাচিত একটি গল্প—বেশ আড়ম্বর বর্জিত সরল সুন্দর—আমাদের বড় ভাল লাগিল । ভুকারামের আত্মকাহিনী—ভাল লাগিল না । পণ্ডিতবর সতীশ বাবুর তিব্বত দেশের বজ্রভৈরব একটি অবস্ত পাঠ্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ । প্রিয়দর্শা দেবীর

“সুখ” একটি কবিতা—অনেকটা কবিতারই মতন বলিয়া বোধ হইল । অমঙ্গল বড় সুখ-পাঠ্য প্রবন্ধ । স্বর্ণকুমারীদেবীর জীবন অভিনয় মন্থ জীবন নাটকের একটি উজ্জলদৃশ্য পাঠে বড় তৃপ্তি অনুভব করিলাম । তৎপরেই “মহা-নাটক” এক মহাপর্ক ! কতদিনে শেষ হইবে অমৃতবাবুর মরুর কথা পরের কাছে বলিয়া বড় ভাল করিতেছেন না যাহাই হউক তাঁহার লেখায় সরল সৌন্দর্য্য ও সজীবতায় আমরা মুগ্ধ । “ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার” কি মাসিক পত্রের উপর রাজেন্দ্র বাবুর অত্যাচার নহে । বরষাটও স্বদেশীয়র স “অভয় বাণী” প্রভৃতিও উল্লেখ যোগ্য । গানটি আমাদের বড় ভাল লাগিল । খেরালী খাতার মধ্যে মাননীয়া সরলা দেবীর ও বিজয় বাবুর কথা না থাকিলে বাস্তবিকই খেরাল হইয়া পড়িত । এ খেরাল কতদিনে মিটিবে ।

ঐসমাশোচক শর্মা ।

কলিকাতা, ১৩৩ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট “হরি-বসন্ত” ঐযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

আলোচনা।

“মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।”

নবম বর্ষ।

মাঘ সন ১৩১২।

দশম সংখ্যা।

অনুভূতি।

আমাদের বাগানবাড়ীর বারাণ্ডা ঠিক পক্ষীর উপর। বৈশাখ মাস, রাত্রে বড় ঐক্স হইতেছিল বলিয়া ঘরের মধ্যে থাকিতে পারিলাম না; বিছানা হইতে উঠিয়া বারাণ্ডায় আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি যে, আকাশে একখানা ভরানক মেঘ উঠিয়াছে, পক্ষাবক্ষে তাহার ছায়া পড়িয়া শুটনী বেন জীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া একটু স্থব্ধ হইলাম। দেখিতে দেখিতে দেখলাম সমস্ত আকাশ ছাইয়া কেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তুলু বড় উঠিল, পক্ষার দিকে চাহিয়া দেখি যে, অন্ধকার তেন করিয়া উঠিলেকেন একখানা নৌকা আলিতেছে,— নৌকাখানি আসিয়া বারাণ্ডার নীচে আনবেক ঘাটে লাগিল। আমি ভাতাকাকি নীচে নামিয়া গেলাম এক দেখিয়া যে, নৌকার

মধ্যে একটা সন্ন্যাসী বসিয়া আছে। তাঁহার বয়স অল্প—বেশ সোয়াসুতি। আমি বলিলাম, “আপনি কেন নৌকার বসিয়া থাকিবেন, অহুগহ করিয়া আমাদের ঘরে ঢুকুন, স্বড় থাকিয়া গেলে পুনরায় বাজা করিবেন”।

সন্ন্যাসী বিকল্পিত না করিয়া আমার সঙ্গে আসিলেন, আমি তাঁহাকে আমার সম্মুখেই একখানা চেয়ারে বসিতে বলিলাম, তিনিও বসিলেন, কিন্তু এতকণ পৰ্যন্ত আমার কোনও কথা উত্তর দিলেন না। কিংবা নিজে কোনও কথাও বলিলেন না। সন্ন্যাসী মৌনী না কি?

আমি বড় বিপদে পড়িলাম, অপরিচিত সন্ন্যাসীকে কি বলিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি মৌনী কি না তাই বা বিজ্ঞানা করি কি করিয়া; বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। শেষে সাহস করিয়া বলিয়া কেছিলাম, “আমার জিনিষপত্রগুলো নৌকা থেকে উপর

নিরে আসব কি" ? সন্ন্যাসী বলিলেন,—
"একটা কাঠের বাস আছে, যদি আপনার
চাকরকে আনতে বলেন তো ভাল হয়" ।

আমি রানচরণকে বাস উপরে আনিতে
বলিলাম । রানচরণ তৎক্ষণাৎ বাসটা সন্ন্যাসীকে
দিয়া গেল ।

আমি সন্ন্যাসীকে বলিলাম,—“রহাশর,
যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নাম
জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিলেন,—
“আমার কাছে অত কুঠিত হ'বার প্রয়োজন
নাই,—আমার নাম ঐনরেশচন্দ্র চট্টো-
পাধ্যায় ।”

“আপনার নিবাস ?”

“গোপালপুর গ্রামে ।”

“আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন কত
দিন ?”

“গ্রাম দশবৎসর হইবে ।”

“বাটীতে আপনার কেহ আছেন ?”

সন্ন্যাসীর একটা দীর্ঘনিঃবাস পড়িল ।

একটু থাথিয়া তিনি বলিলেন,—“ছিল সব,
একজন কেহ নাই ।”

সন্ন্যাসীর বিবর ভাল রকম জানিবার
জন্য আমার বকু ইচ্ছা হইল,—আমি কোতু-
কজনবদে হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, রহাশরের
অন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বকৃত্যে আনিতে পারি
কি ?

সন্ন্যাসী বলিলেন, তনিবেন কি ? আমি
তাঁহাই চাই, আমার পাণ্ডুর জীবনের ইতি-
হাস কাহারও নিকট বলিতে পারিলে আমার
বেন তৃপ্তিলাভ হয় ।

আমি বলিলাম,—তবে অল্পগ্রহ করিয়া
আমার বসুন ।

গোপালপুরগ্রামের ৬রামনারায়ণ চট্টো-
পাধ্যায়ের আমি কনিষ্ঠ পুত্র, আমার পিতৃ-
দেব বেশ সন্ততিপন্ন ছিলেন । তাঁহার মৃত্যুর
পর আমার অগ্রজ ৬যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক হইলেন । হায় !
ওতকণে দ্বাধা আমার অভিভাবক হইয়া-
ছিলেন । বন্দভাগ্য আমি তাঁহার অভিপ্রায়
বুঝিতে না পারিরা নিজের পায়ে নিজে
কুঠারাঘাত করিয়াছি । দাদা আমার তির-
স্কার করিলে আমি রাগ করিতাম, কত
কুচিন্তা মনে আসিত, ভাবিতাম,—দাদা বুঝি
আমার ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছেন ।
আমাকে কোনও বিষয় জানিতে না দিয়া
সমস্ত সম্পত্তি বুঝি নিজে ভোগ করিতে
প্রয়াস পাইতেছেন । হায় ! আমার বুঝি ।

আমি বধন বিদ্যালয়ে পড়িতাম, তখন
হইতেই আমার অধ্যাপকদের স্নেহলাভ
হইয়াছিল । কিছুদিনের মধ্যে আমি ছন্দ
ছাড়িয়া দিলাম । একে একে বৌবনের
সমস্ত বোঝগুলি আমার বিরিয়া কেঁদিল ।
আমি বিকাশোদ্ভূত প্রকৃতিকে বাধা দিতে

চেষ্টা করিতাম না, বাসনা এবং কামনা বখন বৌদ্ধিক কিরাইত, তখন সেই দিকেই কিরিতাম। সময়ে সময়ে ভাবিতাম আমাদের এত বিবরণসম্পত্তি, কিন্তু তবু আমার পক্ষে বিলাসিতার দ্বার রুদ্ধ কেন? বত নষ্টের মূল দাদা। তিনি থাকিতে আমার বৃদ্ধি স্থব্ধ হইল না।

এক একবার বখন প্রকৃতিস্থ থাকিতাম, তখন মনে হইত—দাদা আমার মঙ্গলের জন্যই তিরস্কার করিতেছেন, কিন্তু এ তাব অধিকক্ষণ থাকিত না। একটু পরে ঘাড়ের ভূত চাপিলেই আমার মনে হইত—দাদার তো পুত্র কতাই নাই, তবে কি বধা সর্বদা বৌদ্ধিক দিবেন নাকি?

দাদার গভীর সুখের দিকে আমি চাহিতে পারিতাম না, কিন্তু বৌদ্ধিকের হাসি হাসি মুখখানি দেখিলেই সব ভুলিয়া বাইতাম। বখন তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতাম, তখন মনে হইত আমি বৃদ্ধি স্বর্গে। দাদাকে আমি মনে মনে বড়ই অশ্রদ্ধা করিতাম,—ভক্তি করিতাম বৌদ্ধিককে। তার রেহ আর যত তাঁর মিষ্ট কথা একদণ্ডে আমার প্রকৃতি পরিবর্তিত করিয়া দিত, দাদার তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া আমি তাঁহার কাছে হৃদয়ের আলো জ্বাইতাম। উঃ এত অধঃপতনেও তাঁর উপদেশ বা কা ভুলিতে পারি নাই। অন্ধ আমি তখন কেন বুঝিলাম না।

এই সময়ে সন্ধ্যায় একটু জল চাহিলেম। আমি তাঁহাকে জল পান করিতে দিলাম। তিনি আমার বলিতে লাগিলেন, আপনি আমার যত্না করুন—প্রাণ তরিয়া যত্না করুন আপনায় কাছে আমার হৃদয়ের বোকা নামাইয়া আমি একটু সুস্থ হই।

একদিন আমি চেন নবোত্ত দাদার সোণার বাড়ি চুরি করিলাম। তখন আমার টাকার দরকার—চারিদিকে বন্ধুরা উৎসাহ দিতেছে—আর কি রকম আছে।

বৈকাল বেলায় বখন একজন বেতীর বাতী সমস্ত দিন বন্ধুদের সহিত আয়োদ আফ্রাদ করিয়া কিরিয়া আসি—রাতে প্রায় দাদার তরে বাতী হইতে বাহির হইতে পারিতাম না—সেই সময় আমার নানারূপ স্মৃতিভা আসিতে লাগিল। তখন বেশ একটু গোলাপী নেশা হইয়াছিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম। “দাদা বড় বদলোক, তিনি আমাকে ক’কি দিতে পারেন, আর আমি কি কিছু করিতে পারি না? আমি দাদাকে কি করিয়া বিপদে ফেলিব, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। দাদা মরিলে আমার মনকারবার সিদ্ধ হয়। আমি সমস্ত বিবরের অধিকারী হইব। বৌদ্ধিকের সেরেমাছল, মিষ্ট কথার মক্কা সম্বন্ধা নাইব। দিক আমার হুঁচি, আমি দাদাকে খুন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম একদা সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কখন

কিছুমত বলবান, সবচেয়ে একাধিক সিদ্ধ হইবে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিলাম; আমাদের বসতিলা পর্বতে আসি-
 য়াছি, এমন সময় পক্ষাৎ দিক হইতে এক
 খান্না সুবল বক্ত আবার কাঁধে পড়িল। পিছন
 ফিরিয়া চাহিয়া দেখি,—কৃত্রুমুত্তি দাদা,
 দাদা বলিলেন, নরেশ। তুমি আমার বাড়ি
 চুপি করিয়াছিলি কেন? আমি অগ্নান বদনে
 বলিয়া ফেলিলাম “কই আমি ত চুপি করিনি।”

দাদা আমার গাভ্রহেপে এক চপেটাঘাত
 করিয়া কহিলেন,—“একটা আবার মিথ্যা
 কথা, এটা কি?”

এই বলিয়া দাদা পকেট হইতে একটা
 বস্ত্র ও বস্ত্রের চেন বাহির করিলেন। আমার
 পাক্সা পুরুষ শুকাইয়া গেল, বিস্মা শুভ হইয়া
 আসিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম দাদা
 বস্ত্রের নকশা ধরিয়া, যে ঘোঁকানে আমি বড়ি
 করিয়া করিয়াছিলাম; সেখান হইতে সমস্ত
 কলান বাহির করিয়াছেন। আমি বেগতিক
 দেখিয়া পলাইবার উদ্বেগ করিতেছিলাম,
 এমন সময় সত্যেরে দাদা আমার হাত
 চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, তোর মুখে গন্ধ
 কিছন্ন? একেবারে অথঃপাতে খেঁচিল;
 হ্যাঁ, তোক কেটে ফেলব। আমার মুক
 এক গন্ধ করিতে লাগিল এবং মনে মনে
 অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। দাদা বাটাতে
 আসিয়া আমাকে অত্যন্ত প্রহার এবং ভির-

হার করিলেন। বৌদিদি দাদাকে নিবৃত্ত
 করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পারিলেন
 না। দাদার এক ধমকানি খাইয়া এক
 তাঁহার কৃত্রুমুত্তি দেখিয়া কান্না হইলেন।
 আমি প্রহার খাইয়া সেই খানেই অর্ধমুষ্টিত-
 ভাবে বসিয়া রহিলাম। দাদা চলিয়া গেলেন।

আগ্নি কাঁহিতেছি এবং রাগে কাঁপিতেছি,
 এমন সময় একখানি কোমল হস্ত আমার
 গিঠে পড়িল। বুঝিলাম বৌদিদির হাত।
 আমি স্নাখা শুজিয়া বসিলাম। নরেশবলের
 বুদ্ধি হইল। আশ্রয়স্থল পাইয়া কেহের
 আধার পাইয়া আমার অভিমান উৎপলিত
 উঠিল—অগ্নি আরও কাঁহিতে লাগি-
 লাম।

বৌদিদি কত উপদেশ দিলেন, কত
 সাহসনা করিলেন, কিছুতেই আমার জ্বো-
 উপশম হইল না, শেষে চাহিয়া দেখি বৌদিদির
 চক্ষু দিয়া দর দর করে জল পড়িতেছে।
 আমি আর থাকিতে পারিলাম না, কেমন
 কষ্ট হইতে লাগিল, বলিলাম—বৌদিদি তুমি
 কেঁদ না, আমার কপালে বা ছিল, তা
 হইবে।

বৌদিদি বলিলেন,—“ভাকু-পো, রাগি
 মোকের কথাই রাখ করো না।

আমি বলিলাম, “না, বৌদিদি, তুমি
 কেঁদ না।”

বৌদিদি বলিল—তবে তুমি আমার ঘরে

এস, আমি তোমার ভক্ত খাবার রেখেছি,—
খাও এস ।

স্নেহময়ীর নিকট আমি পরাজিত হই-
লাম—মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমি তাহার পশ্চাৎ অনু-
সরণ করিলাম । কিছুক্ষণ পরে বৌদিদি
কাঁধাডারে গেলে আমি তাহার ঘর হটেতে
বাহিরে চলিয়া আসিলাম । চিরমধুরস্রাবের
বহুদের সঙ্গে আমার মিশিলাম, ক্রমে ক্রমে
আমার ঘোর অধঃপতন হইল—হৃদয়ে সমস্ত
ঐশ্বর্যাতিক বৃত্তি আগিয়া উঠিল—লজ্জা সর-
মের তরু বুলিল—আমি যে মাড়াল এবং
বেঙ্গাগামী, তাহা সকলেই জানিল । এবারে
মরিয়া হইয়া দাদাকে খুন করিবার স্বযোগ
অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম ।

আজ কাল দাদার সঙ্গে আমার বড়
একটা দেখা হইত না । সস্ত্রীতি বউদিদির
বড় জ্বর হইরাছিল । নিউমোনিয়ার সমস্ত
লক্ষণ দেখা দিয়াছিল । আমার মনে এক
একবার বৌদিদির কথা উঠিত—মনটা
খারাপ হইত । আমার স্নেহময়ীর কপার
“বে আমি সেই আমি” হইয়া যাই-
তাম ।

আমি দেখিলাম রুমালী মাঝে মাঝে
ছন্দু মুছিতেছেন । বুকিয়ার অতীত বৃত্তিতে
তার ঐশ্বর্য ব্যাকুল হইতেছে । কিন্তু তাহার
ইতিবৃত্ত ভুলিতে আমার এত কোতূহল
হইরাছিল যে আমি তাহাকে নিরন্তর হইতে

যমিতে পারিলাম না, তিনি যমিতে
লাগিলেন ।

আমাদের বাটীর পার্শ্বে মোহিনীদেব
বাটী, মোহিনী বালা বিধবা তাহার স্নেহকে
আকৃষ্ট হইয়া আমার রূপকবোহ আমাকে
অস্থির করিয়া তুলিল, আমি নানা প্রকারে
মোহিনীকে হস্তগত করিতে চেষ্টা পাইলাম
অবশেষে নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া সেই
বালবিধবার সর্জনশা সানন্দ করিলাম ।
তাহাকে বাটীর ভাহির করিলাম এবং কনি-
কাতার আনিয়া রাখিয়া দিলাম ।

ক্রমে মোহিনী আমার সমস্ত স্বপ্ন
অধিকার করিয়া ফেলিল । আমি তাহার
পরামর্শে চালিত হইতে লাগিলাম । মোহি-
নী অত্যন্ত বাঙালি । তাহার সব চাই
আমিই তাহাকে খাওয়াতে শিখাইয়াছি-
লাম । তাহার গহনা চাই, আমিই তাহাকে
পরাইয়াছিলাম । তাহার সমস্ত বিলাসিতা
চাই, আমিই তাহাকে কুলত্যাগিনী করি-
ছিলাম । তাহার প্রয়োচনার আমি এবার
দাদাকে খুন করিবার ভক্ত বিভব উৎসাহিত
হইলাম ।

বৌদিদির বড় অমুখ এখন যান ভক্ত
যার রাজে দাদা তার কাছে থাকেন এবং
গুজরা করেন । আমি কনিকাতার মোহি-
নীকে রাখিয়া বৌদিদির অস্থির ভক্ত
বাটী আনিয়াছি, বৌদিদির আর বাঁচিয়া

আশা নাই দাদা যেন কেমন হইয়া গিয়াছেন আমারও নিবৃত্তি নাই কেবল ডাক্তারের বাটা ছুটাছুটি করিতেছি। বৌ দিদি অজ্ঞান অবতার আছেন। দাদা কেবল আমার কাছে বসিতে বলিতেছেন। তিনি একাকী থাকিতে পারেন না। বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় দাদা আমার বলিলেন “মরেশ তুই গুণে যা—আজ দু-দিন ক্রমাগত রাত আগছিস্ অসুখ কোরবে। শেষ রাত্রে আমি তোকে ডেকে দিবে শোব এখন।” আমার শরনের অস্ত্র মন কেমন করিতেছিল না। দাদার কথা এড়াইতে পারি না বলিয়া শুইতে গেলাম, কিন্তু ঘুম আসিল না। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় অসুখ থাকিতে না পারিয়া বৌদিদির ঘরের দিকে গেলাম। ঘর ভেজান ছিল, আমি দার পার্শ্বে বাইতেছি, কথা শুনিতে পাইলাম, কুঁকিয়া দাদা ও বৌদিদি কথা করিতেছেন। প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলাম বৌদিদির যখন জ্ঞান হইয়াছে, তখন বোধ হয় বাঁচিবেন।

আমি দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। শুধনও জ্যোৎস্না ছিল। চৈত্রমাস নৈশ কলরাসিল সমস্ত শরীর যেন স্নিগ্ধ করিয়া দিতেছিল। আমার প্রাণের ভিতর কেমন একটা জ্বালা আসিল। সেই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি স্নিগ্ধ সমীরণ বত আমার গারে লাগিতে

আরম্ভ করিল ততই যেন কুঁকর ভিতর হুহু করিতে লাগিল।

দাদা বলিতেছেন—এখন কি একটু সুস্থবোধ করিতেছ ?

বৌদিদি। হ্যা, এখন যেন অনেকটা সুস্থ কিন্তু বড়ই দুর্বল। বৌদিদি অতি ক্লীণ কণ্ঠে উত্তর করিলেন। বৌদিদি আবার বলিল, দেখ ঠাকুরপোকে আমি অনেক দিন দেখিনি, একবার দেখিতে ইচ্ছা হচ্ছে। আহা! তুমি তাকে শাসন করে সে আমার কাছে কত অভিমান করতো, অনেকদিন তার কথা শুনি নি একবার তার কথা শুনো।

দাদা। তা শুনবে এখন, একটু হির হও, সকাল বেলা তাকে তোমার কাছে ডেকে দেবো; আমার ইচ্ছা হইল, এখনি ছুটিয়া বৌদিদির কাছে বাই, কিন্তু আরও একটু স্নেহের অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা হইল। বৌদিদি যখন সুস্থ আছে তখন আর ভাবনা কি একটু কথা শুনো শুনিই না কেন।

বৌ দিদি আবার বলিলেন দেখ তোমার মতলব আমি কিছু বুঝিতে পারিনা তুমি ঠাকুরপোকে অত মার কেন? আমি কখনও তোমার কোন কথা বিজ্ঞাসা করি নাই আমার এই কথাটির উত্তর দাও।

দাদা—একটু হাসিয়া বলিলেন—“ছেলে-টা অধঃপাতে যায় তাকে ধ্বংসের পথ থেকে

বাঁচাবার ভক্ত এত শাসন করি। তোমরা
সেই বাহুব বৃত্তে পারনাও।

আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগি-
লাম। বোধ হইল যেন আমি রসাতলে
নামিয়া বাইতেছি। আমার চক্ষে স্পষ্ট বোধ
হইল বৌদিদি দেবী দাদা পিণ্ডাচ। আমি
ভাবিলাম এখনও ছলনা। আমাকে ধ্বংসের
পথ থেকে বাঁচাবার জন্য শাসন হচ্ছে আমার
এত হিতাকাঙ্ক্ষী তুমি।

আবার বৌ দিদি বলিলেন—“দেখ,
আমার শরীর বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে কোনও
ব্যয়গ। নেই তবু যেন বুকটার ভিতর খালি
খালি বোধ হচ্ছে নিশ্বাস ফেলতে একটু
কষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় আমি বাঁধবনা
তুমি আমার কাছে ঠাকুরপোকে একবার
ডেকে দাও আমি ভাল করে তার সঙ্গে
একটু কথা কই। আমি আর প্রজ্ঞার না
থাকিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

দাদা বলিলেন—এই যে নরেশ এসেছিল?
ডেকে খুঁজেছিল। আমি গিয়া বৌ দিদির
শিরে বসিলাম।

বৌ দিদি তখন ধীরে ধীরে আমার
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, বলিল ঠাকুর পো
আমার সামনে এসে এস আমি তোমার
ভাল করে দেখতে পাচ্ছি। আমি বৌ
দিদির কাছে বসিলাম তিনি ধীরে ধীরে
আমার গিঠে হাত দিলেন।

আমার অনেক কথা মনে পড়িল।
আর উপদেশ দিষ্ট কথা বেদিন দাদা প্রহার
করিয়াছিলেন সেদিনকার কথা “ঠাকুরপো
রাগী লোকের কথার রাগ কোরোনা ঠাকুর
পো” সমস্ত মনে পড়িল। আমার কান্না
আসিতে লাগিল। দাদার দিকে চাহিয়া
দেখি তিনি মাথা শুষ্কিয়া কাঁদিতেছেন।

বৌদিদি বেলীকণ আমার গিঠে হাত
রাখিতে পারিলেন না। হাত লোটাঁইয়া
পড়িল। তখন চিরপরিচিত চির মধুর কত
কত উপদেশ দিলেন “কত কথাই বলিলাম।
প্রাতঃকালে উষা দেখা দিতে না দিতেই
বৌদিদির জীবন দীপ নিভল।

বৌদিদির মৃত্যুর পর হইতে দাদা আমার
বড় ভিরকার করিতেন না। কিন্তু কি
জানি দাদার উপর যে আন্তরিক অশ্রদ্ধা
ছিল তাহার অপনোদনও হইল না। আমি
তখনও মোহিনীকে ছাড়ি নাই। বৌদিদির
মৃত্যুর পরেই আবার আমি আমার পূর্ণ
প্রকৃতি পাইলাম। রীতিমত সুখাপান
করিতে লাগিলাম। দাদাও আবার পূর্ণবয়স
ভিরকার আরম্ভ করিলেন আমি বাঁচি-
তাম না। যখন বাঁচতাম তখন দাদা
আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেন
না। তাঁহার উপর আমার রাগ দিন দিন
বৃদ্ধিতে লাগিল।

দাদা আমার বাঁচিতে আসিতে পক্ষ

শিখিয়াছিলেন। একদিন বাটীতে আসি-
রাহি, দাদা তাঁহার ঘরে বসিয়া কি নিখি-
তেছেন, আমি আসিয়া দাঁড়াইলাম। দাদা
আমার দিকে চাতিয়া বলিলেন “নরেশ
কাল সকালে কোথাও বাসনি।”

আমি বলিলাম “কেন দাদা ?

দাদা তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ গভীর ঘরে
বসিলেন “প্রয়োজন আছে।”

আমি কহিলাম “কিন্তু পাই না।”

দাদা কহিলেন “তোমাকে কাল জন-
কয়েক লোক দেখিতে আসিবেন। আমি
তোমার বিবাহ দিব।”

আমার মাথার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।
আমি মোহিনীর প্রেম পাশে আবদ্ধ, আমার
কোন কথা ভাল লাগিল না। কেন আমি
দাদার কথা শুনিলাম না। আমি বলিলাম
“দাদা আমি বিবাহ করিব না।”

দাদার মুখখানা গভীর হইল। কপালের
ঝর মুছিতে মুছিতে দাদা বলিলেন “নরেশ
তোমাকে সংগে আসিবার জন্য অনেক
চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল
না। বনে করিয়াছিলাম, বিবাহ দিবে
তোমাকে সংসারী করিব। আর সুখের
অভিলাষ নাই। এখন তুমি দাদার মত
হইয়া সংসারবন্দী কর।”

আমি।—“দাদা ! আমার বিবাহ
করিতে আসো ইচ্ছা নাই। আমার দাদা

করুন, আমি বিবাহ করিতে পারিব
না।”

দাদা।—নরেশ ! আমার কথার সম্মত
না হওয়া কি ভাল দেখায় তাই ?

আমি বহুদিন দাদার নিকট এরূপ মিষ্ট
কথা শুনি নাই। কিন্তু তাঁহার কথার সম্মত
হইতে পারিলাম না। আমি বলিলাম “দাদা
তোমার পাশে পড়ি আমাকে এখন বিবাহ
করিতে বলিবেন না।”

দাদার মুখের উপর কালো মেঘের মত
একটা ছায়া পড়িল। অনেককাল চুপ
করিয়া থাকিয়া তিনি একটি দীর্ঘশ্বাসের
সহিত কহিলেন “বাও ভাই, আমি তোমাকে
আর কোন কথা বলিব না, তোমার বা ভাল
বিবেচনা হয় কর।” দাদা কাপড়ের অঙ্গ-
ভাগ দিয়া মুখ মুছিলেন কি চোখ মুছিলেন
ভাল বুঝিতে পরিলাম না।

আমি পরদিন প্রত্যহেই কলিকাতার
মোহিনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম ;
এবং দাদার নিকট আমার ঠিকানা পৌগন্সে
রাখিবার জন্য অল্প একটা বাটী ভাড়া করিয়া
মোহিনীর সহিত তথায় অবস্থিতি করিতে
লাগিলাম। মনে রাখিবেন আমি তখন
সাবালক। দিন কতক বেশ কাটাইতেছি।
মোহিনী বড়ই বন্ধ করে। আমার বন্ধুরা
সন্ধ্যার পর একে একে আসিয়া কোটে।
সমস্ত রাত্রিই প্রায় আলাপ চলে। আমি

ক্রমেই কাণ্ডজ্ঞানবহিত হইয়া পড়িলাম।
টাকার প্রয়োজন হইল; আমার দশটা টাকা-
গুলির বড় হিসাব রাখিতেন না। তিনি
কাব্যামোদী; কাব্য লইয়াই ব্যস্ত। আমি
নানাপ্রকার উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিতে-
ছিলাম, কিন্তু এখন আর চলে না, টাকা
চাই।

একদিন একখানা চিঠি আমার নামে
নূতন বাসায় আসিল। আমি দেখিলাম, দাদার
হাতের লেখা। আমি অবাক! দাদা কি
করিয়া আমার ঠিকানা জানিলেন? হায়!
আমার এত কটুবুদ্ধিতেও চতুর দাদাকে
ঠকাঠেতে পারিলাম না। চিঠিতে এইরূপ
লেখা ছিল;—

ভাই নরেশ!

জীবনের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি।
সাধী সতী তোমার বৌদিদির মৃত্যুর পর
আমার জীবনটা বড়ই শীঘ্র শীঘ্র কালসমুদ্রের
দিকে ছুটিরাছে। ভাই! আমার কেহ নাই,
একমাত্র তুমি আছ। কিন্তু ভাই তুমি ত
পারিলে না। এত বিষয় সম্পত্তি কাচাকে
দিব? স্বর্গীর পিতার কীর্তি ত লোপ করিতে
পারি না। তুমি ত দুইদিনে উড়াইয়া দিবে।
তোমার অংশ তুমি লইও। আমার দেবজ
করিয়া দিলাম। দুই চারি দিন পরে আমি
গৃহত্যাগ করিব। তোমার দলিল পত্র বাহা
কিছু প্রয়োজন, আমার ঘরে লোহার সিন্দুকে

পাইবে।^{*} চাৰি দেওয়ান মহাশয়ের নিকট
রহিল। বোধ হয় তোমার সহিত আর দেখা
হইবে না। ইতি ২০শে আশ্বিন সন—

আলীকাদক

তোমার দাদা।

পত্র পড়িয়া হৃৎ হওয়া দূরে থাক,
আমার রাগ হইল। আমি ভাবিলাম, দাদার
অংশ আমি পাইব, দেবজ করিতে দিব না।
যদি তিনি ইতিমধ্যে সম্পত্তি দেবজ করিয়া
থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হত্যা করিব।
আমি থাকিতে তিনি তাঁহার অংশ দেবজ
করিবেন কেন?

সে দিন রাতে খুব স্বরাপান করিলাম।
মোহিনীকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম।
সে আমার অত্যন্ত উৎসাহ দিতে লাগিল।
পরদিন শ্রাতে আমি বাটার দিকে বাজা
করিলাম।

বাটাতে আসিয়া দেখি, দাদা গৈরিক বস্ত্র
পরিধান করিয়াছেন—গলার কজাকের মালা,
তাঁহার রূপ ও বলব্যাক্য দেখে ছিল, সন্ন্যাসীর
পরিচ্ছদে তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখাইতে-
ছিল। আমি ভাবিলাম এ সমস্ত ভগ্নানী।
দাদা বলিলেন, “নরেশ! আমি পঞ্চ বাজী
হইতে যাত্রা করিব; তুমি আসিয়াছ, ভালই
হইয়াছে। আমার অংশ আমি দেবজ করিয়া
দিরাছি, তুমি তোমার অংশ বুঝিয়া লও।”

আমি বলিলাম—“আমি থাকিতে তুমি

কেন তোমার অংশ দেবজ করিলে? কাজটা কি ভাল হইল?”

দাদা মাটির দিকে চাহিয়া গভীরভাবে কহিলেন, “ভাল হউক, মন্দ হউক, তোমার দেখিবার প্রয়োজন নাই।”

আমি কোন কথা না বলিয়া রাগে গরগর করিতে করিতে আমার ঘরে গিয়া বসিলাম। মনে করিলাম, শেবরাডে দাদাকে খুন করিব। মামবের অধঃপতন হইলে এইরূপই হিতাহিত বিবেচনা গোপ হইয়া থাকে?

রাডে অভ্যস্ত স্মরণান করিলাম। প্রায় তিনটা সাড়ে তিনটার সময় আমি উঠিলাম। একখানা ছোরা লইয়া দাদার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। স্মরণ আমার বিবেকশক্তি অপহরণ করিয়াছিল। মনে পড়ে, সেদিন অন্ধকার রাত্রি, আকাশের এককোণে এক খণ্ড মেঘ নক্ষত্রগুলির ক্ষীণকান্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছিল। অন্ধকারে আমার দেহ আবৃত হইয়াছিল। হায়! কেন আমি তখন সূত্র্যর ছারার আবৃত হইলাম না। দাদার ঘরের কাছে গিয়া প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল। আবার স্মরণ উত্তেজক শক্তিতে সাহস পাষ্টলাম। দরজা খুলিয়া দেখি, দাদা একখানি ব্যাগচন্দ্রের উপর বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে গীতা পাঠ করিতেছেন। আমি আর বিলম্ব না করিয়া বাঘের মত দাদার স্বরূপে আঁকড়াইয়া ধরিলাম এবং তাঁহার বক্ষে

আমূল ছোরা বসাইয়া দিলাম। দাদা একবার বলিলেন, “কেও? নরেশ?—নরেশ?—” আমি ত তাঁর কোন কৃতি করিনি তাই।” সব শেষ! দাদা মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আমি কম্পিতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একেবারে মোহিনীর নিকট পলাইয়া আসিলাম। কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম আমার কোন বন্ধুর সহিত সে অগ্রে পলাইয়াছে। সেই দিন হইতে অতি মুহূর্তে কেমন যন্ত্রণা অক্লান্ত করিতে লাগিলাম। সমস্ত জিনিষ না কেন শূন্যবোধ হইতে লাগিল। আমি সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

একদিন নর্যদার তাঁরে একটা বৃক্ষতলে বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিলাম, আমা-
দের বাড়ীর দেওয়ান মহাশয় ঘাটে নামিতে-
ছেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই চিনিয়া
ফেলিলেন এবং বলিলেন, “কিহে নরেশ
যে? আমি তোমার কত অলুসকান
করেছি, কিন্তু কোথাও পাই নাই। আজ
দেখিতে পাষ্টয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।
তোমার মরীদারী তুমি দেখিবে চল।”

আমি বলিলাম, “সে কি দাওয়ান
মশাই?”

দেওয়ান মহাশয় কহিলেন, “আর তাই,
বোম্বেশ বাবুকে কে খুন করেছে, আমি যখন
সকালবেলা তোমাদের বাড়ীতে যাই, তখন

দেখি যে, তিনি তাঁর ঘরে সুস্থ অবস্থায় নিভ্রা হইল না। কত কথা মনে পড়িল।
পড়ে আছেন। রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে, তখনও তাঁর একটু জ্ঞান আছে। আমি যেতেই তিনি একজন উকিল ডাকতে বলেন। পাড়ার ছ-একটি ভদ্রলোককে ডাকলেম। সকলে এলে তিনি সমস্ত বিষয় তোমার নামে উইল করে দিয়ে গেলেন। আমরা খুশীর নাম জিজ্ঞাসা করলেম। তিনি কেবলমাত্র বোলেন, “আমার আত্মীয়” এই তাঁর শেষ কথা—

আমি জ্ঞানশূন্য! নন্দদার অপর পার্শ্ব বিশাল অরণ্যের দিকে চাহিয়া অ-নি সংজ্ঞা-হীনের মত বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম, “দাওরান মপাই,—আমি সন্ন্যাসী। আর আমার বিষয় সম্পত্তির জরাজনকি? চলুন, সমস্ত সম্পত্তি, প্রেরিত করিয়া আসি।”

দাওরান মহাশয় কোন কথা কহিলেন না। কেবল মাত্র আমাকে একটি চাবি দিয়া কহিলেন, “এই সিন্ধুকের চাবি। যোগেশ! বাবু সুস্থার পুষ্করাঞ্জে আমাকে দিয়ে-ছিলেন।” আমি কহিলাম, “চাবি আপনার নিকটেই থাক্।”

দাওরান মহাশয়ের সহিত আমি আমা-দের গোপালপুরের বাটীতে আসিলাম। যখন বাটীতে প্রবেশ করি, তখন রাত্রি হইয়াছে। আমি আমার ঘরে গিয়া শুইলাম। রাত্রে

অনুতাপিনলে হৃদয় জলিয়া বাইতে লাগিল। কত কাদিলাম—নয়নজলে উপাধান শিক্ত হইল। তাবিতে লাগিলাম,—“দেবতা! হৃদয়ে এত বেহ গোষণ করিয়া কঠিনতার আবরণে কেন ঢাকিয়া রাখিয়াছিলে দেব?—প্রাণ জলিয়া বাইতে লাগিল। সমস্ত কথা মনে পড়িতে লাগিল। দাদার প্রকৃতি গভীর, প্রশান্ত বদন,—প্রকৃত পণ্ডের মত বৌদ্ধিম্ব হাসি হাসি মুখ, সমস্ত মনে হইল। আমি শুইয়া থাকিতে পারিলাম না,—বাহিরে আসিলাম। সেদিন পূর্ণিমা। সমস্ত জগৎ হাসিতেছিল। বিশাল জ্যোৎস্নাভিত আকাশের দিকে একবার চাহিলাম, কিন্তু চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। বোধ হইল, যেন সমস্ত নক্ষত্র আমার দিকে চাহিয়া দীর্ঘকাল হাসিতেছে। আমি মৃতক অবনত কান্না যেন যেনে দাদা আমার প্রহার করির বলেন সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল,—তৎক্ষণাৎ যেন কাহার চিরপরিচিত কোমল করস্পর্শ অঙ্গুলি করিলাম—তখন শুনিতে পাইলাম, “ঠাকুরপো!—রাগীলোকের কথায় রাগ কোরো না, ঠাকুরপো!” আমি যেন উন্মাদ হইতে বসিলাম,—শত বৃন্দিক যেন অঙ্গে দংশন করিতে লাগিল। ক্ষিপ্তের মত দাদার ঘরের দিকে ছুটিলাম। প্রাণ বার বার চাইয়াছে। এত জ্যোৎস্নাতেও জগৎ আঁধার দেখি-

তেছি। ঘরের ঘরের নিকট আসিলাম। কথোপকথন করিয়া একটু জলপান করিয়া বোধ হইল যেন কে মাটিতে পড়িয়া যাতনায় পুনরায় নৌকা খুলিলেন। ছট্‌কট্‌ করিতেছে। আমার সর্বশরীর কাপিতে লাগিল। মাথার চুল ঝাড়া হইয়া উঠিল। আমি উৎকর্ণ হইয়া শব্দ শুনিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে চিরপরিচিত কণ্ঠে দাশী যেন বলিলেন, “নরেশ! আমি ত, তোমার কোন কৃতি করিনি তাই।” আমি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

[ক্রমশঃ।

আকবরের জন্ম ও তৎ-

সাময়িক স্বতান্ত্র্য ।

তেজকেরাহ্ অল-ভকিয়ত্‌ হইতে ।

হিজরী ৯৪৯—১৫০ ।

প্রাতে যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন লোকজন ডাকিয়া রীতিমত লেখাপড়া করিয়া সমস্ত বিষয় দেবজ্ঞ করিতে চেষ্টা করিলাম। ছই চারদিন কোন রকমে সে বাটীতে থাকিয়া সমস্ত সম্পত্তি দেবজ্ঞ করিয়া বাহির হইলাম।

আজ দশ বৎসর হইল, এই সব ঘটনা ঘটয়াছে। আমি এখনও সে সকল ভুলিতে পারি নাই। ইহজীবনে ভুলিতে পারিব কি না সন্দেহ। পুলিশ আমার ঘরিতে চাহে থকক, আমার কোন বাধা নাই—আমার প্রারম্ভিত কি হইবে না।

সন্ন্যাসী বাস্ত্র খুলিয়া একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, “এই দেখুন দাদার উইলের নকল।”

আমি পূর্বদিকে চাহিয়া দেখি, উবার আলোক দেখি দিয়াছে। সন্ন্যাসী কিরৎকাল

৯৪৯ হিজরীতে সম্রাট হুমায়ুন অমর-কোট হুর্গে পরিব্রুজবর্গকে রাখিয়া তাঁতা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিয়দূর আসিয়া পশ্চিমধ্যে রজনীতে পুফরিণীর তীরে বিশ্রামার্থ শিবির সন্নিবেশ করিয়া আছেন, ইতিমধ্যে প্রভাত্যে অমরকোট হইতে আনন্দময় সংবাদ আসিল যে, তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী একপুত্র জন্মিত হইয়াছে। এই শুভ ঘটনা ৯৪৯ হিজরীর শাবন মাসের পৌর্ণমাসী রজনীতে সংঘটিত হয়; তৎক্ষণাৎ সম্রাট প্রহুটীতে পুত্রের নাম—বদর উদ্দীন (যশোর পূর্ণচন্দ্র) মহম্মদ আকবর রাখিলেন। তৎপর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সাষ্টাঙ্গভাবে ভূমিতে

পড়িয়া সর্বশক্তিমান প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। (১)

এই শুভ সংবাদ রাষ্ট্র হইলে যাবতীয় আমির ওমরাও একত্রিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তেজকেরাহর গ্রন্থকার জোহরের জিয়ার যে সমুদয় ধন রহ ছিল, তাহা বাহির করিতে সম্রাট আদেশ করিলে, জোহর দুইশত সাহরুফ (shahr-
khys) নামক রৌপ্য মুদ্রা, একখানি রৌপ্য বলয়, এবং যুগনাভী কস্তুরীপূর্ণ একটা পাত্র আনিয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। প্রথম দ্রব্য দ্বয় যাহার নিকট হইতে লওয়া হইয়াছিল তাহাকে প্রত্যাৰ্পণ করিবার আদেশ হইল। তৎপর একখানি চায়না প্লেটের উপর কস্তুরীর ভাণ্ডটি ভগ্ন করতঃ প্রত্যেক প্রধান কর্মচারীকে উহার কিয়দংশ করিয়া উপহার দিয়া সম্রাট বলিলেন,—আমার পুত্রের

জন্ম উপলক্ষে ইহাট কেবল সকলকে উপহার দিতে পারি। এই কস্তুরীর যুগন্ধে এই কক্ষটি কেমন আঘোদিত হইয়াছে, আশা-
করি, কালে আমার এষ্ট পুত্রের যশঃসৌরভে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইবে।” অতঃপর তুরী ভেরী নিনাদিত হইল, জয়ঢকা গঞ্জিয়া উঠিয়া লগৎবাসীর সমক্ষে এক শুভ সমাচার জ্ঞাপন করিল।

সঙ্কোপাসনা পর আমরা সকলে অমরকোট রাণার সৈন্যশ্রেণী মেকখালি বেগের অধিনায়কত্বে একশত মোগল সৈন্য কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পুষ্করিণীর তীর চটতে বাজা করিয়া পাট্টী অভিযানের পর জান (১) নগরের সমীপবর্তী চটলায়। এখানে অমরকোষের পুষ্কাধিকারী জানীয়েন এবং একজন প্রসিদ্ধ কোসাকের (Cossack) অধীনস্থ

(১) সম্ভবতঃ গ্রন্থকার সময় নির্ণয় করিতে ভুল করিয়াছেন। আকবরের জননী অন্ন বয়সে ১৪৮ হিজরীতে বিবাহিতা হন এবং বিবাহের পর বৎসরেক ইণ্ডাসের নিকটবর্তী স্থানে অভিবাহিত করেন। আকবরের জন্ম রেজাব মাসে হয় এবং তাঁহার উপাধি জেলাল উদ্দীন (খানাবত্তার) ছিল। see prices mah-
ammaden History, voi iii, page 507

(১) টুয়াটসাহেব বলেন,—“আমি যে সকল মানচিত্র দেখিয়াছি, তাগাতে জান বা জোরান jan or jowin নগরের উল্লেখ নাই। কিন্তু আইনী আকবরীতে উল্লিখিত আছে যে, উক্ত স্থান সরকার হাজিরার অন্তর্ভুক্ত এবং বিসুন রাজস্ব প্রদান করিত। আবুল ফজল ঠাণ্ডা উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত ইণ্ডাস তীরে অবস্থিত এবং অতি যনোন্নত স্থান।”

বহুসংখ্যক অঝারোহীসৈন্য কর্তৃক আমাদের পথরোধ হয়। রাণার জাট সৈন্য ও মোগল সেনানীগণ অবিলম্বে বিপক্ষগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতঃ সৈন্য বিনাশ করিয়া হতাবশিষ্টগণকে বিভাঙিত করে এবং যে সকল শত্রু সৈন্য আমাদের হস্তে বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মোগল সেনাবিভাগ হঠাতে পলাতক একজন সৈনিক ছিল, সে মুখমণ্ডলে গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। মীর্জা-কুলী খাঁ তাহাকে সম্রাট সদনে লইয়া গিয়া তুর্কী ভাষায় বলিলেন,—“এই নরাত্ম এক সময় জাঁহাঁপনার অবমাননা করিয়াছিল।” সম্রাট বলেন,—“তাহার উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছে, এখন তাহাকে ছাড়িয়া দাও।” কিন্তু অবশিষ্ট বন্দীগণকে নিহত করিবার আদেশ করিলেন।

এই ঘটনার পর আমরা অগ্রসর হইয়া জান অধিকার করতঃ এক বৃহৎ উদ্যানের শিবির সন্নিবেশ করিলাম। এইস্থানে বহুতর জমীদার আসিয়া সম্রাটের বশ্ততা স্বীকার করেন, সম্রাট প্রথমতঃ চূর্ণাকারে উদ্যানের চতুঃপার্শ্বে পতীর খনন খানা কার্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। এই স্থান হইতে নব-জাত সাহাজাদা ও তদীয় জননীকে আনিতে অমরকোটে লোক প্রেরিত হয়। রমজান মাসের ২০শে তারিখে সাহাজাদা উপনীত হইলে তাহার জন্মের পরক্ৰিশ দিবসে

সম্রাট তাঁহাকে প্রথম আলিঙ্গনে সম্মানিত করেন। (১)

বর্ণনা সৌকার্যার্থে এ স্থলে গত বৎসরের দুই একটা ঘটনার উল্লেখ করিতে হইতেছে। মোগল সৈন্য যে সময় সেওয়ান Sohwan অবরোধ করে, তৎকালে দেখা যায় যে, চূর্ণাভ্যন্তরে একজন সৈনিক এমনভাবে বন্দুক চালাইতেছে যে, স্বপক্ষের কয়েক জন লোক তৎকর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হয়। তদদর্শনে সম্রাট বলিয়াছিলেন,—“আমি আশা করি একদিন এ ব্যক্তিকে হাতে পাইব। সৈনিক পুরুষটা তাহাতে উত্তর করে,—“যে ব্যক্তি আমার মস্তকের নিয় হইতে তওবারী লইয়াছে এবং কোষ হইতে তাহা অর্দ্ধ নিকাশিত করিয়াছে, আমার ইচ্ছা তাহাকে ধরিতে পারিব।” মোগল সৈন্য যখন জান অধিকার করে, ঘটনাক্রমে উক্ত দুইব্যক্তিই ওখার উপস্থিত ছিল এবং এক মদের দোকানে উভয়ে মিলিত হইয়া স্ব স্ব বীরত্বের বড়াই করিতেছিল। তাহাদের কথোপকথন শ্রুতিগোচর হওয়ার তাহারা ধৃত

(৩) এই তারিখ যখন পূর্বোন্নিষিত তারিখের সহিত এক্য হইতেছে, তখন হইতে পারে আকবরনামার আবুল ফজলই ভুল করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ভ্রম অসম্ভব রকমের।

হইয়া সম্রাট সমীপে আনীত হয় । সম্রাট বিচার করিয়া বন্দুকধারীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করেন, কিন্তু চোরটিকে ক্ষমা করতঃ মূল্যবান খেলাৎ প্রদান করিলেন ।

জানৈ অবস্থান কালে দেশের যাবতীয় প্রধান ব্যক্তিকে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করণ উদ্দেশ্যে আদেশ প্রচারিত হয় । তদমুসারে সুদ্ধ (sudha) সিমেক্ (symech), কারে রাজনাবর্গ এবং বিকারের পূর্বতন সর্দার ও জামের (jam) বর্তমান অধিপতি সম্রাটের সর্ষর্জন করেন, এইখানে অনূন পোনার ষোল হাজার অথারোহী সৈন্য সংগৃহীত হয় ।

এই সময় সাহ হোসেন টাট্টা হইতে বহির্গত হইয়া জানের আট মাইল দূরে ইণ্ডাস্ নদীতীরে আড্ডা গাড়েন । একদা সন্ধ্যার সময়—রমজান ঈদের মধ্যে সম্রাট গাঠ মুখে একটু জল দিয়াছেন, এমন সময় সংগার আইসে যে, তারসবেগ সৈন্যাদল হইতে পলায়ন করিয়া তাহার শত্রু হোসেনের সহিত মিলিত হইয়াছে । এই সংবাদে সম্রাট অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া বলিলেন,—“উহার মরণ সন্নিকট দেখিতেছি ।” প্রকৃতই অদ্ভূতের তীক্ষ্ণবজ্র অতি সত্ত্বর তাহার উপর আপতিত হইল । হোসেনের সহিত মিলিত হইলে হোসেন তাহাকে একটি ক্রীতদাস উপহার প্রদান করেন । একদিন এই দাসের কোন অপ-

রাধে তারস্ বেগ তাহার নাসিকাচ্ছেদন করেন । উক্ত ঘটনার তিন দিন পরে দাস তাহাকে নির্দর রূপে নিহত করিয়া নাসিকাচ্ছেদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে । এই হত্যাসংবাদ বাট্ট হইলে যোগল অমুচরণ প্রচারিত করিল,—“আমাদের সম্রাট দৈবজ্ঞ পুরুষ, “ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই যেহেতু আমাদের কোরাণে আছে,—“সম্রাটগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি ।” পূর্বোক্ত ঘটনা সম্রাট হমায়নের প্রকৃত রাজচক্রবর্তীত্বের প্রমাণ ।

এই সময় সাহাচোসেন টাট্টা হইতে অমরকোটের রাণার নিকট পরে সম্রাটের নিকট দূত পাঠান । তৎপর রাণাকে স্বপক্ষ-ভুক্ত করিবার আশায়, একটি সন্ধানদায়ী পরিচ্ছদ, একখানি মূল্যবান ছোরা এবং অপর কতিপয় সামগ্রী তাঁতাকে উপহার পাঠাইয়াছেন । রাণা অবিলম্বে ঐ সমস্ত দ্রব্য সম্রাটকে দেখাইলে সম্রাট বলেন যে, প্রাপ্তক দ্রব্যনিচয় একটি কুকুরের পুটে চাপাইয়া সাহ হোসেনের নিকট ফেরত পাঠান হোক । তদনুসরণই করা হইল, সাহহোসেন অতিশয় অপ্রতিভ হইল ।

পূর্বোক্ত ঘটনার পর খোয়াজপাঞ্জী নামক একজন যোগল সরদারের সহিত রাণার কণহ হয়, তাহাতে রাণা নিজের

সমস্ত অকুটরগণসহ মোগল শিবির ত্যাগ করিয়া বলিয়া বান,—“মোগলগণের সাহায্য করে আমি যে প্রয়াস পাইয়াছি তাহা সমস্তই বুঝা হইল।” রাণার দেখাদেখি অপরাপর জমীদারবৃন্দও আমাদিগকে অদৃষ্টের উপর ফেলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরদিবস মোনায়েম বেগও পলাইয়া গিয়া সাহ হোসেনকে জানাইল যে, সম্রাট এখন একাকী আছেন এবং তাঁদের শিবির একটা খোলা সমতল ক্ষেত্রে, তথা হইতে তাঁহাকে সহজেই পরাজিত ও গুপ্ত করা যাইবে। সৌভাগ্য বশতঃ পূর্বাঙ্কেই এই সংবাদ সম্রাটের কর্ণে পৌছাইল। তিনি শিবিরের চতুঃপার্শ্বে গভীর খাদ খননের আদেশ করেন, এমন কি সম্রাট স্বয়ং যষ্টিহস্তে করিয়া খাদ খননের স্থান নির্দেশ করিয়া দেন। এমনি ক্রম গতিতে খননের কার্য্য হয় যে, তিন দিবসেই পরিখা পরিসমাপ্ত হইল। এমতে সাহহোসেন আক্রমণার্থে আগমন করতঃ শিবির সম্পূর্ণ সুরক্ষিত দেখিয়া মোনায়েম বেগকে প্রবেশ করা জন্য ভয়ঙ্কর করিতে লাগিলেন। যাহাহোক্ করেকটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে গার্ড বজে (gird baz) নামক একজন মোগল সরদার নিহত হইয়াছিল।

পূর্বাঙ্ক বুদ্ধাহবের মধ্যে সংবাদ আসিল যে, কনোজ যুদ্ধ হইতে পদাতক বৈরাগবেগ

(খাঁ) * সম্রাটের সহিত মিলিত হইতে গুজর হইতে আগমন করিতেছেন। এই শুভ সংবাদ প্রাপ্তে সম্রাট তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত কতিপয় সরদার আগে পাঠাইলেন। অবিলম্বেই তিনি উপস্থিত হইয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন এবং সম্রাটও তাঁহার জ্ঞান একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

পরদিন রজনীতে সাহ হোসেন মোগল পরিখার নিকটবর্তী হইয়া তাঁহার রণ-ভেদী বাজাইলেন, বৈরাগবেগ ও অপরাপর মোগল সরদার তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান জন্ত বাহির হন, কিন্তু সম্রাট বৈরাগকে ফিরাইয়া আনিয়া রামেনবেগ ও অন্তর সরদারগণকে শত্রুর অহ-সরণ করিতে আদেশ করেন। তাহার শত্রু শিবিরের নিকটস্থ হইলে, রামেনবেগ ও বিপক্ষীয় বাবর কুলির সহিত বন্দযুদ্ধ আরম্ভ হয়। রামেন বিপক্ষের অশ্বটি নিহত করেন, কিন্তু একজন পদাতক সৈন্য এমনিভাবে তাঁহার অশ্বের উরুদেশ ছেদন করে যে, অশ্বটি তাঁহার প্রভুকে শিবিরে আনিয়াই প্রাণত্যাগ করে। “তাপ্তক্” (Tupchak) জাতীয় অশ্বের ইহাষ্ট নাকি অদ্বিত ক্ষমতা বা গুণ।

* পরে সাহাজাদা আকবরের রক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত হন। see Dows Hindieston

এই ঘটনাবসানে সম্রাট দেক আলি-বেগকে সেকো (chekaw) নামক স্থানে ঘাইরা খাতিশস্ত সরবরাহ করিবার আদেশ করেন। সেক আলি বখারীতি কর্তব্য পালন করিতে থাকে, কিন্তু সাহেহোসেন এতৎসংবাদ অবগত হইয়া রসদ সংগ্রহের পথরোধ করিবার নিমিত্ত শক্তিশালী এক সেনাদল প্রেরণ করেন। সম্রাটও আলির সেনাদল বন্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে তেহার সুলতানের অনীন্দের বাননী তপায় প্রেরণ করেন। সেক আলি ইহাতে অপমান জ্ঞান করিয়া তেহাকে ফিরিয়া ঘাইবার আদেশ করিবার জন্য সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করেন। এত ঘটনায় ছই সরদারের কিছু বনাস্তর উপস্থিত হয়।

সম্রাট হুমায়ুন এত ভাবে শিবির অবরোধ থাকার অতিশয় বিরক্ত হইয়া একদা বলিলেন,—“এতবার সাহেহোসেন শিবিরের নিকট আসিলে আমি নিজে যাউরা তাহাকে তিরস্কার করিব” পরে তাঁহার অন্তশস্ত্র ও অবশেষে রাণিবার আদেশ করিলেন। পবিত্র রমজান মাস হইলেও আমরা পরদিন একটা যুদ্ধ-কাণ্ডের আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। রজনীতে নদীর তীর হইতে একটা লোক আসিয়া বলিল—“কতকগুলি লোক নদীর অপর তীরে নৌকা অবস্থান করিতেছে।” তাহারাকে এবং কি জন্ত নৌকা অবস্থান করিতেছে, সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলে

সে বলিল,—“তেহার সুলতান তাহার যথেষ্ট আছে।” তজ্জবণে সম্রাট বলিলেন,—“তৎবানের আশীর্বাদে যেন সৎসংবাদ থাকে।” তৎক্ষণাৎ তেহারকে আনিতে একখানি নৌকা প্রেরিত হইল, তেহার পার হইয়া আসিয়া জানাইল যে, আমাদের সেনাদল আক্রান্ত হইয়াছিল, সেক আলি নিহত হইয়াছেন এবং তেহার অভি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। পর দিবস প্রাতঃকালে সম্রাট-সহ বৃদ্ধেয়াইবেন তির করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, সমস্ত রাজ্যেই তাঁহার আর নিজা হইল না।

এই সময় দৈনন্দন পুই চওয়ার সাহেহোসেনও বৃদ্ধের সংকল্প আঁটিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যে মোহাম্মদ বিনয়াজ নামক একজন সরদার তাঁহাকে গোপনে সংবাদ দেয় যে, পর দিবস প্রত্যুষে সম্রাট তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। সরদার আরো বলেন যে, মার্মারূপ বিপদ্রপাতে সম্রাট এখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন, এসময় তাঁহার সহিত আপোষ করা সহ হোসেনের কর্তব্য।

এত উপদেশাত্মকীয় করেক দিবস পর সাহেহোসেন কতকগুলি সামান্ত দ্রব্য উপহার সহ বাবার কুলীকে হুমায়ুনের নিকট পাঠাইয়া তাহার অতীত কার্যাবলীর নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তৎসঙ্গে তিনি আরো বলিয়া

পাঠান বে কেবল লজ্জা বশতঃই তিনি নিজে বাইরা সন্মুখকে সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। সম্রাট দক্ষিণে দূতকে, রাসেন বেগমু তাহার সহিত যে ঘন বৃক্ষ লম্বাটত হয়, তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে বলিলেন। দূত বাবর কুলী বলিলেন যে, রাসেন বেগম বর্ষার সাহায্যে তাঁহাকে অন্ধ হইতে নষ্টিতে বাধ্য করেন কিন্তু তাঁহার আর কোন ক্ষতি করেন নাই কিন্তু অপর কতিপয় ব্যক্তি রাসেনের অশ্রুটি আহত করে। সম্রাট শুৎপর রাসেন বেগমকে ডাকাইরা পরাম্পর আলিঙ্গন করিতে বলিলেন। অতঃপর অবিলম্বে তিনি সিদ্ধ প্রদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন এই আশাস দিয়া দূতকে বিদায় করিলেন।

এই খামেই ৯৪২ হিজরীর (১৫৪২ খৃষ্টাব্দ) বৃত্তান্ত শেষ হইল। আগামীবারে আকবরের জন্মের দ্বিতীয় বর্ষের ঘটনাবলী বিবৃত হইবে।

ঐত্বজ্ঞানসর সার ল।

টাণ্ডার একরাত্রি ।

মির্জাপুরের অদূর ৯ নাইল দক্ষিণ-পূর্বে-বিজা শৈল শ্রেণীর উপর দেওরি নামে এক ক্ষুদ্র পল্লী আছে। পত্ৰ বৈশাখ মাসের ২০ এ তারিখে কোম সরকারি কাজের বস্ত্র এই

স্থানে গিয়াছিলাম। ভোর ৬টার সময় মির্জাপুর হইতে একা করিয়া দেওরি বাজা করি। দেওরি অবধি একার বাওয়া বড়ই কষ্টকর। অস্বাভাবিক তত অভ্যাস নাই সুতরাং আমাকে একা করিয়াই যাইতে হইয়াছিল। ৩ নাইল পাকা রাস্তা (metolled road) বরাবর দক্ষিণে মির্জাপুর অঞ্চলপুর রাস্তা (Mirapur Jabbalpur Road) দিয়া আসিয়া ইটোৱা-টাণ্ডা-সিব'সর (Itowa Tanda Sivsai) রাস্তা ধরিলাম। ২ নাইল কাঁচা রাস্তার আসিয়া বিজা শৈল শ্রেণীর তলদেশে উপস্থিত হইলাম। এইখানে পাহাড়ে উঠিতে হইবে। বাধান রাস্তা আছে। একা পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। পাহাড়ের উচ্চতা অধিক নয়। ৫১৬ মিনিটে উপরে উঠিলাম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম। চতুর্দিকে ছোট বড় প্রান্তর খণ্ড ছড়ান রহিয়াছে দেখিয়া বোধ হয় যেন বৃক্ষের পর বীরগণ জগদ্বির জগৎ জীবন উৎসর্গ করিয়া চিরনিদ্রায় নিমজ্জিত। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের বোপ যেন প্রভুত্ব অধিকার ভার প্রভুর পার্শ্বে রান দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান। ১ নাইল পাহাড়ের মনোরম দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে টোড়ে কা দরি' বা টাণ্ড ফলের (Tanda Fall) নিকট উপস্থিত হইলাম। এইখানে একা হইতে নামিয়া কল দেখিবার ইচ্ছা হইল। ৩টি নালা একত্র মিলিয়া প্রায় ৭০ ফিট উপর হইতে বল পড়ি-

তেছে। বর্ষার সময় এখানকার দৃষ্ট বড় বনোন্মুখকর। এই সময়ে এত ভীষণ বেগে জল পড়ে যে নিকটে ২ জনে কথাবার্তা কহিলেও কিছুই শোনা যায় না, এবং এই জলের শব্দ ২৩ মাইল দূর হইতে শোনা যায়। কলের নিকটেই মির্জাপুরের সদাগর সিউদিন ওমারের বাঙ্গালা। বাঙ্গালার উপর হইতে কলের সৌন্দর্য বড়ই সুন্দর দেখায়। বর্ষার সময়ে অনেকে এই ফল দেখিতে আসেন। ফল অবশি একায় আসা যায়। মির্জাপুর হইতে যাতায়াতের একা ভাড়া এক টাকা।

এখান হইতে দেওরি প্রায় ২ মাইল, রাস্তা বড়ই দুর্গম। সংস্কারভাবে একা যাতায়াতের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তার অনতিদূরে রাখালেরা দেখু চরাইতেছে। অদূরে হরিণ সকল দলে দলে গো বৎসগণের সহিত মনের সুখে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। আমার একা তাহাদের ২০২৫ হাত দূর দিয়া ‘বাচ্চি বাবো’ ভাবে চলিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টিপাতও নাই। এই নিরীহ প্রাণী দিগকে বধ করিয়া অনেকে শিকার সুখ উপলব্ধি করেন। ইহাদের দৃষ্ট বড়ই ভীষণ। শিকারি দেখিলেই ইহারা চিনিতে পারে এবং সাধ্যপক্ষে তাহার জি সিমানার আসে না। সমস্ত দিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া অনেককে রক্ত হস্তে ফিরিতে দেখিয়াছি, এখান হইতে আরও পূর্বে নিরসিতে বাঘ তালুক এবং

নীলগাই দেখিতে পাওয়া যায়। নীলগাই সকল কখনও দলহাড়া হইয়া বিচরণ করেন। এক এক দলে ৫০৬০ টি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা মানুষ দেখিলে আক্রমণ করে।

প্রায় ১০ টার সময় দেওরিতে উপস্থিত হইলাম। দেওরি একটি ক্ষুদ্র পল্লী। পল্লী-বাসী সকলেই কৃষিজীবী। একা ও তল্পপরি এক বাঙ্গালি বাবু দেখিয়া পল্লীর বালক বালিকা ‘বাঙ্গালি বাবু সেলাম’ বলিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এতটা রাস্তা পাহাড়ে একার ‘অসুবিধা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। চাপরাসিকে ‘চা’ তৈয়ার করিতে বলিলাম। চায়ের সরঞ্জাম লক্ষ্যই ছিল।

বৈশাখ মাসের রোজ, সূর্যোদয়ে যেন অধিবর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁরুয় তিতর অসহ্য গরম। বাহিরে ‘সু’ চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। পল্লীর এক অংগাপন কৃষি তাহার কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে অছরোধ করিল। নোকটি তাহার বহির্কাটিতে আনাকে বিশ্রাম করিতে দিল এবং আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। আমার সঙ্গে খাবার আছে বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলাম। চায়ের ভক্ত হৃৎকের কথা বলিতেই সেৱ দুই হৃৎ আনিয়া তাকির করিল। এখানে বাজার নাই। আবশ্যকীয় জিনিসপত্র মির্জাপুর হইতে আনিতে হয়। ইহাদের মধ্যে ধান,

চাল তরিতরকারি সমস্তই হয়, মাসে একবার সময়ে গিয়া এরোজনীর জব্যাদি আনিয়া থাকে।

রৌদ্রের তেজ প্রশমিত হইলে সরকারি কাজে বাহির হইলাম। কাজ কর্ত্ত শেষ করিয়া প্রায় ৬টার সময় ফিরিয়া আসিলাম। ধর্মদেবী ধীরে ধীরে তিমিরাবৃত্তা হইতে ছিলেন। অন্ধকারে একা লইয়া বাইতে সমুচ কষ্ট হইবে ভাবিয়া, একাওরালাকে টাণ্ডা গিয়া আমার অস্ত্র অপেক্ষা করিতে বলিলাম। কিছু অলসোগ করিয়া প্রায় ৭টার সময় ২জন চাপরাসি সঙ্গে লইয়া রওনা হইলাম। অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে টাণ্ডায় আসিয়া দেখি একা এখনও আসে নাই। আরও অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যখন একার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, তখন একার আশা ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজে মির্জাপুর অভিযুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। টাণ্ডা ছাড়িয়া প্রায় অর্দ্ধকোশ আসিয়াছি, এমন সময়ে আকাশে একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ দেখা গেল। বেগিতে দেখিতে ঐ ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। প্রবলবেগে ঝটিকা উখিত হইল, চারিদিক কেবল ধূলিময়, কিছুই দেখা যায় না। নাটক বৃথে ধূলি প্রবেশ করিয়া খাস রোদের উপক্রম করিল। বৃথে ক্রমাল দিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বর্ধিত হইতে চলিল। আকাশে রহিয়া রহিয়া বিদ্যুত চমকিতে লাগিল, সঙ্গে

সঙ্গে কড় কড় শব্দে মেঘের ভীম গর্জনে গ্রাম আকুল হইয়া উঠিল। নিকটে বড় বৃক্ষও নাট দ্যে তাহার তলে আশ্রয় লই। নিরাশ্রয় ভাবে বসিয়া থাকা কোন ক্রমেই যুক্তি-সঙ্গত নয় দেখিয়া টাণ্ডার বাজলার ফিরিতে মনস্থ করিলাম। চারিদিক এত অন্ধকার যে ছই হাত দূরের বস্তু দেখা যায় না। একবার রাস্তা ছাড়িয়া ত্রিপথে বাইলে সমস্ত রাজি পাহাড়ে ঘুরিতে হইবে বুঝিলাম। কিন্তু একপ অনাবৃত্ত স্থানে বসিয়া থাকাও নিরাপদ নহে। ছই এক কোঁটা বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল দেখিয়া আর কাল বিলম্ব না করিয়া উঠিলাম। কিছু দূর আসিয়াছি এমন সময়ে ‘কোন হার’ চিৎকারে চমকিয়া উঠিলাম। এই স্থানে প্রায়ই চুর ডাকাতি হয় শুনিয়াছিলাম সুতরাং ব্যাপার কি জানিবার জন্য চাপরাসিদের ডাকিলাম। শুনিলাম জন কয়েক উটচালক আমাদের মত বিপদে পড়িয়া পথহার্য পথিকের ভায় আশ্রয়গ্রহণস্থানে এদিক ওদিক ঘুরিতেছে।

বিদ্যাতের ক্ষণিক আলোতে অতি কষ্টে টাণ্ডার বাজলায় পৌছিলাম। এই দুর্ব্ব্যোপে আশ্রয়লাভ করিয়া সিউদন ওয়ারকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বাজলায় উঠিলাম। বাজলা বন্ধ জন প্রাণীও নাই। বৃষ্টিতে লামা কাপড় সমগ্রই ভিজিয়া গিয়াছিল। আমরা তিনজনে নিরশু উপবাসী হইয়া ঐ অবস্থায়

সমস্ত রাজি বারিঙার পড়িয়া রহিলাম । ঘন
ঘন মেঘের গর্জনে, চোর ডাকাতিও বাধেব
করে নিজে হইল না । অত্ৰি প্রত্যবে উঠিয়া
পদতলে মির্জাপুর কিরিয়া আসিলাম । এক
ঘণ্টা পরে আমার একা আসিয়া হাজির ।
তুনিলাম বড়ে একা উন্টাইয়া দিয়াছিল ।
বেচারি সমস্ত রাজি পাহাড়ে অনাবৃত্ত ভাবে
পড়িয়াছিল ।

শ্রীম্মরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

লালগোলা অধীশ্বরীর স্বর্গ গমনোপলক্ষে শোকাক্র ।

(১)

প্রান্তরে বহিছে নীর দামিনীদমক স্থির
নীরব বিহব তান এ বিশ্ব অঁপার ।
চিরকুট রবি শশী পাণ্ডুবর্ণ কৌণ রশ্মি
অনিল অনলভারে রোদনের ধার ॥
চমকে পথিক ছেরি অশনি-চপলা ।
উন্মদা প্রকৃতি আজি তিমির-মেখলা ॥

(২)

তমাচ্ছন্ন লালগোলা বহিরা দারুণ আঁ
নয়নে বরিষে অশ্রু মলিন বদনে ।
মাতৃহারা প্রাণাগণ মা বিহনে শূন্যমন
কে আর বুচাবে বাধা প্রবোধ ঘটনে ॥

লালগোলা অধীশ্বরী ! করুণার ধনি !
তোমার বিহনে বাগো ভাবনী যেদিনী ॥

(৩)

তুমি মাগো গুণাবতী ধরায় আদর্শ সতী
তোমা সম ভাগাবতী কে আর এমন ।
কে পার এমন পতি ধর্মোৎসাহী মহামতি
জায়বান শুদ্ধশীল—দেখিনি তেমন !
প্রশান্ত উদার চিত্ত সাধুকায়ো রত ।
জ্বিলোকের শুণ যত চরণে প্রণত ॥

(৪)

কুত্র গ্রামী পণ্ডিতের নরবর সকাভরে
মুক্তহস্তে দানে সদা আছেন নিরন্তর ।
কৌড়াভূমি শাস্ত্রাগার সাধারণ উপকার
এ সকল কক্ষে বীর যাপন নিরন্তর ॥
তেমন দেবতা পতি যেই নারী পার,
সাধক রমণী জন্ম তাহার ধরায় !

(৫)

তুমি লক্ষ্মী স্বরূপিণী দীন অনাথ জননী
কাতরা সঞ্জন তরে এমন কে হবে !
পতির আদর মাখ পতিমুষ্টি হৃদে রাখি
ধীরে ধীরে পতিকোলে মুদিলে নীরবে !
শুনেচি শাস্ত্রের বাণী ভাগ্যে রাজরাণী ।
ভাগ্যে পার পতিকোলে মরণ রমণী ॥

(৬)

আমরা অনাথ সন্ত কাদিব মা অবিরত
কে আর মুচাবে জল বলনা বতনে ।
অন্নপূর্ণা করে তুমি উজগিলে বিধকুমি

হয়! নাহা বাৎসল্যের উজ্জল বরণে !
কপে শুধে ছিলে মাগো মুনীন্দ্র মোহিনী !
সরল পবিত্র ছবি বিখ্যিতামিনী ॥

(৭)

যুগাও যুগাও মাগো আর কত নাহি জেগো
শ্রান্ত ক্লান্ত এবে তুমি হরেছ ধরায় ।
ছাড়ি এই মরবাস হাসিয়া শান্তির হাস
বাও মাগো ধীরে ধীরে জিম্বি যথায় ।
সেখা নাই মরীচিকা কান্তর কলোয় ।
বিলাস শান্তির সহ মারুত তিলোয় ॥

(৮)

বাও মা সে পুতখাম বেইখানে অবিরাম
দেবদুত্তে করে গান সতীর মহিমা ।
বেইখানে দময়ন্তী সীতা, পতিব্রতা, সতী,
বিহরে যথায় নাই আনন্দের সীমা ।
পাপ নাই শোক নাই শান্তির নিলয় ।
পবিত্রতা অমৃতের চির উৎসময় ॥

শ্রীকৃষ্ণদেব সেন ।

সন্তোষাত-কুসুম ।

(১)

কে বলেরে এ সংসারে আছে সুখলেশ ?
হুঃখে ভরা খরাতল,
দুরিতেছে কর্কশল ;
কাদামিতে বিকলভাবে অশান্তি অশেষ ॥

(২)

হের 'ওই' লভিকার একটি কুসুম ।
নিরুপমা, শোভাধার,
সুখ শান্তি মূল বার ;
যাহে ছিল লভিকাটি সুখেতে বিজয় ॥

(৩)

নিদর হৃদয় কাল অকালে সে ধন ।
কাদাইয়া অভাগিনী,
ভাসাল নয়ন-নীরে ;
দিল না সুখেতে কাল করিতে হরণ ॥

(৪)

কাঁকর গণিছে বুঝি হেরিয়া আঁধার ।
যে তরু আশ্রয় করি,
আছে দিবা বিভাবরি ;
তার(ও) প্রিয় সন্ধ্যাপ মানিছে না আর ॥

(৫)

আর কি দিবে না বিধে ! ঐ লভিকারে ।
নয়ন-আনন্দ যায়,
পুনঃ সুখ পাবে হার ;
এমন একটি আর চাক কুসুমে ॥

(৬)

দিবে যদি তবে কেন লইলে কাড়িয়া ।
দিরাহিলে যে রতন,
যাহে হরষিত মন ;
ছিল ঐ লভিকাটি স্মার ভাবিয়া ॥

(৭)

দিবে না দিবে না যদি দিবে না তাহার ।
কি ল'রে কেমনে তবে,
বলনা রহিবে তবে ;
হায় ! তবে লতিকার কি হবে উপার ?

(৮)

মেবে যদি কেড়ে তার কুহুম রতন ।
কে তোমার সেখেছিল,
কে দিতে কহিয়া ছিল ;
আনন্দ-আননি হেন করিয়া বতন ?

(৯)

লতিকার দীর্ঘশ্বাস কে শুনে শ্রবণে ।
বার্ষিক ধরাবাসী,
ভাবিছে একাকী বসি ;
কোথা পাবে নিরুপমা কুহুম রতনে ॥

(১০)

কে তার বলিয়া দিবে হেন কে কুবনে ।
উদ্ভ্রান্ত পরাণে হার,
পুছে অস্ত্র লতিকার ,
কোথা পাবে নিরুপমা কুহুম রতনে ॥

(১১)

বিবাহি জনেরে পুনঃ পুছে সনিরণে ।
সবার জীবন কুনি,
বল রে সর্গজগারী ;
কোথা পাবে নিরুপমা কুহুমের তলে ॥

(১২)

বল রে নিষ্ঠুর বিধি বল রে কেমনে ।
হার রে হারিণ ধন,
সনে, হবে দরশন ;
কোথা পাবে নিরুপমা কুহুম রতনে ॥

(১৩)

পাইবে না অত্যাগিনী শতেক বতনে ।
হরেছে নির্দির কালে,
নাহি আর মহীতলে ;
কোথা পাবে নিরুপমা কুহুম রতনে ॥
ঐহলিয়াররণ মজুমদার ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

এবাহ—যাযে প্রবাহের দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হইল, আলকাল বাবতীর বাসিক পত্রের মধ্যে এবাহকেই আমরা সকল শ্রেণীর পাঠোপযোগী বাসিক পত্র বলিয়া গণ্য করিতে পারি । এবার সম্পাদক মহাশয়ের প্রবন্ধ কয়টিই বেশ সুপাঠ্য, তন্মধ্যে তাঁহার “বন্দোব” উপভাস বেশ সুপাঠ্য হইতেছে । আমরা ভিন্নকালই দাবোদর বাবুর সুন্দর লেখনী-নিঃসৃত শিক্ষাপ্রদ উপভাসের বিশেষ পক্ষ-পাতী । তাবা ও ব্যাকরণ বেশ চমিক্তেছে, নারায়ণ বাবুর গল্প পাঠে আমরা এবার ভাদুল ঐতিহ্যেতে পুরিলাম না । অপরাপর প্রবন্ধ-গুলির লেখা যথ্য হয় নাই ।

অন্ধুর, মাথ ঘনম সংখ্যা। পত্রিকা-
খানির এখন সংখ্যা আমরা পড়িরাছি।
সুবিধাও পড়িত শ্রীযুক্ত কালীর বেদান্ত-
বাগীশ মহাশয় ইহার সম্পাদক পদে বরিত
হইরাছেন। তজ্জন্ত আশা করা যায় এ অন্ধুর
হইতে যে বৃক্ষের উৎপত্তি হইবে, তাহাতে
স্বকলমে আশা অবশ্যস্তার্য। পাতনিকা ও
সঙ্করের "দেবদান ও পিতৃদান" সম্পূর্ণ না
হইলেও লেখকের কৃতিত্বের পরিচায়ক।
ঐশ্বরী মগেন্দ্রবালা সঙ্করতীর সূচনা পদাটী
বেশ হইরছে, এতদ্ব্যতীত গল্পটী বেশ ভাল
লাগিল। বাঙ্গালা ভাষার "অদ্বৈতবাদ খণ্ডন"
এবং কটীতে অনেক আনিবার বিষয় আছে।
বজ্রেশ্বর বাবুর "ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য"
বেশ বুড়িমত্তার সহিত পরিচালিত হইতেছে।
সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত বজ্রেশ্বর বাবুর
এবং বহুদিন পাঠে বতবুর আনিতে পারা
যায়—তাহাতে পত্রিকাখানি জনসমাজে
আদরশীল হইবে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন
কামনা করি।

বাংলা—মানিকপত্র আমরা পাইরাছি।
ইহাতে কতকগুলি সুন্দর এবং কবিতা
আছে, তদ্ব্যতীত অধিকাংশ এবং পূর্ণ-
প্রকাশিতের পর চলিয়া আসিতেছে সুতরাং
এবং কগুলির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারা
গেল না। "হিংস্রের পরমাধুর্বাদ" এবং কটী
বেশ লাগিল; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার দর্শন

শাস্ত্রের চিরকাল যে অসুবিধা আছে, তাহার
তো কোনও প্রতীকার দেখিলাম না। তাহা
আরও সরল হইলে বড়ই ভাল হইত। "বিধু-
মুখীচ্ছন্দ" আমরা পক্ষপাতী নহি। আমা-
দের চক্ষে বিধুমুখীচ্ছন্দ যেন বাঙ্গালা সাহি-
ত্যের যথেষ্টাচার বলিয়া প্রতীয়মান হয়।
অত্যাভূত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি লাগিল ভাল।

প্রদীপ।—প্রদীপের আলোকরশ্মি ছুটি-
রাছে ভাল। অনেকগুলি প্রবন্ধ পূর্ণ প্রকা-
শিতের পর, আমরা সমস্ত সংখ্যা পাই নাই,
সেই জন্য প্রবন্ধগুলির সমালোচনা করিতে
পারিলাম না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি
যে প্রদীপের অধিকাংশ কবিতা ও প্রবন্ধগুলি
সুন্দর ও সমরোপযোগী।

সুদেশী।—১ম, ২য় ও তৃতীয় সংখ্যা
পাইরাছি। কাগজখানি সুচারুরূপে চালিত
হইতেছে। প্রবন্ধগুলি সমরোপযোগী এবং
সুন্দর; বিশেষতঃ অধিকাংশই কাজের কথা।
আশা করি এরূপ ধরণের পত্রিকা আমাদের
দেশের মহত্বপূর্ণ সাধন করিবে। বড়ই
সুখের বিষয় যে ইহাতে একটীও বাজে প্রবন্ধ
নাই কিম্বা "ক'বঠা-কটকের" ছড়াছড়ি নাই।

সুজ্ঞান-সংগতি তৈল
মৌগন্ধমুক্ত কেশবর্ধক ও
মাবতীয় শিরোরোগ নাশক
মূল্য ৪- আনা মাত্র মাত্র ৮-।
বিজ্ঞানদাস এণ্ড
৬৬, নং নিম্নগোদাঘীর সেন্ট্রাল কলিকতা

আলোচনা।

“মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।”

মবম বর্ষ। } 'ফাল্গুন ১৩১২। } একাদশ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিশ্ববিমোচন উপহার—আগামী ১৩১৩ সালের শুভ বৈশাখ হইতে “আলোচনা” দশম বর্ষ আরম্ভ হইবে। আমরা আগামী বর্ষে আলোচনার সমধিক উন্নতি করিতে প্রাণপণ করিব এবং গ্রাহকবর্গকে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা পূর্ণ ৪ খানি উপাদেয় পুস্তক উপহার দিবার মনস্থ করিয়াছি (১) “বঙ্গশক্তি” স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হোমেন্দ্ৰনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণের সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সংগ্ৰহ, (২) “লহরী” স্ত্রী পাঠ্য মনো-মুগ্ধকর কুহু কুহু গল্পের সমষ্টি (৩) বিপন্ন ব্যারিটর (৪) কাটামুণ্ড, শেষের এই চতুর্থখানি ভীষণ রক্ত-পূর্ণ ডিটেক্টিভ উপন্যাস। পুস্তকগুলি পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, ডিটেক্টিভের অদ্ভুত কোনল পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেব না করিয়া

থাকিতে পারিবেন না। কেবলমাত্র ১৪-টাকা লইয়া এক বৎসর আলোচনা ও উক্ত ৪ খানি পুস্তক প্রদান করিব। অত্যন্ত ব্যয় নিছুটে লাগিবে না। আমরা বৈশাখ মাসের মধ্যে সকলের নামে প্রথম সংখ্যা “আলোচনা” ও উক্ত ৪ খানি স্মরণ্য পুস্তক ভিঃ পিঃ পাঠাইব। যাচাদের আপত্তি থাকে এই সংখ্যা প্রাপ্তিমাত্র জানাইয়া চিরবাসিত করিবেন।

চাণ্ডা মিউনিসিপ্যালিটি।—এট মিউনিসিপ্যালিটির আর বড় কম নহে, তথাপি আজ ‘কম্বলবস হটল’ ঘোষণা করিয়া দেওয়া চইরাছে যে, উক্ত মিউনিসিপ্যালিটি সহরে ভোগ্য পদ্বত করিবার জন্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা কর্ত্ত করিবেন, যদি কাহার আপত্তি থাকে, তাহা চটলে তাহা কর্ত্তপক্ষের কর্ত্তপোতের করিতে বলিয়াছেন। এ ঘোষণাব্যতির অর্থ আমরা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম

না। প্রজা সাধারণ আপত্তি করিলেই কি রক্ষিত হইবে? আর মিউনিসিপ্যালিটির এক আর সবচেয়ে দেরি কেন ধরিতে হয়, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দরিদ্র প্রজাগণকে আর কত দায়ে লজ্জিত করিতে হইবে?—এই ত সে দিন চেয়ারম্যান মহোদয় জেলা পরিদর্শন করিবার জন্য প্রজাবর্গের শোণিত স্বরূপ অল্প অল্প অর্থ ব্যয়ে একখানি “মটরকার” খরিদ করিলেন। এ সময় ত সাধারণ প্রজাবর্গের মতামতের প্রতি লক্ষ্য করা হয় নাই। পূর্বে যে সকল মহামুভব চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যালিটির কার্য করিতেন, তাহারা অথবা অধ্যয়নের সাহায্যেই বাস্তবী কার্য সমাধা করিতেন। দরিদ্র প্রজাবর্গের রক্ত-রঞ্জিত অর্থের তাহারা অপব্যয় করিতেন না। চেয়ারম্যান সাহেবের ইচ্ছা মত Motor car ত খরিদ করা হইল, তাহার পরেই Drainage work এর জন্য জুরুলক টাকা কর্ত্ত করা হইবে। টাকা পরিশোধের সময়ও দরিদ্র প্রজাবর্গের নিকট হইতে কঠোর আদেশে টাক্স আদায়ের দাবীকৃত করা হইবে। হাওড়ার মিউনিসিপ্যাল বন্দোবস্তের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে।

কবিব্রাজী ঔষধ।—আমরা কলিকাতার ৩ নং লোয়ার ডিংপুর রোডস্থিত কবিব্রাজ

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বিশারদ মহাশয়ের দ্বারা আমাদের জনৈক আত্মীয়কে চিকিৎসিত হইতে দিরাছিলাম। রোগীটা বহুদিন ধরিয়া অনুরোগে ভুগিতেছিলেন; অনেক চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। বিশারদ মহাশয়ের ঔষধ সামান্যদিন মাত্র ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইয়াছে। কৃষ্ণবাবুর আনুর্কম্ভ চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে, জটিল রোগ নিরাকরণে তিনি বেশ পারদর্শী। তিনি বিধা মূল্যে রোগীগণকে বিশেষ ব্যয়ের সহিত চিকিৎসা করিয়া থাকেন। অর্থের জন্য তিনি কাহাকেও পীড়ন করেন না। আমরা জগবানের নিকট এই উদীয়মান কবিব্রাজের উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

বদেদী সভা।—আজকাল আবার পূর্বের মত সৰ্ব্ব স্থানে বদেদী জব্দ বাবহার ও বিদেদী জব্বের “বরকট” অর্থাৎ ধর্মঘট করিয়া বিদেদী গণ্য বদ্ধ করিবার জন্য সভা সমিতি হইতেছে। অনেকেই বলিতেছেন—“বদেদী আন্দোলন” কার্য অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া গিয়াছে। বাহারা এ কথা বলেন—তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। এতদিন যে “বরকট” ভাঙ্গণ প্রবল ছিল না, তাহার কারণ পুনরায় আবেদন। বিলাতে লিবারেল দল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, মাদনীর জন-

যরলি এখন ভারত সচিব পদে অধিষ্ঠিত
হইয়াছেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের আইন-কানুন
কিরূপপরিমাণে পরিবর্তন করিবার জন্য
আমাদের নেতাগণ তাঁহার নিকট আবেদন
করিয়াছিলেন। সুবিচারের আশায় সকলেই
তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত আশাবাণীর আশাপণ
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। সে শুনা
গেল, জন মরলী আমাদের আবেদন অগ্রাহ্য
করিয়াছেন, সেই দিনটুকু কলকাত্তায় এক
মহতী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে
অসংখ্য লোক প্রতিক্ষাবদ্ধ হইয়াছেন—
বিলাতী দ্রব্য আর ব্যবহার করিব না। এই
কার্য্যে স্বার্থপর ইংরাজ বণিকগণের স্বার্থ নষ্ট
হইবে বলিয়া স্বজাতি প্রিয় ইংরাজরাজ আমা-
দের কার্য্যে নানা প্রকার বাধা প্রদান করিতে
প্রাণপণ করিবেন। এক্ষণে তাঁহাদের নিকট
আমাদের জন্মের বেদনা জানাইতে যাওয়া
দুইভাষ্য। এক্ষণে যাহাতে আমরা নিজের
পারে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারি, যাহাতে
আমাদিগকে আর সকল বিষয়ে পরের যুখা-
পেকী হইয়া থাকিতে না হয়, এক্ষণে আমা-
দের সে বিষয়ে প্রাণপণ করা একান্ত কর্তব্য।
চারিদিকে সভা সমিতি করিয়া বিদেশী দ্রব্যের
“বরকট” করাই এক্ষণে আমাদের জন্মের
তীব্র আলা নিবারণের একমাত্র উপায়।

আর কেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ নইয়া আর

আমাদের আন্দোলন করা বিধেয় নহে,
কারণ বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত হইবার আর
কোনও উপায় নাই। তবে কেন আর যুখা
একটা হুজুগ লটার সময় নষ্ট করা হইতেছে।
যাহাতে কার্য্য সিদ্ধি হয়—যাহাতে বিদেশী
আন্দোলন প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া চারিদিকে
প্রবাহিত হয়, যাহাতে ভারতের আবার যুদ্ধ
বিনীতা স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহার করিতে
বদ্ধ পরিকর হয়—এখন তাহাট আমাদের
লক্ষ্যভল হইলে, আর আমাদের কোনও
ভাবনা থাকিবে না। যাহার ফলে আমরা
অচিরেই আবার আমাদের পূর্ব-সৌরব
ফিরিয়া পাইব। চটলই বা বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ,
আমরা যদি নিষ্ক্রিয় না হই, আমরা যদি এক
থাকিতে পারি, তবে ইংরাজের একটা কল-
মের আঁচড়ে আমাদের কি হইবে? তাই
বলি—বঙ্গ ভঙ্গের কথা আর কেন, এখন
স্বদেশ সেবার্থে আত্মন সকলে প্রাণপণ
করি।

ভক্তির জয় ।

(পূর্বসংকলিতের পর)

পঞ্চম অধ্যায় ।

সন্ন্যাসী অরবিন্দকে যত্নানুগ্রহ হইতে উদ্ধার
করিয়া আপনায় কুটিলে লইয়া গেলেন।
মালক কুখ্য তুঙ্গার মনাম্ব কাহন্য চটয়াছিল,

একত অর্থমতঃ তাঁহার কুটিরের সঞ্চিত ধন
মূল এবং জ্বলন্ত পানীর প্রদানে তাঁহার
জ্বলিপশার শান্তি করিলেন। বলক কিঞ্চিৎ
স্বপ্ন হইলে, পরিশেষে তাঁহার পরিচয়
জিজ্ঞাস্য হইয়া কি কারণে যে এত বড়
স্বীকার পূর্বক দেশে দেশে পর্যটন করি-
তেছে, আহুপূর্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-
লেন। অরবিন্দ, সন্ন্যাসীর প্রশ্ন অনুসারে,
তাঁহার সৈন্যবকালে পিতৃ মাতৃ বিরোধ, আচা-
র্যের অসুস্থতার তাঁহার গৃহে অবস্থান এবং
অধ্যয়ন, আচার্য্যের সংস্কার বৈরাগ্য এবং
অসুস্থ পাঠার্থগণের বিদায় দান, তাঁহার
গুরু দক্ষিণা দানের অভিগাথ এবং তাহাতে
আচার্য্যের নিকৃষ্টিতা কল্পার অসুস্থতার
অনুভূতি ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, অদ্য-
কার ঘটনা পর্যন্ত একে একে আদ্যন্ত বর্ণনা
করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী এই সকল ঘটনা
শ্রুতিতে শুনিতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যাবিত হইয়া
উঠিলেন। এবং অদম্য কৌতূহলের বশ-
বর্তী হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস!
তোমার পরচর পাইয়া এবং অসামান্য গুরু-
ভক্তি দেখিয়া, আমি যার পর নাই বিমোহিত
হইয়াছি। এক্ষণে তোমার নিকৃষ্টিতা গুরু-
কল্পার বিবরণ একটু বিস্তৃতভাবে শুনিবার
আসনা। যদি বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে
তবে তাঁহার নাম, রূপ এবং বয়সের কথা
প্রকাশ করিয়া বল। তোমার কষ্ট দেখিয়া

আমিও অত্যন্ত ক্রোধান্বিত করিতেছি, যদি
আমার দ্বারা তোমার অতীত সিদ্ধির পথ
শুদ্ধ পুনরাগেও প্রসন্ন হয়, তাহা হইলে
পরম্পরক উপভোগ করিবা।”

অর। মহামুখ! আপনার নিকট
আমার কোন বিষয়ই অপ্রকাশ্য নাই। আমি
আচার্য্য মণ্ডলার নিকট যেমন যেমন শুনি-
য়াছি, অবিকল বর্ণন করিতেছি প্রবণ করুন।
আমার আচার্য্য বলেন, তাঁহার কল্পার
অনেকগুলি নাম আছে, কিন্তু তিনি প্রধা-
নতঃ ‘কালী’ নামেই বিখ্যাত। বয়সের পরি-
মাণ তিনি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই,
তবে এই মাত্র বলিয়াছেন যে, তাঁহার
কল্পাকে হেথিতে বোড়শ বর্ষের অধিক বলিয়া
বোধ হয় না। রূপ উজ্জল, কৃষ্ণবর্ণ। শিরো-
দেশে আত্মমি লিখিত। উজ্জল কেশদান।
বিবসনা, নিরাতরতা। বসন ভূষণের পবি-
বর্ত্তে নরকর শির বিনির্গত আভরণ পরিধান
করিয়া থাকেন।

অরবিন্দের কথার বাধা দিয়া সন্ন্যাসী
বলিলেন, “বুদ্ধিগাছি বৎস, সকলই বুদ্ধিগাছি,
আর তোমাকে কিছুই বলিতে হইবে না,
সমস্তই আমার উন্মত্তপুন্দরকম হইয়াছে।
মহা অসুখী অবস্থাই তোমার আশাপূর্ণ করি-
বেন, ঐরূপ একটী রমণীর কথা। আমি সমস্ত,
অনেক গোকের কাছে শুনিয়াছি, অতএব
তোমার হতাশ হইবার কোনই কারণ

দেখিতেছি না। পুনরায় নব উৎসাহে উৎসাহিত, নব উত্তমে উদ্বীণিত হইয়া অবেশে বসন্ত, বধন অপর দশজন লোক তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তখন অবশ্যই তুমিও পাইবে।” এই সকল কথা বলিয়া, সন্ন্যাসী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “উঃ! কি অসাধ্য সাধন, আমি এই ক্ষুদ্র বালককে উৎসাহিত করিতেছি? ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ কি সহজ ব্যাপার? কত যুনি, ঋষি, যোগিবৃন্দ যুগ-যুগান্তর কঠোর তপস্তা করিয়া বাঁহার কৃপালাভ করিতে পারেন না, যোগেশ্বর হরি, হুঙ্কার যোগাবলম্বনে বাঁহার স্বরূপ ভাব নির্ণয়ে অসমর্থ, লোক পিতামহ ভগবান্ চতুর্মুখ চতুর্মুখে বাঁহার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত, পঞ্চানন বাঁহার লীলাশ্রয় পঞ্চাননে প্রকাশ করিতে না পারিয়া পরিশেষে পদারবিন্দে প্রপন্ন, এই তরল-মতি সরল বালক কেমন করিয়া তাঁহার সন্দর্শন পাইবে? আহা! অবেশ বালক, আচার্য্যের চাকুরিজাল ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই—চেঁটোও করে নাই, আচার্য্য বাহা বলিয়াছেন, ঐকান্তিক সরলতা-গুণে তাহাতেই অসি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছে, বুদ্ধিতে পারে নাই—তিনি তাহাকে কি কঠোর ব্রতের ব্রতী করিয়াছেন, কি দুর্লভ রত্নেরই আশ্রয়ে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। বাজারউক, ব্রাহ্মণ কিছু অযোগ্য পাত্রের ভূয়স্কর্পণ করেন নাই, বেদে হইতেছে,

এই বালক কর্তৃক নিষ্করই তাঁহার মনো-বাসনা পূর্ণ হইবে। বালকটিতে যে সকল গুণ লক্ষণ রহিয়াছে, কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। বুদ্ধিগাণ, এখন উহার দীক্ষা হয় নাই, কিন্তু আচার্য্যের নিকটে প্রণামান্তরে দেক-তার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আমর ইচ্ছা হইতেছে, উহাকে ঐ দেবতার বীজময় প্রদান করিয়া দীক্ষিত কর,—কেবল উল্লস বটে, বীজ বণন কখনই বিফল হইবে না। শুধু দেবতা জুটিলে ইহা সিদ্ধি হয় না—বীজ জানিতে হয়। বৃষ্টির মূলদেশে জন সিকন না করিয়া, কেবল অগ্রভাগে জন সিকন করিলে, যেমন বৃক্ষ সজীব হয় না, পরন্তু সেচনকারীর পরিশ্রম শূন্য হয়, সেইরূপ মূল-মন্ত্র অগণ না করিয়া, কেবল দেবতার নাম ধরিয়া ডাকিলেও, দেবতার চৈতন্য হয় না, অগিচ সাধকের সকল পরিশ্রম বিফল হইবার্থ থাকে, তাই বলিতেছি, অগ্রে বীজ, তার-পর দেবতা। বাহা হউক, ব্রাহ্মণ, যেমন চতুঃপাশ্বর্য্য সহিত দেবতার পরিচয় দিয়াছেন, আমিও সেদিক্কে উহাকে দীক্ষিত করিব। আসল কথা প্রকাশ করিব না, কি জানি, ছেলে মানুষ, প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলে হতাশ অথবা তর্কোৎসাহ হইলেও হইতে পারে।

সন্ন্যাসীকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে দেখিয়া অবশিষ্ট বলিল,—“মহাপুং! আমাকে হত্যা

হইতে নিবেদন করিয়া, বখেই উৎসাহ দিতে-
ছেন বটে, কিন্তু আমার আশাবিত হইবারত
কোনই কারণ দেখিতেছি না ? বিশাল
ভারতবর্ষের কোন লোকালয়ইত দেখিতে
ক্রী করি নাই—সর্বত্রই বিকল হইরাছি ।
সাথে কি আমাকে হতাশ হইতে হইরাছে ।

স। বৎস ! ভারতের সমস্ত লোকালয়ই
অবেষণ করিয়াছি বলিয়া যে, সকলই দেখা
হইরাছে, এমন বিবেচনা করিও না । সুবি-
স্তীর্ণ ভারতের বহুতর স্থান এখনও তোমার
নেজগোচর হয় নাই ।—কত বিস্তারতন
প্রান্তর, কত দিগন্তবিস্তারী অরণ্যানী, কত
বহু যোজন ব্যাপী অল্পশর্লী—অচল শ্রেণী
এখনও তোমার অপরিদৃষ্ট রহিয়াছে । বৎস !
আমি একটি কথা তোমাকে বলিতে ভুল হই-
রাছে,—যে সকল লোক তোমার গুরু কন্ডার
জায় লক্ষ্যাক্রান্ত। কামিনীর কথা আমার
মিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই
বলেন,—“সেই মেয়েটি লোকালয়ে থাকিতে
বড় ভাল বাসেন না ।” সেই অস্ত্র, বৎস !
তোমাকে হতাশ হইতে নিবেদন করিতেছি,
এখন বহুতর নির্জন স্থান তোমার নয়ন-
গোচর হয় নাই, ভাল করিয়া অন্বেষণ
কর, নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইবে ।

সন্ন্যাসীর বাক্যাবলী শ্রবণে, অরবিন্দের
মুখে অপরিদ্রব আনন্দের উদয় হইল, হতা-
শার হৃৎকলতা সন্ধ্যা তিরোহিত হইয়া,

উদীপনার সব তাক্তিত স্রোত তাহার শিরার
শিরার ধবনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতে
লাগিল, শিরার শিবিড় অকস্মাৎ আবার
যেন সে আশার আলোকছটা দেখিতে
পাইল । বালকের এই অভাবনীয় আক-
স্মিক অবস্থান্তর দর্শনে সন্ন্যাসীও ব্যস্ত
নাই প্রমুদিত হইলেন । অরবিন্দ বলিল,—
“হে মহাত্মন ! আপনার উপদেশামৃত পানে,
যেন আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল—
আবার যেন আমি নব কলেবরে নব জীবন
লাভ করিলাম ।”

স। বৎস ! আমার হিরবিশ্বাস হই-
তেছে, ভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি-
বেন,—হতাশ হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই ।
আমার উপদেশ অল্পসারে কার্য্য করিও ।
বৎস ! তোমাকে আর একটি উপদেশ
দিবার ইচ্ছা আছে ।

অ। কৃপাময় ! আপনার অমূল্য উপ-
দেশ অমৃতাদিক স্রমধুর । কৃপা করিয়া
আবার অভিনব উপদেশ দানে কৃতার্থ করুন ।
আপনার অবাচিত অহংগ্রহ, অপার কল্পনা,
অপরিদ্রব মেহ ইহজীবনে কুলিবার নহে ।

স। বৎস অরবিন্দ ! আমার কাছে
একটি আশ্চর্য্য মন্ত্র আছে । কোন সিদ্ধ
মহাপুরুষ দয়া করিয়া আমাকে সেই মন্ত্রটি
দান করিয়াছিলেন । সেই মন্ত্রটির প্রভাব
এই অভূতনীর যে, যে ব্যক্তি বাহা অভিনব

করিয়া উহা একান্তিভে জপ করে। নিশ্চ-
ই তাহার সেই বাসনা পূর্ণ হয়। তোমাকে
দেখিয়া অবধি তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত
মেহ কল্পিয়াছে, তাই ঐ অমূল্য মন্ত্র উপদেশটি
তোমাকে প্রদান করিবার ইচ্ছা।

অ। দয়া করিয়া মন্ত্রটি প্রদান করুন।

স। বৎস! এই মন্ত্রটি বড়ই শুভ্র,—
প্রকারে উচ্চার্য্য নহে, কোন প্রকারে অস্ত্র
লোকের কর্ণগোচর হইলে, বিকলতার
আশঙ্কা আছে। পবিত্র দেহে শুদ্ধচিত্তে
সবিশেষ ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিতে হয়।
ঐ দেহে দুইখানি গৈরিক বসন রহিয়াছে;
পুণ্যভোর সুরধুনী-সলিলে অবগাহন করিয়া,
উক্ত বস্ত্র ধরের একখানি পরিধের ও অপর
খানি উত্তরীর রূপে গ্রহণ কর, পশ্চাৎ আমি
মন্ত্র প্রদান করিতেছি।

সন্ন্যাসীর আদেশ অহুসারে অরবিন্দ
গঙ্গাদান করিয়া বস্ত্র বৃগল পরিধান করিলে
সন্ন্যাসী তাহার কর্ণমূলে তগবতী কালীকায়
মূলমন্ত্র প্রদান করিলেন। পুণ্য ক্ষেত্র বারা-
ণসীধামে, পুত-সলিলা জাহ্নবিতীরে অরবিন্দ
দীকিত হইল। অবিভার অন্ধকারময়ী বব-
নিকা অগম্যায়িত হইয়া, এইবার তাহার
জীবন নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয়
আরম্ভ হইল, এতদিন পরে তাহার সিদ্ধি-
মার্গের অর্পণিত দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।
দীক্ষা দানান্তে সন্ন্যাসী বলিলেন,—“বৎস!

খুব সাবধানে খুব সংশোধনে এই মন্ত্র জপ
করিও, শত শত উৎকট বিপদ উপস্থিত হই-
লেও ভীতি বিহ্বল হইরা আমার মন্ত্র জপে
বিরত হইও না। বরং বিপদের সময় বিপদ
প্রবলে মন্ত্র স্মরণ করিও। দিনমণির অক্সা-
দরে বেগম অনন্ত অন্ধকার রাশি অন্তর্হিত
হয়, এই মন্ত্রের স্মরণ সাজেই তোমারও সেই-
রূপ অনন্ত বিপদ পরম্পরা সূহৃৎ যথো-
দ্ভুত হইয়া যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নিবিড় অরণ্য। নিবিড় অন্ধকার। বে-
দিকে চাও, কেবলই অন্ধকার। এ বেশ
অন্ধকারের রাশ্য। অনন্ত অন্ধকাররাশি
যেন আকাশ যেদিনো আচ্ছন্ন করিয়া আপ-
নার অধিকার সীমা দৃষ্টোক্ত করিয়া রাখি-
রাছে। অনন্ত সংখ্যক গগনম্পর্শী পাদপ
শ্রেণীর অনন্ত সংখ্যক শাখা পল্লব, পরম্পর
ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া দিবাভাগেও আলোকের
গতি নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই ভীষণ
কানন মধ্যাহ্ন তমসা গর্ভে প্রবেশ করিলে
দিবাশিশির পর্য্যায়ক্রমিক গতি নির্ণয় করা
দুঃসাধ্য হয়। কাননতলীর অগ্ন্য হিরণ্যবে
পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বতঃই অন্ধমিত হয়, যেন,
উহাতে কাননকালেও জন-মানবের লক্ষ্য
হয় নাই। বাহুবন্ধ গতিবিধি থাকিলে,

অবশ্যই ভাঙার একটা পরিচিহ্ন থাকিত। একটি বাহুব বহুদূরে গমনাগমন করিতে পারে, এমন একটি ক্ষুদ্র পথের অস্তিত্বও কুজাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল যাত্রী স্থানে স্থানে কষ্টকাৰ্ণী নিবিড় লতা ও শাখাশি তেজ করিয়া কানন গিরি হিঃশ পশু-গণের পদচিহ্নাঙ্কিত স্তম্ভবৎ সংকীর্ণায়তন হই চারিটি শীর্ষ পথ কাননের এহির্দেশ হইতে তীর্ণগুণ্ডারে অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়াছে। অরণ্যে দক্ষিণ দিকে বিশাল প্রান্তর, উত্তরে তিমনি সঞ্চিত শীর্ষ গিরিরাজ হিমালয় আকাশমার্গ তেজ করিয়া সগর্বে দণ্ডায়মান, পূর্বে পশ্চিমে আমাদের বর্ণিত এই জয়ন্তর অরণ্যানী হিমালয় পাদদেশ অধিকার করিয়া বহুদূর পর্যন্ত কলেবর বিস্তার করিয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বেলা অপরাহ্ন, সন্ধ্যা আগত প্রায়, সূর্যাস্তের সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমে আরও কলেবর হইয়া, অভ্যন্তরের বিশ্রাম শস্যের গমনোন্মুখ হইয়াছেন। হিমালয় তুমার ধবল কলেবরে অন্তর্গত রূপ স্বপ্ন-কিরণ সঞ্চিত স্তম্ভকলিত হইয়া এক অনির্বচনীয় রমণীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সারস্ফ-কালে পার্শ্বভা প্রবেশের প্রাকৃতিক দৃষ্টাবলী বিলিখিতকে না হেঁচিয়াছেন, তাহাকে সেই সর্বদা ঘাপাঘাপ করিয়া বৃক্ষান স্তম্ভটিন।

রবির অন্তিমিত-হাৰি জলশঃ সৃষ্টি পথের সীমা অতিক্রম করিল। রাজ্য অরাজক হইলে দহা, তরঙ্গাদি দ্রুতগণ যেন প্রকট মনে আগনাগন আধিগত্যা বিস্তার করে, অগতঃ প্রকাশক দিনমণির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ নৈশ অন্ধকারও বিপুল তৎ-পরতার সহিত স্বীকৃত প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিল। নিশা যত গভীর হইতে লাগিল, তমসারাদি যেন ততই ঘনীভূত হইয়া অধিকৃত স্থান স্ফটিকত করিতে লাগিল। রবির রাজ্য শেষ, রজনীর রাজ্য হইল। কিছ হে রজনী! তুমি এত প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেছ কেন? তোমার এত দর্প, এত বজ্র আঁটুনি কেন? কতক্ষণ তুমি রাজ্য পাইয়াছ? কতক্ষণ তুমি রাজোত্তরী হইয়াছ? হে রজনী! তোমার রাজ্যের অস্তিত্ব কতক্ষণ, তাবিয়াছ কি? তাবিয়াছ কি তোমার লীলাখেল। অতি ক্ষণস্থায়ী, অতি ক্ষণভঙ্গুর জাননা কি,—উত্থানের পর পতন আছে? উত্তেজনার পর অবসাদ আছে? আঘাতের পর প্রতিবাদ আছে? তাই বলিতেছি, বুঝা গরী করিও না, বুঝা আফালন করিও না,—কিছুই চিরস্থায়ী নহে, কিছুই তোমার প্রভুত্ব চুটিবে, কিছুই তোমার দর্প চূর্ণ হইবে,—আমি রবির উদয় হইবে, আবার রবির রাজ্য হইবে। তাই বলিতেছি, এত বাড়াবাড়ি কেন?

আমরা নিরন্তর দেখিতে পাই, প্রকৃতির এই নিয়ম, কি জড়-অগতে, কি জীব-অগতে সর্বত্রই তুল্য রূপে কার্য্যকারিণী। কেবল ভাঙ্গা আর গড়া, গড়া আর ভাঙ্গা, কেবল পরিবর্তন, পরিবর্তনই যেন প্রকৃতির প্রাণ। প্রকৃতি প্রতিনিয়তই যেন আশাদিগকে সুত্ব-কণ্ঠে বলিতেছে, “কিছুই চিরস্থায়ী নয়।” আমাদের অণু হুঃখ, বিপদ সম্পদ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য সকলই ঐ একই নিয়মে নিরন্তর হইতেছে, একই ক্ষুদ্রজন্তুর সংগ্রামিত রহিয়াছে। হে রোগি! যোগের উৎকট যন্ত্রণার তুমি বড় ছটু কটু করিতেছ? হে হুঃখী, হুঃখের ভীষণ কশাঘাতে তোমার সর্ব শরীর অজ্ঞরিত হইয়াছে? হে দরিদ্র, দীনতার দারুণ দংশনে তোমার প্রাণ কষ্টাগত হইয়াছে; হে শোকী, শোকের দুর্ক্সসহ দাবানলে তুমি অহরহ দগ্ধ হইতেছ? ততাল হইও না, কিছুকাল অপেক্ষা কর, দেখিবে ক্ষিপ্রই তোমাদের সকল বাতনার শান্তি হইবে, ঐ দেখ, তোমাদের হুঃখাকারময় আকাশে আবার উষার আলোক রেখা দেখা দিতেছে—এখনই সুখরবির উদয় হইবে। ঐ শুন প্রকৃতির অন্তরবাণী,—“চক্রবৎ পরিবর্ততে হুঃখানি চ সুখানি চ”। হে হুঃখী, হে বিলাসী, সুখ বিলাসে তোমরা বড়ই বিভোর হইয়াছ দেখিতেছি? ঐ বর্বর-মদগর্বে অন্ধ হইয়া যেন পরাটাকে সরাব

মত দেখিতেছ,—ভাবিয়াছ যেন, তোমাদের জীবন ভূতীতে চিরদিনই এইরূপ সুখের জোয়ার প্রবাহিত থাকিবে? কিন্তু জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে যে আবার ভাটা আছে, সেটা বুঝি ভাবিবার অবসর পাও নাট? কিরূপে পুনর্বার যে আবার হুঃখ-ভাটার একটানা স্রোতে পড়িয়া হাবু ডুব খাইতে হইবে, সেটা মনে করিয়াছ কি? তাই বলিতেছি, হে মোহাক্ষ, সাবধান!—সময় থাকিতে সতর্ক হও, সুখের মত্তরানগ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে হুঃখের অনলোচ্ছ্বাস সঙ্ঘার শক্তি ধারণ কর। তাহা হইলেই প্রকৃত মহাবাহুর পথে অগম্য হইতে পারিবে। ঐ শুন প্রকৃতির ভেরী নিনাদ, “চক্রবৎ পরিবর্ততে হুঃখানি চ সুখানি চ।”

পাঠক মহাশয়, আমরা প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এইবার আমরা অরবিন্দের বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব। কান্দীধামে সেই সন্ন্যাসীও নিকট দীক্ষিত হইবার পর, দুই মাস গত হইয়াছে, আমরা আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। সন্ধ্যাতঃ সে এখন সন্ন্যাসীর উপদেশ মত নির্জর কানন, প্রান্তরে গুরুত্বার উদ্দেশ করিতেছে। আহুন, আমরা এই অকৃত্রিমতার গহন কাননে প্রবেশ করিয়া একবার তাহার অঙ্গসজ্জা করিয়া দেখি। উঃ! কি বিকট অন্ধকার! নৈম অন্ধকারে কাননান্তর্গত

নিরতকণ্ঠ্যাপী গভীর অন্ধকারকে আরও
 যেন গভীর করিয়া তুলিয়াছে। এই ভীষণ
 আঁধারে কোলের মাছব দেখিবার যো নাই,
 কেবল অন্ধকারের পর অন্ধকার শ্রেণী যেন
 স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া জমাট বাঁধয়া
 গিয়াছে। কার সাধ্য এই ঘন নিবিড় অন্ধ-
 কারে পদাশ্রয় প্রদান করে? উঃ কি
 বিকট গর্জন! সিংহ ব্যাঘ্রাদি ঋপদ পশু-
 গণের গভীর মিনাদে যেন, কানন-ভূম
 বিলীর্ণ হইয়া বাইতেছে। আত্মন পাঠক
 মহাশয়, আমরা একটু অগ্রসর হইয়া, এই
 ভীষণ কাননের ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি।
 ও কি ও? ও কিসের শব্দ? ঠিক যেন
 দলুস্তের কঠ-ধ্বনি? যেন কোম বিপন্ন
 অভাগার হতাশ ব্যাক্ত হৃদয়ের কাতর আর্জ-
 নাদ? আহা কে তুই অভাগা? এই
 নিবিড় নিশীথে, বিজন বিগিনে, কে তুই?
 এই হিংস্র অস্ত্র সজ্জা ভরাবহ স্থানে, কে তুই
 হুঁসাহসিক একাকী ভ্রমণ করিতেছিস?
 আহা! তোমার ক প্রাণের মারি নাই?
 অপবাতেও কি তোমার আশঙ্কা হয় না?
 অথবা হয়ত, আমি জুন বুঁদরাছি, বোধ করি
 তুমি এই কাননের অধিষ্ঠাতৃ কোন দরামর
 দৈবজ্ঞ, কাননবিহারী সিংহাস্ত্র বিপন্ন পথিক-
 নিকটে, হিংস্র বতপওদের কবল হইতে উদ্ধার
 করিয়া, পথ প্রদর্শনের জন্য, এই গভীর
 নিশাি কাননবর বিচরণ করিতেছ। হে

করণ্যবর প্রেতা! তোমার চরণোপান্তে
 কোন্ কোন্ প্রণাম করি। পাঠক মহাশয়
 আত্মন! আমরা আরও একটু অগ্রসর
 হইয়া এই মহাপুরুষের বিচিত্র কার্য কলাপ
 প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন সার্থক করি। হরি
 হরি! একি! এ স্বর যে আমাদের পন্নি-
 চিত! এ যে আমাদের সেই অরবিন্দের
 কঠধ্বনি! এ যে আমাদের সেই বালক
 অরবিন্দের ব্যাকুল হৃদয়ের আতুল উচ্ছ্বাস!
 আ—হা—হা!! মরি মরি মরি!! কি
 সাধুতা!! কি একাগ্রতা!! কি ধর্মপরায়-
 নতা!! কি তত্ত্বপ্রবণতা!! ধন্ত! ধন্ত!
 ধন্ত বালক! ধন্ত অরবিন্দ! ধন্ত তোমার
 গুরুতত্ত্ব! ধন্ত তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

ক্রমশঃ।

ত্রিবিজয়ন চট্টোপাধ্যায় ।

জাপান মহিলার পাতিব্রত্য ।

কেহকি বলিতে পারেন—অন্য জাপান
 আত্ম এত উন্নত কেন, কেন আত্ম জাপানের
 বলবীৰ্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য জগৎ তন্তত।
 ইহার মূলে যে শিষ্টরই কোন ধর্মতাব নিহিত
 রহিয়াছে, তাহাতে আর কিছু সন্দেহ
 নাই। বাহার জন্ত মনসা জাপান এত অল্প
 দিনের মধ্যে জাতীর জীবনের ভিত্তিহীন এক

স্বত্ব করতে পারিয়াছে। সে ধর্মতাব আর কিছু নহে, জাপান কুল শ্রমীগণের ধর্মশীলতা ও পাতিব্রতাই ইহার মূলভূত কারণ। এক দিব এই পরাধীন ভারত বাহার বলে সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, এক দিন পাতিব্রত ধর্ম নীতির অঙ্গস্বরূপ করিয়া যে ভারত লগ্না অগতে পূজনীয় হইয়াছিলেন। আজ জাপান রমণীগণ সেই সত্যকে ভেলে অপনাদের স্বামী পুত্রকে এতদূর সতেন্দ্র করিয়াছে যে বৃষ্টিবের হইগাও তাহার। প্রবল পরাক্রান্ত কুব জাতিতে অনাধাসে যুদ্ধে পরাজিত করিল, তাই আজ তাহার অগতের ইতিহাসে ধন ও বরণ্য হইয়া রহিল। অস্ত্রবলে জাপানের ভায় নগণ্য জাতি প্রকৃত বিক্রমশালী কবিরার রণবাহিনীর প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। একমাত্র জাপান কুলশ্রমীগণের অগন্ত সত্যকে ভেলে তাহার। একগুণে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির অগ্রগণ্য হইতে পারিয়াছে আর সেই অস্ত্রই গর্বের। রত বৃষ্টি কেশরী আজ তাহাদের সহিত সম্যতা স্নেহে আবদ্ধ হইয়াছেন।

জাপানের এই অসুত উন্নতি দেখিয়া, জগতবিশ্বের মধ্যে তাহাদের এরূপ জাতীয় ক্ষমতার দেখিয়া মনে মানন্দ ও হর্ষ, আবার জাতিবিশ্বের পূর্বস্বত্ব স্বরণ করিয়া হৃদয়ে নিরাশ্রয় কোতেরও উদয় হইয়া থাকে। একদিন আমাদেরও এইরূপ তেজোদীপ্তি

সমগ্র জগত উজ্জ্বলিত করিয়াছিল, একদিন জীভাতির সত্যকে ভেলে আদর্শ ও মর্যাদা বহন করিতে চমকিত করিতে পারিয়াছিলেন। সেই পৃথিবীতে রাষ্ট্রপুতলনারায়নের আদর্শ বিদ্যমান হইতেছে এককালে এই হতভাগ্য জাতিতেও উন্নতির চরম সীমার উত্তীর্ণ করিয়া ছিল। জাপান আজকাল আর অসত্য বর্ষের আখ্যায় আখ্যায়িত হইবার জাতি নহে, আজ তাহার। ধর্মবলে আদর্শ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু জিকালদর্শী, কবিরার সহিত শাস্ত্র বে জীভাতি পারিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের অকৃতজ্ঞতা, কবিরার, সৌন্দর্য, সাবিত্রী, প্রকৃতি রমণীগণ যে নীতির অঙ্গস্বরূপ করিয়া দেবীভূমিনী হইয়াছেন, তাহাদের প্রাণেরই আদর্শ প্রতিমা আমরা এখন পূজা করিয়া থাকি। রাষ্ট্রপুতলা একদিন সে নীতি অঙ্গস্বরূপ করিয়া সমগ্র বেদিনী প্রাণস্পর্শিত করিয়াছিলেন, জাপান আজ সেই নীতির পন্থা অঙ্গস্বরূপ করিয়া, সেই আদর্শকে প্রদর্শিত পথের পাথক হইয়া বলবীর্ষ্যে এত উন্নত হইয়াছে। বিবি ইসাবেলা "Unbeaten Tracks in Japan" নামক গ্রন্থে জাপানী জীর্ণ বে চরিত্র চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, ক্রিয়বিশ্ব হইল স্ববাসীতে বাহার কতক অংশ উল্লিখিত হইয়া ছিল, আমরা সেই জাপানী জীর্ণ চরিত্রের কয়েকটা নীতি কথা আজ পাঠকবর্গের গোচর করি—

(১) জাপানে প্রত্যেক বাণিক্যর বোগা বরদেই বিবাহ দিতে হইবে। জাপানী পিতা মাতা,—নিজ পরিবার বা আত্মীয় স্বজন-বংশে কস্তার বিবাহ দিতে পারিবে না।

(২) জাপানী পিতা মাতা,—পুত্র অপেক্ষা কস্তার শিক্ষাবিধানে ও চরিত্র-গঠনে বিশেষ-রূপ মনোযোগী হইবেন; কেননা, কস্তাকে খণ্ডর-শাওড়ী, স্বামীর এবং তাহাদেরই অভ্যস্ত পরিজনবর্গের অধীন ও মনোমত হইয়া সংসার নির্বাহ করিতে হইবে।

(৩) কুন্দনী অপেক্ষা স্ত্রচরিত্রা হওয়াই জাপানী রমণীর উৎকৃষ্ট গুণ। পতিব্রতা, দুঃখীনা, সুখীনা, বসীভূতা প্রভৃতি জাপানী সংসারের আদর্শ-রূপিনী। উচ্চহাসিনী, উচ্চ-ভাবিনী, কলহ-গিরা, প্রগল্ভা, করুণা, ব্যাপিকা, গৃহকুৎসা ব্যস্তকারিণী, অধীরা, উগ্রা কামিনী জাপানী সমাজবিধি অধুসারে পরিচালিত।

(৪) জাপানী স্ত্রী কখন কোন কুখ্যাতি লিখে না; কুদৃষ্ট দেখিবে না; আত্মীয়-কুইব পুরুষকেও হাতে তুলিয়া কোন জ্ঞাতি লিখে না; একাসনে বসিবে না;—একত্র পথ চলিবে না;—একত্র বস্ত্র রাখিবে না; শৈশব অবস্থা হইতেই পুত্রের সংসর্গ হইতে বস্ত্র বাকিতে দিলা করিবে। জাপানী পিতা মাতা,—কস্তার বাণ্যকাল হইতেই তাহাকে এই সকল নীতি শিক্ষার শিক্ত করিবে।

(৫) কোন জাপানী বাণিক্যই খেজার স্বয়ংবরা কইতে পারিবে না; পিতা-মাতা বটক সাহায্যে কস্তাকে পরিণীতা করিবে। ইচ্ছাও প্রের, তথাপি জাপানী কুমারী সষ্ট-চরিত্রা হইতে পারিবে না, চরিত্র-রক্ষার জন্য ধাতু প্রস্তরের স্তার কঠিন হইয়া থাকিবে।

(৬) স্বামীর সংসারই,—জাপানী বিবাহিতা রমণীর আশ্র-সংসার; স্বামী গৃহই জীবন গৃহ; স্বামী নিঃস্ব হইলেও জাপানী স্ত্রী কদাচ পতিগৃহ পরিত্যাগ করিবে না।

(৭) জাপানী রমণী অনুভা অবতার পিতা মাতাকে ভক্তি সম্বাদন করিবে; তাহাদেরই সেবাপরায়ণা হইবে; কিন্তু বিবাহ হইলেই জাপানী স্ত্রী, পিতা মাতা অপেক্ষাও খণ্ডর শাওড়ীকে অধিকতর সম্বাদন প্রদর্শন করিতে অভ্যাগ করিবে। তাহারা কষ্ট কহিলেও, জাপানী বধু রুট হইবে না,—প্রকৃত মনে তাহাদের সেবা করিবে; এরূপ করিলে, খণ্ডর শাওড়ী,—বধুকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

(৮) বিবাহিতা জাপানী রমণীর স্বামী ব্যতীত অন্য কোন প্রভু বা দেবতা নাই। রমণী সতত প্রকৃত বদনে এবং বিনীত বচনে স্বামীর সন্তি কথোপকথন করিবে; স্বামী ক্ষুণ্ণ বা কহিলেও, স্ত্রী তাহার প্রতিবাদ করিবে না; কষ্ট মনে স্বামীর আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত থাকিবে। কারণ স্বামীই জীবন স্বর্গ;

স্বামীর অসন্তোষই,—স্ত্রীর স্বর্ণলভের অভ-
রার।

(৯) স্বামীর আত্মীয় স্বজনই স্ত্রীর আত্মীয়
স্বজন; স্ত্রী তাঁহাদের সহিত কখন কলহ
করিবে না। কারণ, ইহাতে স্বামীর সংসার
অশান্তির হইরা উঠিবে।

(১০) স্বামী অসচ্চরিত্র হইলেও, স্ত্রী
অসুখ-পরবশ হইবে না। স্বামীর চরিত্র-
শোধনের জন্য তিরস্কার করিবে বটে; কিন্তু
তাঁহাও প্রকৃত সুখে, বিনীত ভাষায়। স্বামী,
স্ত্রীর কথা শুনিবে, ইহার জন্য বার বার
তাহাকে কিছু বলিবে না; প্রবৃত্তি শাস্ত হই-
লেই,—স্বামীর চরিত্র আপনাই শোধিত হইরা
বাইবে।

(১১) জাপানী স্ত্রী বৃথা বহু বাক্য বলিবে
না, মিথ্যা করিবে না; কাহারও নিন্দা
করিবে না। অপরের নিন্দা শুনিলে চাপিয়া
রাখিবে,—হুটিয়া বলিবে না; বলিলে,
সংসারে দ্বন্দ্ব কলহ উপস্থিত হইতে পারে।

(১২) জাপানী স্ত্রী সর্বদাই সংসারের কাজ
কর্ম করিবে; প্রত্যয়ে সকলের অগ্রে শয্যা
হইতে উঠিবে; সকলের শেষে শয়ন করিবে।
পানি ডোজনে বা বেশপোষাকে বহু ব্যয়
করিবে না; বিয়েটার ব্যাড়া দেখিবে না;
বেশখানে বহুপুরুষের সমাগম, ভোজন হলে
বাইবে না।

(১৩) সুখী স্ত্রীলোক,—কোন সুখ

পুরুষের সহিত,—স্বামীর কোন আত্মীয়
পুরুষের সহিত এমন কি,—স্বামীর পুরুষ
ভৃত্যের সহিতও বেশায়েনি ভাবে কথা
করিবে না; সহস্র প্রয়োজন থাকিলেও,
কোন সুখকে পাত্র লিখিবে না।

(১৪) বিবাহিতা স্ত্রী স্বতন্ত্র শাওকীরই
সম্পত্তির অধিকারিণী হইরা থাকে,—পিতা
মাতার নহে; সুতরাং বিবাহিতা স্ত্রী—পিতা
মাতা অপেক্ষা স্বতন্ত্র শাওকীর অধিক সেবা
করিবে। যদ্ব্যন পিতা মাতাকে দেখিতে
বাইবে না; প্রয়োজন হইলে, লোক পাঠাইয়া
তত্ত্ব লইবে। স্বামীর আদেশ ব্যতীত কুচাপি
বাইবে না; তাহাকে কোন সামগ্রী দিবে
না।

(১৫) বহু ভৃত্য থাকিলেও, বিবাহিত
স্ত্রী, স্বামীগৃহে সকল কার্যই নিজে করিবে।
স্বতন্ত্র শাওকীর কাপড় কাটিবে। অন্ন প্রস্তুত
করিয়া দিবে। নিজহস্তে স্বামীর শয্যা প্রস্তুত
করিবে; জাপানী প্রস্তুতি ভেলেনের মতলা
মাথা কাপড় নিজেই পরিষ্কার করিবে। সর্ক-
মাই নিজের ব্যক্তিতেই থাকিবে।

(১৬) স্বামী-সংসারের চাকর চাকরানী
যদি স্বামীর কোন আত্মীয় স্বজনের নিন্দা
করে, তাহাদের নামে লাগায়, তাহা হইলে,
জাপানী স্ত্রী সে কথার কাণ দিবে না। কিছু-
কাল পূর্বে, অর্থাৎ বিবাহের অগ্রে যে স্বতন্ত্র
শাওকী নববধূ একান্ত অপরিচিত ছিল,

তাহাদের মাঝে লাগাইয়া বস তাহাইরা দিতে,—মন-তাহাইরা সংসার সুখ নষ্ট করিতে কতক্ষণ ? যে গাণবুদ্ধি চাকর চাকরানী এমন লাগাইতে আসিবে, তাহাদিগকে তাহাইরা দিবে।

(১৭) শিক্ষা করা আর দেব করাই স্বভাবতঃ জীলোকের দোষ। দুর্ভটাই ইহার কারণ। ফলে, সেগার সংসার চারখার হইয়া যায়। এই সব কারণে বিবাহিতা জাপানী স্ত্রী কোম বয়সে ফ্রান অবস্থাতেই স্বতন্ত্র চলিবার চেষ্টা করিবে না; সর্বদাই স্বামীর বশে থাকিবে। ভাল কাজ করিলেও তাহার ক্ষুদ্র বড়ারি করিবে না। স্নেহকে বন্দ বলিলে মীরবে সহ্য করিবে; দোষ শোধরাইয়া লইয়া ভাল হইবার চেষ্টা পাইবে।

(১৮) জাপানী যদি স্বতন্ত্র শাস্ত্রীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে অবহন প্রকাশ করে, ব'ল আধিপাসিনী, বিলাপসারসণা, কুঠরোগাদিতে ক্রম কলহপ্রিয়া, চোখা-অপরাধে অপবাধিনী এবং কড়া হন, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। পতি-ত্যাগা স্ত্রী বড়ই জ্ঞানী, তাহার জীবন,—বৃত্তার ফুলা।

পাঠক ! ইংরাজ মহিলা বি'বইলাবেলা জাপানী রমণীর বিধর বাহা গিপিষক করি-
য়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া হিন্দুধর্মের নিগূঢ়
অর্থ অবগত হউন; জাপান আজ হিন্দু ধর্মের
পরিচয় পূর্ণ। অবলম্বন করিয়া কতদূর উন্নত

হইয়াছেন দেখুন। বিবি ইলাবেলা স্বচক্ষে
দেখিয়া বুঝিয়াছেন, জাপানী স্ত্রী বস্তুতই
অশীলা কুলঙ্গনী, একান্ত পতিপরায়ণা, সর্বথা
সংসার তত্ত্বকারিণী। জাপানী স্ত্রী-বস্তুতই
সংসার তত্ত্ব বিবোধ-বল্লরী, শান্তিকুণ্ডের
সুরত মালিকা, গৃহ সরোবরের প্রকৃত ললিতা
পতি হৃদয়ের চিরপ্রজ্ঞামিনী। জাপান রমণী
শৈশব হইতে পাতিব্রতা ধর্ম অমুরাগিণী
হইয়া থাকে। জাপানে এইরূপ শিক্ষাই
প্রচলিত, তাই আজ তাহাদের এত উন্নতি,
তাই আজ তাহাদের যশোমোরতে দিগন্ত
পরিপূরিত। ধন্য জাপান! আজ তোমরা
ধর্মবলে বকীরান হইয়া, জীবাতিকে প্রোক্ষণ
ধর্মশিক্ষার শিক্ষিতা করিয়া জনতে যে চির-
কীর্তি স্থাপন করিয়াছ; যে কীর্তি চিরকাল
উজ্জল ভাষাধারণ করিয়া জনতের লোককে
হিন্দুধর্মের গুঢ় মর্ম বুঝাইয়া দিবে। তাই!
হিন্দু! আর তোমরা তোমাদের চির পূজ্য
ধর্ম বোতাম্পূহ হইয়া কিরূপ অধোমুখিতর পথে
অগ্রসর হইতেছ, একবার মর্শন কর। ধর্ম
ভিন্ন যে লাতীয় জীবনের উন্নতি কোনও
রূপেই সংসাধিত হইতে পারে না, জাপা-
নের স্ত্রীত্ব দেখিয়া সর্বদা সে-বিধর বিশেষ-
রূপে বুঝিতে সক্ষম হইবে।

আজকাল সকলে জ্ঞানিকার পরপাণ্ডী,
কিন্তু হিন্দু রমণী কিরূপ শিক্ষার শিক্ষিতা
হইলে সমস্ত জাতির সুখ-অনুগত, সংসার

শান্তির হর। দৈনিক বলে বলবন্ত হইয়া
সংসার সংগ্রামে জরলাভ করিতে পারে,
এস, আমরা আমাদের রমণীগণকে সেই
শিকা প্রদান করিয়া দত্ত চই, হিন্দুর বশো-
লক্ষ পুনরায় পৃথিবী পরিবাপ্ত হইয়া আমা-
দিগকে দত্ত করুক। যতদিন না আমরা
পুনরায় আমাদের জীগণকে অসার শিকার
পরিবর্তে সেই পূর্ব শিকার শিকিতা কবিত্তে
পারিব, ততদিন আমাদের উন্নতির আশা
করা শূন্যে গৃহনির্মাণের স্তায় নিফল। আংসং

সৌন্দর্য্য ।

চেরোনা উহার পানে,
আশা তরশা প্রাণ তোর,
পলকে পড়িবে চলি,
বাড়িবে বাতসা ঘোর।
হাঁসি তরা চাহনিতে ;
প্রাণনাশি হলাহল ;
মনের অগঙ্কো ছুটে,
আলে প্রাণে দাবানল।
অতল সাগর জলে,
কর পল্লব লুপা ধারে,
অদিশে আপায়ে প্রাণ,
কিছুতে নিবিবেনারে।
বেণমা উহার কাছে,
রঙ শ'রে দূরে দূরে ;

কাজ কি পড়ক যুতি,
মানবে আশ্রয় করে ?
রূপ তুয়া প্রাণঘাতী,—
কোমল মুকুল প্রাণে ;
কিবা কাজ দিয়া তান,
শিরের শমন এলে ?
অনু উপহাস খব,
রাংণ চিত্তার পর ;
জুড়াল রূপের জালা,
জুড় জার পুরস্কর ;
অবর নিষ্ঠার ভাই,—
তবু কি লাঞ্ছনা কম ?
মীরবে অংশ জালা,—
বহে গায়ে অহুপহ।
বাতাস লাগিলে গার,—
অমর বা কিবা তার ;
পুড়িরা মরিবে প্রাণে
করি সাগ হাহাকার।
নধর অধর ওই
রঞ্জিত বাঁধুণে রাগে ;
ঢেলে দেয় কাণকুট,—
মরমের নিয়তালে।
ওহ হাঁসি তরা সুখ,
চাহনি চপলা সম ;
বজ্রাঘাত পূর্ব চিহ্ন,
সাবধান শির তরহ।
কন্দর্প কুহুদাধু,—
নিশ্চিত সুপল কুক ;

পক্ষ বিজ্ঞ নাহি.সংগে,
হাসে প্রাণে পর গুরু ।
বতনে অন্তরে থাকি,
অন্তর বাতনা করে ;
হাসে মুখে মুহু, বখা--
পশু নাশি বাধ পরে ।
কে বলে ব্রহ্মাণ্ড পতি—
লঙ্ঘ্যেতে এ বিশ্ব ছুটে ;
ওরি পতারণা মুহু,
ওরি পার বিশ্ব সূচী ।

প্রণয় ।

হৃদ নিবেষিত নন্দন কানন,
জীব পরিশূভ বক ভূমিজন,
বসন্ত অনীল তীম স্বর্গাবাত,
অচল নিখরে, পরোমিষিতলে,
সোধে, কি কুটীরে, কিবা বনতলে,
আঁধার রজনী. বিমল প্রভাত,
অমির মাধান শশাক তিরণে
দাবানল পারা মধ্যাহ্ন তপনে,
ফুল ফুল, কিবা নিবিড় কান্ডার,
মরনের কোণে নিতৃত মরমে,
পোপনে, পরাণে, ভীতি, কি সরমে,
আনিয়া কোথার জনম তার,
শায়র অবাংগ হাসিটুকু হরি,
শিরিষ কুহুম কোমলতা ধরি,
চাক্ষুণ্যে সেগো বেথানে সর,

সহচরী বেশে চির মধু দাস,
কিঙ্করের বেশে ফুল কুল বাস,
সে দূর সনীর নিরন্তর বর ।
কোরেলি কুঞ্জিত রমা উপবন,
মুখরিত রব ভ্রমরা গুঞ্জন,
চিরানন্দময় পরশে তার ;
মোহিনী মদিরা ললিত অধরে,
পরশে পরাণ আবেশে শিহরে,
ধমনীতে বর তড়িত ধার,
দারুণ হৃষ্টাশে মরমের স্তরে,
রাবণের চিতা জ্বলে হহ করে,
শান্তিহীন প্রাণ মরণ যাচে,
মেষের আঁচলে অশ্রু সিক্ত মুখে,
গেম মর করে শোক দগ্ধ বুক.
মুছাওতে শুধু সেই রর কাছে ।
কেবা এ জগতে সখা তার চেয়ে ?
না ডাকিতে আসে আপনি ধাইরে,
হাসিয়ে বতনে হাসাতে চার,
উচ্ছ্বসিত বুক শান্তি তারা মুখে,
জ্যোতি ফল্ল মুখ শুধু চোখে দেখে,
আনিয়া কি দিবে বেছেছে ধরার !
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

কুস্তলকান্তি তৈল
সৌগন্ধযুক্ত কেশবর্দ্ধক ও
মাবতীয় শিরোরোগ নাশক
মূল্য ১০ আশা দ্রাক্ষাদি ৮০।
বি.ভ্রাদাস এণ্ড কোং
৭৫, নংবিমুগোদ্বারীর লেন, কলিকাতা।

আলোচনা।

“মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।”

নবম বর্ষ। } “চৈত্র ১৩১২। { দ্বাদশ সংখ্যা।

প্রেমের পুরস্কার।

সে আজ অনেকদিনের কথা। সে দিন আমি আমার বন্ধু মহম্মদের সঙ্গে বেড়াতে-ছিলাম। তখন আকাশে মেঘ ছিল এবং মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ দেখা দিতেছিল। বৃষ্টি নামে নাই,—কেবল পদ্মানীকরসম্পৃক্ত মন্ডালি আমাদের শরীর জীতন করিয়া দিতেছিল অমরা বেড়াইতেছি,—হুইরনেট নীরব। পশ্চাতে বিশাল নিম্নক প্রান্তর—সমুখে কলনাদিনী ভৈরবী পদ্মা। প্রাণের মধ্যে নানা প্রকার ভাবনা তোলা পাড়া করিতেছিল। মনে হইতেছিল যে, আর একদিন এমনি অম্পষ্ট প্রদোষালোকে—এমনি নিম্নক আকাশতলে—এই পদ্মটুকতে সুরার সহিত আমার কথোপকথন হইয়াছিল। হায়, সে কি ভয়ানক দিন! এত বড়, এত চেঁচাতেও সুরা আমার হইল না। জানি না সুরা, মহম্মদ তোমাকে কি গুণে বশীকৃত করিয়াছেন!

কিরংকাল নীরবে পাদচারণা করিবার পর মহম্মদ আমার বলল “দেখ ওয়াহেদে আজ তোমার একটা কথা বলিবা।”

আমি বলিলাম—“কি বলিবে বলনা তাই।”

মহম্মদ—“তবে সত্য করিয়া বল, বুঝকে তুমি ভালবাস কিনা?”

আমি বলিলাম—“জানি না তাই, সে আমার ভালবাসে কিনা, কিন্তু আমি তাহাকে ভালবাসি—সে যে বড় সুন্দর!”

মহম্মদ একটুও কথা বলিল না, সে আমার দিকে একবার চাহিয়া আমার অবনত মস্তকে পাদচারণা করিতে লাগিল। তাহার সুন্দর সুকেশান্ত বদনের দিকে চাহিয়া দেখি যে তাহা অবিলম্বে ধীর ও প্রশান্ত। মহম্মদের দ্বিধা প্রকৃতি আমার ভাল লাগিল না। প্রাণে যেন কেমন ব্যাকুল ধংসন হইতে লাগিল। তাহালায় মহম্মদের বৃদ্ধ ধাক্কা যে সুরা তাহাকে ভালবাসে। আর লক্ষ

হইল না, আমি একটা অছিলা করিয়া মহান্দের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

কিছুদূরে একটা গাছ ছিল। আমি সেই গাছের নিকট দিয়া বাইতে বাইতে দেখিলাম যে মুন্না দাঁড়াইয়া আছে। আমি ভাবিলাম—অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী মুন্না এখানে কেন? ভাবিলাম, আর কিছু নয়—মহান্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

আজ অনেকদিন পরে মুন্নাকে দেখিয়া আমার নানাকথা মনে পড়িতে লাগিল। কতবার কতদিন আমি বাকুল অন্তরে তাহাকে মনের কথা জানাইয়াছি, কিন্তু কতবার সে আমাকে নিরাশ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। স্বতঃপ্রণোদিত ভালবাসা লইয়া তাহার নিকট কতবার অনাযুক্ত হইয়াছি। আমার অক্ষরময় জীবনের প্রবর্তার মুন্না আমার হইল না। সে মহান্দের;—মহান্দই আমার সিদ্ধপী শত্রু। সে থাকিতে মুন্না আমার হইবে না।

আমি ভাবিলাম একবার বৃক্ষতলে মুন্নার নিকট যাই এবং প্রাণ খুলিয়া আর একবার তাহাকে সমস্ত কথা বলি। হায় আশা! তুমি মাহুযকে পাগল করিতে পার। আমি ধীরে ধীরে মুন্নার নিকটে গেলাম। মুন্না কোনও কথা কহিল না। আমি ডাকিলাম—মুন্না।

মুন্না বলিল—“এই অন্ধকারে আমার কি করিয়া চিনিতে ওরাহেৎ?”

আমি—“মুন্না দিবারাত্র যে আমার অন্তরে বিরাজ করিতেছে, তাহাকে অন্ধকারেও চিনিতে পারা যায়।”

মুন্না বলিল—“তুমি এখানে কেন?”

আমি “আগে বল তুমি এখানে কেন?”

মুন্না—“আমি মহান্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আসিয়াছি।”

আমি—“আমিও তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।”

মুন্না—“কখনই নয়; আমি যে আজ মহান্দের সঙ্গে দেখা করিব, তাহা আমার বলা ছিল।”

আমি বলিলাম “হাঁ মুন্না, বাস্তবিক আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসি নাই। আমি মহান্দের সঙ্গে বেড়াইতেছিলাম, সহসা তাহার মুখে তোমার কথা শুনিয়া আমার—মুন্না আমার কথার বাধা দিয়া বলিল—“মহান্দের মুখে আমার সম্বন্ধে কি কথা শুনিতে ওরাহেৎ?”

আমার মস্তকে বেল শত বজ্রাঘাত হইল। ভাবিলাম,—এত ভালবাসা! মহান্দের মুখে নিজের কথা শুনিবার জন্ত এত আগ্রহ! আমি নিরাশ হইলাম। ধন্ত মহান্দ, ধন্ত তুমি—আমার শিখাইয়া দাও, কি শুনে তুমি

মুন্সাকে বাঁধিলে! মুন্সা আবার বলিল—“বল, বল মহান্নব কি বলিল?”

আমি হুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না—পাশে বড়ই বেদনা পাটলাম। বলিলাম “একটা কথা,—কেবল মাত্র একটা কথা—সত্য বল তুমি মুন্সাকে ভালবাস কি না”—তাহার সহিত আমার আর কোনও কথা হয় নাই।”

তুমি কি বলিলে?

আমি—পরিচাস রাখ মুন্সা, আমার জন্মের আশা তুমি কি বুঝতে পার নাই?

মুন্সা একটু গভীর হঠেরা বলিল—“জানি ওয়াহেদ, তুমি আমার ভালবাস, কিন্তু কি করিব, তোমার আমি বিবাহ করিতে পারিব না। তুমি দরিদ্র,—আমি যদিও ঐখ্য-শালিনী, তবু আমি দরিদ্রকে বিবাহ করিব না—কারণ আমি পিতৃ মাতৃহীনা, তোমার মত দরিদ্রকে বিবাহ করিলে গোকে আমার নিন্দা করিবে। তুমি ঘরে বাণ্ড ওয়াহেদ, ঐ দেখ,—ভয়ানক মেঘ করিয়াছে এখন বৃষ্টি নামিবে।”

সহসা সুরং সিদ্ধাহামকিত, অবুষ্টি সংরম্ভ মেঘ গর্জন করিয়া উঠিল, এবং পদ্মা গর্ভ হইতে সৈকতাভিসুখে তাত্তিত একটা প্রবল বায়ু আমার গায়ে লাগিল। চতাবাস, অনাদৃত প্রেমিক আমি অর্ধমুহুরিতভাবে

বসিয়া পড়িলাম। কিছুকণ পরে চাহিয়া দেখি, মুন্সা চলিয়া গিয়াছে। আশাশুভ দিকে চাহিলাম—দখিলাম যে ঘন ঘন গণ প্রভা আসিতেছে, বিজলীর হাসি ভাল লাগিল না, বোধ হইতে লাগিল সে যেন আমার উপহাস করিতেছে। বায়ুচামর শান্তরের দিকে চাহিলাম,—দেখিলাম অদ্ভুত অন্ধ-কার! উত্তাল তরুতললোড়িত পদ্মার দিকে চাহিলাম যে আমার জন্মের ছবি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

কি জানি কি মনে হইল, নিজের দারিদ্র্যকে দিক্কার দিতে দিতে পদ্মার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। যতবার পদ্মা গর্জন ও অকাশ গর্জনের মিশ্রণ হইতে লাগিল, ততবার আমার মনে হইতে লাগিল যে “আর কেন সকল আশা তরসা গৌ আজ ফুগাইল, এই প্রকৃতি বিপ্লবে পদ্মাগর্ভে আমার জীবন নাটকের অভিনয় শেষ করি।”

এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখি যে একখানি নৌকার একটি পুরুষ ও একজন স্ত্রী উঠিল। এট ছায়াপথে সন্ধ্যাগ্রাসিনী পদ্মার গর্ভে কাটাগা নৌকা ভাসাইতেছে? কি সাহস!

নৌকার লগনের আলোক জ্বলিতেছিল। সেট অলপটালোক পলিচ্ছন দেখিয়া মুক্তিলাভ মহান্নব ও মুন্সা। মুন্সার বাটা পদ্মার ওপারে বোধহয় মুর মহান্নবকে তাহার বাসিতে লইয়া

বাইতেছে। উভয়ে নৌকা খুলিয়া দিল।
এদিকেও ভয়ানক বড় উত্তিল।

আমি তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম
নৌকা তখনও অধিকদূর যায় নাই, সহসা
একটা কটক বাতাসে নৌকাখানি জলময়
হইবার উপক্রম হইল। আমি ভাবিলাম—
“খোদা মুন্নাকে রক্ষা কর আমি সব সঙ্ক
করিতে পারি কিন্তু মুন্না যে ডুবিয়া মরিবে
আমি তাহা সঙ্ক করিতে পারি না ; টেনশান্না
ভালা আমি পদ্মাগর্ভে ফাঁপ দিলাম।

জানিনা মুন্না কিবা মহম্মদ আমার
দেখিতে পারিয়াছিল কিনা আমি অগ্রসর
হইতে লাগিলাম। সে ভীষণ তরঙ্গ গা
ভাসান দিতে আমার যেন বুক ফাটিয়া যাঠতে
লাগিল। বহু কষ্টে অনেক আশার আমি
প্রায় নৌকার নিকটোঁ হইয়াছি এমন সময়
নৌকা উল্টাইয়া গেল মুন্নার নিরাশ চীৎকার
আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি অন্ধকারে
ভরজ বিকৃত পদ্মাগর্ভে কিছুই খুঁজিয়া পাই-
লাম না। কিছুকণপরে আমি একখানি
ওড়নার অগ্রভাগ ধরিলাম ওড়না আমার
হাতে উঠিয়া আসিল। আমি আর একটু
অগ্রসর হইতেই মুন্নার সুদীর্ঘ বেগী পাটলাম।
সংজ্ঞাহীন মুন্না কে লইয়া বহুকষ্টে আমি তীরে
উঠিলাম।

মুন্না কে আমার গৃহে লইয়া গিয়া অনেক
কাজকা করিবার পর তাহার চৈতন্য হইল।

দুই একদিন পরে মুন্না কে তাহার বাটীতে
রাখিয়া আসিলাম। সে আমার ভাল বাসুক
বা প্রত্যাখ্যান করুক সে বাচিছে থাকিলেই
আমার অনেক শান্তি।

মহম্মদ মরে নাই। কয়েকদিন পরে
তাহাকে আমার মুন্নার বাটীতে গভায়াত
করিতে দেখিলাম। মনে বড়ই কষ্ট হইতে
লাগিল। হায়! কেন আমি দরিদ্র হইলাম,
আজ ঐশ্বর্য থাকিলে বোধ হয় মুন্না আমার
প্রত্যাখ্যান করিত না।

একদিন মুন্নার বাজি হইতে ফিরিতেছি
এমন সময় পথিমধ্যে কে আমার মাথার
নাটির আঘাত করিল আমি মুচ্ছিত হইয়া
তুপতিত হইলাম। মুচ্ছাভঙ্গে দেখি যে
আমি এক অপ'রচিত স্থানে একটা ভগ্ন
অট্টালিকার প্রকোষ্ঠে আকঙ্ক। আমি
কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।
অনেককণপরে একজন বাবুজি আমার খাবার
দিয়া গেল। আমি তাহাকে দ্বিজ্ঞাপ
করিলাম, “ময় কাহা আরে হু”। বাবুজি
বলিল—“মাক্ কিজিয়ে হজুর বোলেন কে
হকুম নেহি”।

দিনের পর দিন ফাঁটেতে লাগিল, এই
জনশূন্যতানে আমি কোনপ্রকারে কাণবাণন
করিতে লাগিলাম। একে একে প্রায় বর্ষ
শরৎ হেমন্ত শীত কাটিল বসন্ত আসিল।
আমার কোনও পরিবর্তন হইল না। সন্ধ্যার

পর বখন বাতায়ন পথে মল্লানল আমার
পারে লাগিত, তখনই অতীত স্মৃতি আমার
আকুল করিয়া কলিত। শতবার স্বপ্ন কল্পনা
করিয়া সুমার নিকট গিয়াছি—শতবার সে
আমার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে কিন্তু তবু
তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা
গেল না।

একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি
আমার প্রেকাঠ উন্মুক্ত। বুঝিতে পারিলাম
না কে চাবী খুলিয়া দিয়াছে। ঘরে ঘরে
বাহিরে আসিলাম, দেখিলাম যে মহম্মদ
আসিতেছে। আমি মহম্মদকে দেখিয়া
বলিলাম, কি ভাই, তুমি যে এখানে ? মহম্মদ
বলিল—“আমি কোনরূপে শুনিলাম যে তুমি
এখানে বন্দী তাই তোমার উদ্ধার করিবার
সুযোগ খুঁজিতে এইদিকে আসিতেছিলাম।
তুমি মুক্ত হইলে কিরূপে ?” আমি—অন্ত
আমার গৃহের দ্বার কে মুক্ত করিয়া দিয়া-
ছিল তাহা জানি না, ঘরে চাবী ছিল না
বলিয়াই আমি বাহিরে আসিতে পারিয়াছি।
ভাই, একটা কথা বলিব অনেকদিন হইল
সুমার কোনও সংবাদ পাই নাই। যদি
তাহার কোনও সংবাদ রাখিয়া থাক তো
আমার বল। মহম্মদ—সে কি কথা ! সুমা
যে আজ ছয়মাস হইল মরিয়া গিয়াছে।
আমি বলিয়া পড়িলাম। পৃথিবী যেন সুরিতে
লাগিল। আমি কিছুক্ষণেরে মহম্মদকে

বলিলাম—“ভাই তুমি ঘরে যাও আর আমি
গৃহের দিকে করিব না। একবার আমাকে
কীড়াহুঁমি পদ্মাসৈক্যে বাইব তারপর পদ্মা-
গর্তে আমার স্মৃতি চিরকালের মত লোপ
পাইবে। গভীর রাত্রি সমস্ত অগৎ নিস্তব্ধ।
কেবল পদ্মার তরঙ্গসংঘাতের শব্দ শুনিতে
পাওয়া যাইতেছে। আমি আজ সেই পদ্মা-
সৈকতে যেখানে সুমা আমার প্রত্যাখ্যান
করিয়াছিল। কত কথা আজ স্মৃতিপথে
উদয় হইল। সেই অন্ধকারময় আকাশ—
পদ্মার তৈরবী স্মৃতি পদ্মাগর্ত হইতে সুমার
উদ্ধার—আজ সমস্ত কথা মনে পড়িল। প্রাণ
উদাস হইয়া গিয়াছে। কুলনাগনী পদ্মা
আজ সর্সালে কোমুদী মাখরা নাচিতেছে
বিশাল কাগমর শ্রান্তর আজ রক্তচক্ষু চক্ষু
কিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে। হায় ! বখন
সুমা বাঁচিয়াছিল তখন তো টান তুমি এত
হাস নাই। তখন তোমার এই হাসি লুকান
ছিল। আজ আর হাসি ঘরে না। অগতে
যেদিকে চাহি সেইদিকেই আনন্দ দেখিতে
পাই কেবল আমার অন্তর মরুভূমির স্তার
শুক এবং তরকার। সুমা—সুমা তুমি স্বর্গে।
তোমার আগমনে বেগে যেন আরও পুণ্যময়
হয়, কিন্তু সুমা আমি এই মরুভূমির মত
পৃথিবীতে কি করিয়া থাকিব !

কিছুদূরে একটা কবর দেখিতে পাওয়া গেল।
এই জনশ্রুত প্রান্তরে এ কাহার কবর।

তবে কি মুরাকে এইখানে কবর দেওয়া
হইয়াছে? স্মৃতিস্তম্ভের নিকটে! বাটতে প্রাণ
বড়ই ব্যাকুল হইল। উদ্ভয়ের মত স্মৃতি-
স্তম্ভের নিকটে যাইলাম। সেখানে বাহা
দেখিলাম তাহাতে প্রাণ বিষয়ে আগ্রহ
হইয়া উঠিল। ঐকি! এখানে আমার কবর
কে নির্মাণ করাষ্টল? তখন জ্যোৎস্নালোকে
স্মৃতিস্তম্ভেরোপরিত অক্ষরাবলীর প্রতি দৃষ্টি
পড়িল, দেখিলাম তাহা এইঃ—“স্মৃতিস্তম্ভ,
সেখ ওয়াহেদ আলীর কবর। তাহার বন্ধু
ঈদহুদ আলি কর্তৃক নির্মিত।” আমি
আশ্চর্য হইলাম। ঐকি ব্যাপার! আমি
যে জীবিত! সেখানে বসিয়া কত ভাবিতে
লাগিলাম কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলাম
না। শোকসম্বলিত ও পরিশ্রান্ত ছিলাম
সেই বাসুকামর প্রান্তরে শুইয়া পড়িলাম।
ভ্রমাবহিতভাবে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম?—
“আমি যেন মরিয়া গিয়াছি—বাস্তব আমার
বন্ধু মহম্মদ আমার কবর নির্মাণ করাষ্টল।
সে দিন জ্যোৎস্নাযমী রাজি। সমস্ত অগত
হাসিতেছে। অন্ধনিদ্রিতভাবে বলহীন
বার্তিত নদীর পরপার্শ্ব নৈশ বীণাধ্বনির ভাষ
একটি গান ওনিতে পাইলামঃ—

“বঁধুনা না মিটল পিরাস হামারি”

ক্রমে সে ধ্বনি আরো কাছে ওনিতে পাই-
লাম। আমার কিছুক্ষণ পরে বোধ হইল
যেন সে শব্দ কবে কাহার কণ্ঠ হইতে ওনি-

রাছি। চিনিতে পারিলাম—পাট বেধ
হইল যেন মুরাই গাহিতে গাহিতে আমার
কবরের নিকট আসিল। পরে সে নান্না
স্মৃতিপুষ্প দিয়া আমার কবর সাজাইল।
তাহার পরে, সে বীণাহস্তে লইয়া আমারই
কবরে দাঁড়াইয়া আমার স্মৃতিতে কাতর
হইয়া গাহিতে লাগিল “বঁধুনা না মিটল
পিরাস হামারি” ঐকি! আমি কি স্বর্গে!
মুরা কি আমার ভাল বাসিত! মুরা—
শিরতমে! এতদিন তবে মনের তাব গোপন
রাখিয়াছিল কেন? সহসা পুষ্প সৌরভে
দিক্‌আমোদিত হইয়া উঠিল; সম্মুখে চাহিয়া
দেখি সত্যই আমার কবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী
মুরা দাঁড়াইয়া গাহিতেছে—“বঁধুনা না মিটল
পিরাস হামারি” আমি প্রবুদ্ধ হইয়া উদ্ভয়ের
মত মুরার নিকট গিয়া বলিলাম “মুরা—মুরা
ঐকি ব্যাপার!” সহসা পশ্চাদিক্‌ হইতে
কে বলিল “তোমার প্রেমের পুরস্কার”
পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—মহম্মদ। মহম্মদ
বলিল—“ওয়াহেদ,—আমিই তোমার শত্রু।
আমিই তোমার নাথায় লাঠীর আঘাত
করিয়াছিলাম ও বন্দী করিয়াছিলাম। আমিই
তোমাকে মুক্ত করিয়া দিই এবং আমিই
তোমাকে মুরার স্মৃতি সংবাদ দিই। বাস্তবিক
মুরা মরে নাই। সে যেন যেন তোমার
আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তোমার পরীক্ষা
করিবার জন্য মুরা আমার প্রতি-ভাণবাসার

ভাগ দেখাইত। আমি মূৰ্খ! না বুঝিয়া
মুন্নার কপট প্রেমে মুগ্ধ হইলাম। তোমার
উপর হিংসা পরায়ণ হইয়া তোমার অনিষ্ট
সাধনে ক্ষুভসংকল্প হই। যুদ্ধকে তোমার
মুখ্য সংবাদ জ্ঞাপন করাই এবং তোমার
মিথ্যা কবর তাহাকে দেখাই; ফলে মুন্না
উন্মাদিনী হইল। আমার মনে বড় মমতাপ
হইল—সেইজন্য তোমার মুক্ত করিয়া মুন্নার
সহিত মিলিত করিবার উপায় করি। কমা
কর ভাই, আমার কমা কর। নাও তোমার
হৃদয়ের বস্ত্র তুমিই নাও। বল-মুন্না, আমার কমা
করিলে? মুন্না—“কমা করিলাম।” মহম্মদ
আর দাঁড়াইল না। আজ পর্য্যন্ত তাহার
কোনও সন্ধান করিতে পারিলাম না। আমি
মুন্নার সহিত তাহার বাটীতে গেলাম। পরে
বলা বাহুল্য যে মুন্নার সহিত আমার বিবাহ
কার্য্য সমাধা হইয়া গেল।

ত্রীনকরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

দেবী না মানবী তুমি ?

প্রবাসের ক্রান্ত দেহ ঢালিয়া শল্যায়,
স্বপ্নপ্তির ক্রম-কান্তি
পরশে, কি মহা শাস্তি
লভিল হৃদয়, আজি পূর্ণ নিরাশায় !
স্বদীর্ঘ-বাঁধত প্রাণ,
আগরণে ছিল রাস,

একিবে অপূর্ণ স্বপ্ন হেরিছ নিজায়,—
আলোকিল ভ্রমাবশী নত চক্ৰবাক ।—

২

আমি কোথা?—এ যে দেখি স্বপ্ন-নিকেতন!—
পবিত্র অমরা-পুরী,
সৌন্দর্য্যের ভূরি ভূরি
র'য়েছে বিচিত্র চিত্র,—নন্দন-কানন !
কি সুন্দর কুল তলি,
বাসস্তি-চিরোলে ছলি'
করিতেছে পরস্পরে প্রীতি আলিঙ্গন,—
এ দৃশ্য—মানব-দৃষ্ট না হ'বে কখন !

৩

মুহূর্ণ-তরঙ্গ শীলা-ধীরে মল্যাক্ষী,
তরঙ্গ-বিভঙ্গে হাস,
দোলা'য়ে ললিত কায়,
চ'লেছে পুনকে ধরি' মধুর হাসিখী !
সে সঙ্গী হ-স্রুখা-ধারা,
পানে মত্ত দেবতাধা,

সে সঙ্গীতে মুগ্ধা বৈজয়ন্ত নিবাসিনী ;
কোথা' পাবে এ মাদুরী ধরিত্রা মেদিনী !

৪

কি মধুর প্রকৃতির প্রেমের উজ্জ্বল,—
কাননে কুসুম ফোটে,
অনিলে সুরতি ভোটে,
কি অনিন্দা সুপেলব লাবণ্য-বিকশণ !
মগণীর বিসমৃদ্ধা,
বাতিচার, নিষ্ঠুরতা,

করেনি হেথার বেন কত্‌ সহবাস ;
কি হৃদয় বসন্তের পবিত্র বিলাস !

কোথাও বলনি শান্ত প্রেমের গভীরে,
নাটাইরা উন্নিরানি.
সুখাঃতর শুভ্র হাসি
মাথিয়া আননে, মেহে ডাকে তটিনীরে !
‘রতসে বিভোর প্রাণ,
গায় নদী কত গান,
বীচি-ভঙ্গ—ভাল লয়ে, আনন্দ অধীরে,—
কি অপূর্ণ দেব-লীলা সলিলে সমীরে !

কোথাও বিচিত্র সৌর সুখা-ধবলিত,
হিমাজির শূন্য প্রাণ,
নাটাইরা নিঃশব্দার,
অসীম সুরমা রাশি করি একটিত !
বৃক্ক বাতায়নে বসি’,
প্রাণ ধূলে হাসে দলী’,
হেরি দেব-বন্দীতীরে প্রীতি সন্নিহিত,
হেথাকার কেঁহ বুঝি থাকেনা নিমিত্ত ?

হুহরে কোকিল নিত্য বন-রাতে-শিরে,
পুষ্পিত গতিক। গুলি,
নীয়েবে আপনা তুলি,
খোয়ায় পড়ির পদ প্রেম-অশ্রু-নীরে !
কহে কুল সনে,
মধুণ, একুল সনে,

হইয়া রঞ্জিত পুষ্প-পরাগ আধিরে,
আহ্বানে কামনা সদা সত্য হৃকটীরে !

শান্তির পবিত্র তুমি,—এ জীবিত ধাম,-
কি সাম্য মহিমান্বয়,
করে নিত্য অভিনয়,
অড়িত কামনা গুলি সকাম-নিষ্কার !
পবিত্র সরল ভাব,
হেরি পূর্ণ আবির্ভাব,
পুণ্য-পরার্থতা-স্রোত বহে অবিরাম,
এখানে আশ্রয় লভে অনন্ত আরাম !

পরিহরি অবনীৰ নিবাস-নিরয়,
কে তুমি মধুর বেশে,
আনিলে এ দেব-মেঘে,
হৃদয়ের অককার করিয়া বিলয় !
প্রলয়-পৰ্জ্বত-ধোর,
গভীর নির্ধোবে ধোর,
আতকে কম্পিত করি’ দি’ছিল হৃদয়,
কে তুমি, মহলা বিলে এ শান্তি-আলয় !

আজন্মের কাভরতা,—নীয়েব কন্দন,
তুমি কি ভিনেহ হার,
বসি এই অমরায়,
তাই কি মুছাতে অশ্রু এতই বতন ?
অপূর্ণ প্রাণের আশা,
জীবনের ভালবাশা,

ভূমি কি এসেছ দেবী, করিতে পূরণ ?
পূরাবে কি অত্যাগার কৃত্ত আকিঞ্চন ?

১১

দীরবে স'রেছি কত দীরব যজ্ঞা,
দীরবে প্রাণের গান,
হ'রে গেছে অবমান,
দীরব হ'রেছে বীণা,—মধুর মুচ্ছনা !
এ আনন্দ গৃহ ছাড়ি,
আর সে মোহের বাড়ী
নিওনা নিওনা দেবী এ মোর প্রাণনা,
অবদীর কিছু আর করিনা কামনা !

১২

সে সুখ পরশে আজি মোহিত অন্তর,
এই পুণ্য সুখ স্মৃতি,—
পরানের এই প্রীতি,
কোথায় পাইবে বিধে মানব নব্বর !
আত্মা যার দেব সনে,
মিশে' আছে সংজ্ঞাপনে,
তাহারি জীবনে এত সুখ নিরন্তর,
কোথা' পাবে এই স্বর্গ দেব দেবী নর ?

১৩

একি দেবী ?—সচলা এ ভীষণ অঁগার
কোন্ গুপ্ত ঘাঁড়িয়া,
এ ছন্দরে প্রবেশিয়া,
ভাঙ্গিল সে সুখ-নিজা,—বল্ল অমরার ?
পুণ্যময় বর্ষলাভ,—
সে দেবত্ব আবির্ভাব,

(৩৩)

দেখিতে দেখিতে কোথা সূতা'ল আবার,—
এ'বে দেখি অহেলকা মোহ ছলনার !

১৪

এইত বৃহত্তে হায়, ভূমিঃ অবনী,
ভুলিয়া সে শ্রান্তি ছায়া,
জগতের মোহ মায়া,
আনন্দে বিষুর্ ছিল হৃদয়, ধমনী !
পুনঃ যদি দিরে মোরে,
এ অনন্ত বিগ ঘোরের,
শিরাটলে তবু কেন সুখ সজীবনী,
ভূগলে অকুণে কেন মিলা'রে তরুণী !

১৫

এ কি ছলা ?—ছলনার একি ব্যক্তিচায় ?—
মধুর মোহিনী বেশে,
আনি পুত দেব-বেশে,
শেষে কেন দিলে তেন বিরহ অপার ?
এ বিরোধে মর্দ চেদ,
অদম্য প্রাণের খেদ,
অজীবন হবে প্রাণে তাত, হৃদিবার,
কেন নিয়ে এলে, যদি না আনিবে আর ?

১৬

সে দিন পবিত্র নেত্র ছেবেছি তোমার
করণার পূর্ণ ছবি,
সহস্র চন্দ্রমা, রবি,
সাবিরা তোমার পদে আপনি সূটার !
আজি এ মানব নেত্র,
মানবের কর্ম কের,

কেষিতেছি তুমি, পূর্ণ মানবী মারায়,
দেবী না মানবী তুমি ? কি বৃষ্টিব হার !
ঐন্টল বিহারী দাস ।

গয়া ভ্রমণ ।

গয়া হিন্দুর পবিত্র তীর্থ স্থান । ইহার
ভুল্য তীর্থ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই । এখানে
দেশ দেশান্তর হইতে বাজীগণ পরলোকগত
আত্মীয়গণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে
আসিয়া থাকে । ১৯০১ সালের ডিসেম্বর
মাসে আমরা বাকিপুর হইতে গয়া যাত্রা
করি । পুণ্য গয়ায় পুলিশ ষ্টেশনের নিকট
একটি জিভল বাটা ১০ টাকায় ভাড়া করিয়া
তথায় এক মাস বাস করি । ঐ এক মাসের
মধ্যে গয়ার যে সকল স্থান দর্শন করিয়াছি,
আজ তাহাই নিখিব ।

গয়া বাকিপুর হইতে ৪৭ মাইল এবং
কলিকাতা হইতে ৩৪২ মাইল দূরে অবস্থিত ।
ইহার উত্তরে গ্রাম শিলা পাহাড়, দক্ষিণে
ব্রহ্মবোনি পাহাড়, পূর্বে কন্ত নদী এবং
পশ্চিমে কৈটারি ও প্রেতশীলা পাহাড় । গয়া
ছুইভাগে বিভক্ত, পুণ্য গয়া ও সাহিবগঞ্জ ।
মুসলমান রাজত্বের সময় সাহিবগঞ্জ ইলাহা-
বাদ নামে অভিহিত হইত । গয়ার শুভ-
কালীন কণ্ঠের 'ল' সাহেব হইতে ইহার
নাম সাহিবগঞ্জ হইয়াছে । গবর্ণমেন্ট

আকিস কাছারি প্রভৃতি সাহিবগঞ্জ অবস্থিত
বিক্রুপাদ-গঙ্গের মন্দির ও গয়ানীমিগের বাজী
পুরাণ গয়ার । এখানকার রাতা ও গলি
সমস্তই প্রস্তর দ্বারা বাঁধান ।

রেলওয়ে হইবার পূর্বে গয়ায় আসিতে
হইলে জীবনের মাত্রা ভাগ করিয়া আসিতে
হইত, বিনি গয়ায় আসিতেন, তাঁহার পরিবার
বর্গের মধ্যে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিত বাকিপুর
পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন হইবার পর যাত্রী-
দিগকে বাকিপুর হইতে গরুর গাড়িতে বা
পদব্রজে গয়ায় আসিতে হইত । এই পথে
এত দস্যু ভয় ছিল যে দস্যুদল ছদ্মবেশে
যাত্রীগণের সহিত মিলিত হইয়া স্ত্রীবাধা মতে
তাহাদের হত্যা করিয়া সর্ব্বধ লুণ্ঠন করিত ।
চক রাত্তার দুই পার্শ্বে যে দুইটি কটক আছে
কথিত আছে কোন হিন্দু রাজা গয়া বাজী-
দিগকে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য
নির্মাণ করাইয়াছিলেন, রাজিকালে এ দুটটি
কটক বন্ধ হইলে আর দস্যুভয় থাকিত না ।
কেহ কেহ বলেন ইহা মুসলমান রাজত্বের
সময় প্রস্তুত ।

পুরাণ গয়া বেন পাহাড়ের উপর অবস্থিত
কন্ততে যে সমস্ত বাঁধান বাট আছে তাহাদের
উচ্চতা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় । কন্ত
বর্ষার সময় ভিন্ন বেন বাসুকামর প্রান্তর
বনিয়া বোধ হয় । কন্ততে যে সামান্ত জল
আছে তাহা অস্বাধ্যকর । বাসুকা খনন

করিলে অতি সুখাচ্ছ ও বাহ্যিকর বল পাওয়া যায়। কথিত আছে শ্রীরাম চন্দ্র বন গমন কালে যখন এই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়েই এক দিন রাম ও লক্ষ্মণ সীতা দেবীকে কুটীরে রাখিয়া ফলাহরণে গিয়াছেন এমন সময়ে দশরথ আসিয়া সীতাদেবীর নিকট পিণ্ড বাজ্ঞা করেন। কুটীরে কিছুই নাই রাম লক্ষ্মণ প্রতাগত হইলে পিণ্ড দিবেন সীতাদেবী এই কথা দশরথকে বলার তিনি বালুকার পিণ্ড দিতে বলেন এবং কল্প হইতে বালুকা লইয়া সীতাদেবী দশরথকে পিণ্ড দান করেন। রাম চন্দ্র প্রতাগত হইলে যখন সীতাদেবী তাঁহাকে এই ঘটনার কথা বলেন এবং কল্প ও বটবৃক্ষকে ইহাব সত্য-সত্যতা স্বক্কে সাক্ষ্য দিতে বলেন ঐ সময়ে কল্প সত্য কথা গোপন করায় “তুমি অস্ত্র সলিলা হও” এই বলিয়া তাতাকে অভিশাপ প্রদান করেন। বটবৃক্ষ সত্য কথা বলিয়া ছিল বলিয়া সীতা দেবীর বরে অক্ষর জীবন লাভের বর প্রাপ্ত হন। কল্প যদি এল পূর্ণ হইত, তাহা হইলে গয়া একটী স্থান নগরে পরিণত হইত। গয়া মাধ্যম্যে লিখিত যে গঙ্গা বিষ্ণুর চরণোদ্ভূত হইতে উৎপন্ন এবং বিষ্ণু স্বয়ং স্রব হইয়া কল্প রূপে অবতীর্ণ হন, এই হেতু গঙ্গা হইতে কল্প নামিনাই অমিক। সহস্র সহস্র অবশেষ যজ্ঞ করিলেও কল্প তীর্থের জ্ঞানের মত বল পাওয়া যায় না।

গয়া তীর্থ উৎপত্তি স্বক্কে গয়া মাধ্যম্যে লিখিত আছে তারকাসুরের পুত্র ত্রিপুরা-সুরের গয়াস্রব নামে এক মহা বল শালী বিষ্ণুভক্ত পুত্র ছিল। তিনি কোনাহল পর্বতে (ব্রহ্মধানি পাহাড়ে) বহু সময় বৎসর বাস রোধ করিয়া কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপ শ্রবণে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মা ও মহেশ্বর সম্মতিবাহারে ক্ষীরোদ সমুদ্রে বিরাজিত বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবৃত করিলে পর বিষ্ণু ও দেবতাপর্গ গয়াস্রবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন “আমরা তোমার তপস্তার সমুদ্র হঠয়াছি তুমি বর প্রার্থনা কর।” তখন গয়াস্রব করিলেন “দেবগণ! যদি আমার প্রতি সমুদ্র হঠয়া থাকেন তাহা হইলে আমার শরীর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর হইতে, সর্বদেবতা ও ষিভাতি হইতে, যজ্ঞ তীর্থ ও স্মিতিকুল হইতে জ্ঞানী কন্যা ও ধর্মী ইত্যাদি পবিত্র বস্তু হইতে পবিত্র করুন।” * দেবগণ “তাহাই হউক” বলিয়া প্রস্থান করিলে পর গয়াস্রবকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া সকলেই ব্রহ্মলোকে গমন করিতে লাগিল। তখন

* যদি তুমি শরীরে দেব ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরগণ।
সর্বদেব যজ্ঞাতিভাঃ যজ্ঞতীর্থ শিলোক্তরাং।
যেবেতোহতি পাবিত্র্যঃ পবিত্রতম নম্র চ।

গয়া মাধ্যম্যে।

যমরাজ গরাসুর কর্তৃক তাঁহার অধিকার
নষ্টপ্রায় দেখিয়া ব্রহ্মাকে ইহার প্রতিবিধান
করিতে অনুরোধ করিলেন । ব্রহ্মা বিষ্ণুর
কণামত গরাসুর সকাশে উপস্থিত হইয়া
বজ্রার্থ তাঁহার পবিত্র শরীর প্রাণনা করি-
লেন । যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার পরও গরা-
সুরকে চলিতে দেখিয়া যমরাজ গৃহ হইতে
ধর্মশিলা আনিয়া তাঁহার মস্তকে স্থাপন
করিলেন । দেবগণ অস্টমতাবে ঐ শিলায়
উপরে অবস্থান করিয়াও গরাসুরকে নিশ্চল
করিতে অপারগ হইয়া, গদাধর গরাসুরকে
ষয় প্রাণনা করিতে বলিলেন । গরাসুর
বলিলেন “যতদিন পৃথিবী পঙ্কজ নক্ষত্র ও
চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন এই শিলাতে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ অবস্থান
করুন, পাঁচকোশ গভাংগেজ ও এক কোশ
গয়ানির আমার নামাহুসারে কথিত হউক ।
ইহাতে গজা প্রভৃতি নদী সকল এবং সমস্ত
তীর্থ আসিয়া লোক হিতার্থে অবস্থান করুন ।
এই তীর্থে হ্রদ তর্পণ ও পিণ্ডদান করিয়া
লোকে মুক্ত হইবে । এখানে যাহাদিগের
পিণ্ডদান হইবে তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন
করিবে । এখানে বাস করিলে ব্রহ্মহত্যা
পাপ নাশ হইবে ।” গরাসুর তাঁহার

পার্শ্বিত বরপ্রাপ্ত হইলে পর নিশ্চল হইলেন ।
কণিত আছে গরাসুরের মস্তকে যে দিবস
পিণ্ডদান না হইবে সে দিবস গরাসুর পুনরায়
উৎখিত হইবেন । এক দিবস পাণ্ডারা ইহার
সত্যাসত্যতা নির্ধারণ মানাস পিণ্ডদান স্থগিত
করেন, সন্ধ্যায় সময় শিলা বিদীর্ণ হইবার
উপক্রম হইলে পিণ্ডদান করা হয় । বিষ্ণু
পাদপদ্মের পাদদেশে ঐ চিত্র অঙ্কিত বর্তমান
আছে ।

অতীতের স্মৃতি ।

গয়া ।

বিষ্ণুপাদপদ্মের মন্দির ফল্গুনদীর তীরেই
অবস্থিত । মহারাষ্ট্রীয় মহারানী অহল্যা বাই
প্রচুর অর্থব্যয়ে এই মন্দিরটি নিৰ্ম্মাণ করাইয়া
দেন । মন্দিরটি কৃষ্ণ প্রস্তরের নিৰ্ম্মিত
দেখিতে রপের চূড়ার প্রায় । ইহার শিখর

অন্তে চ সফলা দেবা যশাস্বা ক্ষেত্রমন্ত চ ।

তন্মমো সর্বতীর্থানি প্রযচ্ছত্ব হিতং নৃণাং ।

স্নানাদি তর্পণং কৃত্বা পিণ্ডদানং কণাধিকং ।

গজাশ্বাশ্ব মহানশ্বাঃ সরাংসি বিবিধানি চ ।

তে দেবাস্তানি তীর্থানি প্রযচ্ছত্ব হিতং নৃণাং ।

পিতৃণাং ব্রহ্মলোকশ্চ ভুক্তি মুক্তি ফলস্তথা ॥

একো বিষ্ণু জিহা মুর্ত্তিধাবৎ সংকীৰ্ত্ততে বৃষৈঃ ॥

তাবৎ গরাসুরক্ষেত্রং খ্যাতি মে তু সদা ভূবি ।

ব্রহ্মহত্যাধিকং পাপং বিনাশয়তু সবিঃ ৯

• বাবৎ পৃথ্বী পঙ্কজ যামরাজে তারকং ।

জাবহ্মলারাঃ তিত্বং ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ॥

দেশে একটি স্বর্ণ নির্মিত চূড়া আছে। মন্দিরের এক পার্শ্বে মহারানী অহল্যা বাইএর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি আছে। বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিতে হইলে রাত্রি ৭৮টার সময় দর্শন করাই সুবিধা। ঐ সময়ে চন্দন দ্বারা পাদপদ্ম চিত্রিত করা হয় এবং পদচিহ্ন সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়।

গয়াতে ছোট বড় অনেকগুলি পাহাড় আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মযোনি, রামশিলা, শেত-শিলা ও সীতাকুণ্ড পাহাড়ট উল্লেখযোগ্য। গয়ার সমস্ত পাহাড় অপেক্ষা ব্রহ্মযোনি পাহাড় সন্দাপেক্ষা উচ্চ। মহারানী অহল্যা বাই ইহার উপরে উদ্ভিবার সোপান প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইহার ধাপ সংখ্যা প্রায় ৩৫০। ইহার শিখরদেশে সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। এখানে ব্রহ্মযোনি নামে এক গুহা আছে। এট গুহায় প্রবেশ করিয়া বাহির হইলে অগ্নি গর্ভ দ্বন্দ্বা ভোগ করিতে হয় না। ইহার নিকটত পাহাড়ে ব্রহ্মা গোদান করিয়াছিলেন আজও গরুর পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনতিদূরেই ভীমসেন পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, তাঁহার বাস্য ভাস্কর চিত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহার নিকটেই মঙ্গলা গৌরী দেবীর মন্দির এই মন্দিরের পার্শ্বেই অক্ষর বট। এখানেও লোকে পিণ্ডদান করিয়া থাকে।

রামশিলা পাহাড় পূর্বে সত্যাস নরকত নামে খ্যাত ছিল। এই গিরিকাত নদীর সঙ্গমস্থলে রামচন্দ্র জানকী দান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বন গমন করিলে পর ভরত এইখানে রাম সীতা লক্ষ্মণ ও অনেক অধিভূক্তি দ্বাপন করেন। তদবধি ইহা রামশিলা নামে খ্যাত। টিকারির মহারাজ রণ বাহাদুর সিংহ ইহার সোপান প্রস্তুত করাইয়া দেন। পাহাড়ের উপরিতাপে একটি শিব মন্দির আছে। এখানে হঠাৎ গয়া সহরের দৃশ্য বড়ই মনোরম। এখানে আসিলে স্বাস্থ্যবিকট মনে হয়।

“যে করেছে কোন দানে গিরি আরোহণ,
সে জানে ভূগর শোভা বিচিত্র কেনন।”

বেলগুয়ে টেম্পল হঠাৎ ৪ মাইল পশ্চিমে হোতশীলা পাহাড়। এখানে পিণ্ডদান করিলে গেষ্টর দুব হয়। সীতাকুণ্ড পাহাড় ফজলদার পুষ্করিণী। ইহার নিকটত কুপে সাতাধেবী দান করিয়াছিলেন। এট খামে শ্রীরামচন্দ্র দশরথকে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন সেই অবধি ইহা রামখরা নামে খ্যাত। বিষ্ণু পদ হঠাৎ এক মাইল দক্ষিণে গদালোল ভাণ। বিষ্ণুর গদায় হেতী নামক দৈত্যের মস্তক ধিক্ত হইলে সেট গদা প্রক্ষালন চেষ্টা এই ভীষ্মের উৎপত্ত হয়। ইহা ভিন্ন উত্তর মানস, ধর্ম্মারণ্য ব্রহ্ম সরোবর সত্যভি আরও বহু তীর্থ স্থান আছে। সকলগুলি দর্শন

করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই ।

সার্ববঙ্গের ভিতর হাঁসপাতালের নিকট
অশোক নির্মিত তন্তের তথাবশেষ অতাপি
প্রোণিত আছে । এখানে একটি গবর্ণমেন্ট
ক্লগ ও ২টি প্রাইভেট এনট্রেল ক্লগ আছে ।
জল বায়ু পরিবর্তনের জন্য অনেক এখানে
আসিয়া বাস করেন । এখানকার জল
বায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর । এখানে অধিকাংশ
পদক্ষীতি রোগ দেখা যায় ।

কিন্তু নদীর উপরিতাপে যে জল পাওয়া
যায় তাহা পান করিলে এই রোগ চইয়া
থাকে । গরার পেড়া কীরের প্রস্তুত এক-
প্রকার মিষ্ট জ্বা, তামাক ও পাথরের জিনিস
প্রসিদ্ধ । ঢোয়ার (গোরখপুরী পরসার)
চলন এখানেও আছে । এই পরসার আনার
এটা হইতে ৭টা পর্ণাস্ত পাওয়া যায় । গবর্ণ-
মেন্ট প্রচলিত পরসাকে ইহার লাটসাহী
পরসা বলে । শ্রীহরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

নীরবে ।

নীরবে জনম মম
গাইবারে নিতিনিতি,
নীরবে আমার পাণ
প্রাণের নীরব গীতি ।
নীরব আকাশে শশী
নীরবে নীরবে হাসি,
প্রচারে মহিমা তাঁর
নীরবে নীরবে হাসি ।
প্রভাতে তরুণ রবি
নীরবে নভে উঠেছে
অবৃত্ত কিরণ ধারা
নীরব রবে ঢালিছে !

নীরবে নীরব উঠে
নীরবে আকাশে ধার
সুনীল গগনে তার।
নীরবে নীরবে চার !
নীরব বয়স আসে
নীরবে বয়স মম
বিত্তীর্ণ জলধি পাশে
নীরবে ততিনী ধাম ।
নীরবে নলিনী ফুটে
প্রভাতে রবির আশে
নীরবে আদ্যর পরে
যায়না তাকার পাশে ।
নীরবেতে আত্মা পাখী
বাশ করে দেহ নীড়ে
নীরবেতে যায় উড়ে
সকলি বন্ধন ছিঁড়ে !
নীরবে পরাণে মম
উঠে নিত্য কত আশা
নীরবেতে কহি কত
প্রাণের নীরব ভাষা ।
নীরবে মরণ ঘোর
করিবেরে আলিঙ্গন
নীরবে চলিল সব
ছাড়ি বন্ধু প্রিয় জন !
শ্রীহরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

কুস্তনকান্তি তৈল
দৌর্গন্ধযুক্ত কেশবর্দ্ধক ও
মারাত্মক শিরোরোগ নাশক
মূল্য ১০ আনা মাশুলদি ৮।
বি. ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৩৩, নং নিম্নগোবিন্দীর লেন, কলিকতা।

